شرح العقيدة الواسطية

لشيخ الإسلام الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে
তাইমীয়া রচিত ‘আল আক্বীদাহ আল ওয়াসেত্বীয়া’র ব্যাখ্যা

শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসেত্বীয়া

تأليف الشيخ الدكتور العلامة/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

মূলঃ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান

نقله إلى اللغة البنغالية/ محمد عبد الله شاهد

অনুবাদঃ শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

সম্পাদনা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল আল-মাদানী

প্রকাশনা

মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবাতুস সুন্নাহ
কাটাখালি (দেওয়ানপাড়া মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

সহযোগিতায়:
আজিজুর রহমান
ইসলামিক কালচারাল সেন্টার
দাম্মাম, সৌদি আরব। +৯৬৬-৫০-০২৭-৯৩৫১

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১৬ ঈসায়ী

বিনিময় মূল্যঃ ৩০০ (তিনশত) টাকা।

সূচীপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী-রসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর। আর কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করবে তাদের উপরও ।

অতঃপর-দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম সঠিক ইসলামী আক্বীদা গ্রহণ অপরিহার্য। এ জন্য নাবী ﷺ তাঁর মাক্কী জীবনের সম্পূর্ণ সময় মুশরিকদের বাতিল আক্বীদা বর্জন করে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং এ পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কারণ ইসলামে সঠিক আক্বীদা বিহীন আমলের কোন মূল্য নেই।

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপরই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন নির্ভর করে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিই মানুষের প্রয়োজন সর্বাধিক। বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর প্রভুত্ব, উলুহীয়াত, তাঁর অতি সুন্দর নামসমূহ এবং তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করবে, ততক্ষণ সে প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

মানুষের মনে স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর সৃষ্টি ও কর্মসমূহ, সৃষ্টির সূচনা, তার পরিসমাপ্তি, সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টি, তাদের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্ক, তাকদীর এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও তাতে সংঘটিতব্য বিষয়াদি সম্পর্কে যেসব সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগ্রত হয়, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী আক্বীদাই কেবল সে সব প্রশ্ন ও সন্দেহের জবাব দিতে সক্ষম।

পৃথিবীতে মুসলিমদের বিজয়, সাফল্য, প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে ছিল তাদের নির্ভেজাল ও পরিশুদ্ধ আক্বীদা বিশ্বাস। যতদিন মুসলিমদের আক্বীদা বিশ্বাস সঠিক ও সুদৃঢ় ছিল, ততদিন তারা সমগ্র পৃথিবীর শাসক ছিল।

এ জন্যই কুরআন মানুষের আক্বীদা পরিশুদ্ধ করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল আক্বীদার

সংশোধন। তারা সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাতেন, তা হলো এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্যসকল বস্তুর ইবাদত বর্জন করা। মক্কাতে একটানা তের বছর অবস্থান করে নাবী ﷺ আক্বীদা সংশোধনের কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

কুরআন ও সুন্নাতে আল্লাহর সত্তা, তাঁর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। রসূল ﷺ থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝার কোন সুযোগ নেই। অহীর উপর নির্ভর করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। সেই সাথে কুরআন ও হাদীসে আলোচিত গায়েবী বিষয়গুলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিকও নয়।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। আব্বাসী খেলাফতকালে সরকারীভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণ গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুকে পড়ে। ইসলামী আক্বীদার উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তি, পরিণাম, কিয়ামাত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ ধরণের অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নার পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এসব বিষয় চোখেও দেখা যায়না।

কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير "তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" (সূরা শুরা ৪২:১১)।

কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করাই সঠিক আক্বীদার উপর টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নার সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব,

তাঁর গুণাবলী, আখিরাত এবং অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে। তাদের জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলিম দাঁড়িয়ে যায়। এরা হলো মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ। তারাও দার্শনিকদের জবাবে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক দার্শনিকদের জবাব দিতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের যুক্তিগুলো ছিল তুলনামূলক দুর্বল। এগুলো সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সংশয় ও সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এমনসব জটিলতা, দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেছে, যার জবাব স্বয়ং কালামশাস্ত্রবিদগণ খুজেঁ না পেয়ে নিজেরাই সংশয়ে পড়েছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী শেষ বয়সে উপনীত হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি কালামী পদ্ধতি ও দার্শনিক উপস্থাপন প্রক্রিয়ার উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন। শেষ জীবনে তিনি এ সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে রোগীর রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায় এবং তৃষ্ণার্তের পিপাসা মোটেই নিবারণ হয় না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নার পদ্ধতিই আমি নিকটতর পেয়েছি।

আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুসলিম দার্শনিকগণ বুদ্ধিভিত্তিক যেই যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ তার মোকাবেলায় কুরআন-সুন্নার যুক্তি-প্রমাণ অনেক সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, দ্ব্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং ঈমানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যা আবশ্যক, কুরআন-সুন্নাতের দলীলের আলোকে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি একাধিক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন এবং দার্শনিক ও কালামীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে তার অন্যতম গ্রন্থ আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কিতাবে আল্লাহর অতি সুন্দর নাম, তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী, আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রায় সকল বিষয়ই অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

৬৯৮ হিজরীর কোনো এক দিনে আসরের সলাতের পর এক বৈঠকে শাইখ এই মূল্যবান কিতাবটি লিখে শেষ করেছেন। শাইখ নিজেই এই কিতাব লিখার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাতারী শাসনাধীন ইসলামী সাম্রাজের মুসলিমদের মধ্যে যখন অজ্ঞতা ও যুলুম ছড়িয়ে পড়ল, দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা

যখন প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো, চতুর্দিকে কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ল এবং সঠিক ইসলামী আক্বীদা মুসলিমগণ প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল, তখন ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল বসরা ও কূফার মধ্যকার 'ওয়াসেত' শহরের জনৈক কাযী শাইখের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামী আক্বীদার বিষয়গুলো এক সাথে উল্লেখ করে একটি কিতাব লিখার অনুরোধ জানালেন। শাইখ জবাবে বললেন, আক্বীদার বিষয়ে লোকেরা তো অনেক কিতাবই রচনা করেছে। কিন্তু ওয়াসেতের কাযী চাপাচাপি করেই বললেন যে, আমি কেবল আপনার পক্ষ হতেই এ বিষয়ে একটি পুস্তক কামনা করছি। তখন তিনি আসরের সলাতের পর এক বৈঠকে এই কিতাবটি লিখে দিলেন। ওয়াসেতের কাযীর অনুরোধে এবং ওয়াসেতের অধিবাসীদের জন্য যেহেতু এই কিতাবটি লিখা হয়েছে, তাই এটিকে আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়া বলা হয়। সেই সাথে واسط অর্থ যেহেতু মধ্যবর্তী এবং এই কিতাবে যেহেতু মধ্যমপন্থী উম্মাতের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই কিতাবটির নাম 'আল আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়া' হওয়া সামঞ্জস্য।

আল আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়ার বিষয়গুলো নিয়ে শাইখের সাথে সমকালীন আলিমদের একাধিক 'মুনাযারা' বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মিশরের তদানীন্তন সুলতানের পক্ষ হতে নিযুক্ত দামেস্কের গভর্ণরের উপস্থিতিতে ৭০৫ হিজরী সালের বিতর্ক অনুষ্ঠানটি অন্যতম। শাইখুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আক্বীদা ওয়াসিত্বীয়ার বিষয়গুলোর উপর তিনটি মুনাযারায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এতে তিনি দ্বীনের সমস্ত মূলনীতি ও সহীহ আক্বীদার মাস'আলাগুলো সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে, কিতাবটির মধ্যে তিনি আক্বীদার ক্ষেত্রে তর্কশাস্ত্রবিদদের মতামত ও বিদ'আতমুক্ত সালাফে সালেহীনের আক্বীদার বিবরণ দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আশায়েরা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ওয়াসেতীয়ায় সন্নিবেশিত আক্বীদাগুলোর বিষয়ে যখন শাইখের চরম বিরোধিতা শুরু করলো, তখন শাইখুল ইসলাম তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, তোমরা উহা থেকে এমন একটি মাস'আলা নিয়ে আসো, যাতে আমি কুরআন ও সুন্নার খেলাফ করেছি। শাইখুল ইসলামের মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওয়াসেতীয়ার একটি মাস'আলাকেও কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হিসাবে প্রমাণ করতে পারেনি।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ সমাজের মুসলিমগণ সঠিক আক্বীদা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন। মুসলিমদের

অধঃপতনের মূল কারণ হল দ্বীনের সঠিক আক্বীদা ও শিক্ষা বর্জন করে শির্ক ও বিদ‘আতে জড়িয়ে পড়া। বাংলাভাষী মুসলিম অঞ্চলগুলোতেও বয়ে যাচ্ছে শির্ক-বিদ‘আতের সয়লাব। যারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার দাবী করে তারাও সঠিক আক্বীদা হতে অনেক দূরে। শুধু তাই নয়, যারা সুস্পষ্ট কবর পূজা ও নানা রকম শির্ক-বিদ‘আতে লিপ্ত তাদেরকেও সুন্নী বলে আখ্যায়িত করা হয়!!! আর এ কারণেই বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের সমাজের সরল প্রাণ অগণিত মুসলিম। বাংলা ভাষা এখন বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে কোটি কোটি বাংলাভাষী মুসলিম। বাংলাভাষী মুসলিমদের তুলনায় ইসলামী বই-পুস্তকের সংখ্যা কম বলেই মনে হয়। এখন পর্যন্ত আক্বীদার মৌলিক গ্রন্থগুলোর ব্যাখ্যাসহ সঠিক ও নির্ভুল অনুবাদ না হওয়া বাংলাভাষী মুসলিমদের সহীহ আক্বীদা সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্যতম কারণ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা বর্ণনায় ওয়াসিত্বীয়া যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, তাই মুসলিম উম্মার নিকট এটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এর ছোট-বড় অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। সম্ভবত অনুবাদও হয়েছে অনেক ভাষায়। ওয়াসিতীয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহের মধ্য থেকে শাইখ ড. সালেহ ফাওযানের ব্যাখ্যাটি বাংলায় অনুবাদের জন্য বেছে নেয়ার কারণ হলো এটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল। বাংলাভাষী মুসলিমগণ যেহেতু এখনো আক্বীদার বড় বড় কিতাবগুলো পড়তে অভ্যস্থ হয়ে উঠেনি, তাই এটিই তাদের জন্য আক্বীদার জগতে প্রবেশের মূল ফটক হতে পারে ভেবে এবং বিশেষ করে জম‘ঈয়তে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সৌদি আরব শাখার তত্ত্বাবধানে ওয়াসিত্বীয়ার এ ব্যাখ্যাটিই অনুবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ায় মহান স্রষ্টার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, তিন প্রকার তাওহীদের মধ্য থেকে শুধু তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত, তাকদীর, ঈমানের বিভিন্ন মাস‘আলা, আখিরাত সম্পর্কিত গায়িবী বিষয়সমূহ, খিলাফাত ও সাহাবীদের ফাযীলাত এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই ওয়াসিত্বীয়ায় স্থান পেয়েছে। তাওহীদুল উলুহীয়ার বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়নি। সে হিসাবে এটি আক্বীদার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়; বরং তাতে আক্বীদার বিশেষ একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আক্বীদার যেসব বিষয় বাদ পড়েছে, তা অবগত হওয়ার জন্য আমাদের অন্যতম কিতাব **শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবী** এবং আল্লামা হাফেয বিন আহমাদ আল-হাকামী রচিত **'নাজাতপ্রাপ্ত দলের আক্বীদা'** নামক বই দু'টি পড়ার অনুরোধ রইল।

আর তাওহীদুল উলুহীয়ার বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝার জন্য শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ﵀ কর্তৃক রচিত 'কিতাবুত্ তাওহীদ'এর অন্যতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ **'কুররাতুল উয়ূন'** সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিতাবুত্ তাওহীদের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে 'কুর্‌রাতুল উয়ূন'কে বাংলায় অনুবাদের জন্য বাছাই করার অন্যতম কারণ হলো, শাইখের নাতি সুবিখ্যাত আলিম আব্দুর রহমান বিন হাসান হলেন এটির প্রণেতা। তিনি প্রথমে কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল মাজীদ' রচনা করেন। অতঃপর এটিকে আরো সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত করে আরেকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দেন, **قرة عيون الموحدين** বা তাওহীদপন্থীদের চক্ষু শীতলকারী।

আল্লাহর অশেষ কৃপায় বইগুলো পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। এতে যেসব ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, অনুবাদ জনিত কোন ভুল-ভ্রান্তি নযরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

হে আল্লাহ! তুমি বইগুলোর লেখক, ভাষ্যকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, তত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করো। আমীন॥

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
ashahed1975@gmail.com
মোবাইল: সৌদি আরব +৯৬৬৫০৩০৭৬৩৯০
বাংলাদেশ +৮৮০১৭৩২৩২২১৫

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সকল সাথীগণের উপর। অতঃপর, ইহা ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আক্বীদা ওয়াসেত্বীয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। যা নিম্নোক্ত বইগুলো থেকে সংকলন করা হয়েছে।

১. আর রওদ্বাতুন নাদিয়াহ শারহু আক্বীদাতিল ওয়াসেত্বীয়া-শাইখ যাইদ বিন আব্দুল আযিয বিন ফাইয়াস
২. আত-তাম্বিহাতু সুন্নিইয়াতু আলাল আক্বীদাতিল ওয়াসেত্বীয়া-শাইখ আব্দুর আযিয বিন নাসির রশিদ
৩. আত-তাম্বিহাতুল লাত্বিফা ফি মা ইহতাওয়াত আলাইহিল ওয়াসেত্বীয়া মিন মাবাহিসিল মানিফা-শাইখ আবদুর রহমান বিন নাসির সাদী
৪. নুকিলাত মিন ফাওয়াইদি আলক্বাতিহা আলা নুসখাতি ওয়াক্বতিত্ত্বলাব।
৫. আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা তাফসীরের বইসমূহ থেকে নেয়া হয়েছেঃ যেমন, ফাতহুর ক্বদীর-ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আশ শাওকানী, তাফসীরুল কুরআনিল আযিম-শাইখ ইসমাঈল ইবনে কাসীর।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বইটি কয়েকবার প্রকাশ করেছে। বইটি সম্পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আর যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করুন, মুসলিমদেরকে সংশোধন করার সামর্থ দিন।

আমি আল্লাহর কাছে এর উপকার কামনা করছি, আক্বীদার এ গুরুত্বপূর্ণ বইটিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। আর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আল্লাহ ﷻ আমাদের নাবী মুহম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের উপর সলাত ও সালাম নাযিল করুন। আমীন।

ড. সালিহ বিন ফাওযান আল ফাওযান

শাইখ ড. সালিহ বিন ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ ড. সালিহ বিন ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ আলকাসীম অঞ্চলের বুরায়দাহ শহরের নিকটবর্তী শামাসীয়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ মোতাবেক ১ রজব ১৩৫৪ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থাকতেই তাঁর পিতা ইনতেকাল করেন। অতঃপর তিনি ইয়াতীম অবস্থায় স্বীয় পরিবারে প্রতিপালিত হন। শহরের মসজিদের ইমামের নিকট তিনি কুরআনুল কারীম, কিরাআতের মূলনীতি এবং লিখা শিখেন।

শামাসিয়ায় ১৩৬৯ হিজরী সালে যখন সরকারী মাদরাসা চালু করা হয়, তখন তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর বুরায়দা শহরস্থ ফয়সালীয়া ইবতেদায়ী মাদরাসায় ১৩৭১ হিজরী সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময় তাকে ইবতেদায়ী মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বুরায়দাতে ১৩৭৩ হিজরী সালে যখন ইসলামিক ইন্সটিটিউট খোলা হয়, তখন তিনি তাতে ভর্তি হন। ১৩৭৩ হিজরী সালে তিনি এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি রিয়াদ শহরস্থ কুল্লীয়া শারঈয়া বা শারঈয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৩৮১ হিজরী সালে শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী ফিকাহর উপর এম,এ পাস করেন এবং একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবনঃ

শারঈয়া কলেজ থেকে ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি রিয়াদস্থ ইসলামিক ইন্সটিডিটে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাকে শারঈয়া কলেজের শিক্ষক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাঁকে ইসলামী আক্বীদা বিভাগের উচ্চতর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর তাঁকে বিচার বিষয়ক হায়ার ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর তাঁকে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে তাঁকে পুনরায় সেখানে শিক্ষক হিসাবে ফিরে

আসেন। অতঃপর তাকে ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। তিনি এখানো এই পদে বহাল রয়েছেন।

তিনি আরো যেসব সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, তার মধ্যে هيئة كبار العلماء এর সদস্য, মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত রাবেতার পরিচালনাধীন ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর সদস্য, ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য, হজ্জ মৌসুমে দাঈদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সদস্য এবং রিয়াদ শহরের মালায এলাকার আমীর মুতইব বিন আব্দুল আযীয আল-সউদ জামে মসজিদের ইমাম, খতীব ও শিক্ষক। তিনি সৌদি আরব রেডিওতে نور على الدرب নামক প্রোগ্রামে শ্রোতাদের প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর প্রদান করেন।

এ ছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, গবেষণা, অধ্যায়ন, পুস্তিকা রচনা, ফতোয়া প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে ইলম চর্চা অব্যাহত রখেছেন। এগুলো একত্র করে কতিপয় পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। তিনি মাস্টার্স ও ডক্টরেক ডিগ্রী অর্জনার্থী অনেক ছাত্রের গবেষণা কর্মে তত্বাবধায়ন করেছেন।

শাইখের উস্তাদবৃন্দঃ

১) মান্যবর শাইখ আব্দুর রাহমান বিন সা'দী

২) শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায

৩) আব্দুল্লাহ বিন হুমায়েদ

৪) শাইখ মুহাম্মাদ আলআমীন শানকিতী

৫) শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফী

৬) শাইখ সালেহ বিন আব্দুর রাহমান আসু সুকাইতী

৬) শাইখ সালেহ বিন ইবরাহীম আলবুলাইহী

৭) শাইখ মুহাম্মাদ বিন সুবাইল

৮) শাইখ আব্দুল্লাহ বিন সালেহ আলখুলাইফী

৯) শাইখ ইবরাহীম বিন উবাইদ আলআব্দ আল মুহসিন

১০) শাইখ হামুদ বিন উকালা আশ শুআইবী

১১) শাইখ সালে আলইল্লী আন্ নাসের

এ ছাড়াও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ধার্মিক শাইখের কাছ থেকে হাদীছ, তাফসীর এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

শাইখের ছাত্রগণ:

১) শাইখ ড. আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আলসাদহান

২) শাইখ আলী বিন আব্দুর রাহমান আশ শিবিল

৩) শাইখ সাগীর বিন ফালেহ আলসাগীর

৪) শাইখ ইউসুফ বিন সা'দ আলজারীদ

৫) শাইখ সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হামাদ আলউসাইমী

৬) শাইখ সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হামাদ আলউসাইমী

৭) মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আব্দুর রাহমান বিন সুদাইস

৮) মসজিদে নববীর ইমাম শাইখ আব্দুল মুহসিন আল কাসিম

৯) শাইখ সালেহ বিন ইবরাহীম আলুস শাইখ

১০) শাইখ আয্যাম মুহাম্মাদ আল শুআইর

এ ছাড়াও তাঁর অনেক ছাত্র রয়েছে। তারা নিয়মিত তাঁর মজলিসে এবং নিয়মিত দারসগুলোতে অংশ গ্রহণ করতেন।

শাইখের ইলমী খেদমত:

লেখালেখির কাজে রয়েছে শাইখের অনেক খেদমত। তার মধ্য থেকে নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

১) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية এটি ইলমে ফারায়েযের উপর রচিত শাইখের একটি কিতাব। এটি ছিল মাস্টার্স পর্বে তাঁর গবেষণার বিষয়। বইটি এক খন্ডে ছাপানো হয়েছে।

২) أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ইসলামী শরীয়াতে খাদ্যদ্রব্যের বিধিবিধান।

৩) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد আক্বীদা সংশোধন। এটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। এর বাংলা নাম আমরা দিয়েছি কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে আক্বীদা সংশোধন।

৪) شرح العقيدة الواسطية আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম ইমাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আল আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়ার ব্যাখ্যা এটি। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

৫) البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب এটি একটি বড় মাপের কিতাব। এতে তিনি বিভিন্ন কিতাবের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন।

৬) مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة আক্বীদা ও দাওয়া বিষয়ে শাইখের বিভিন্ন লেকচার এখানে জমা করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭) الخطب المنبرية في المناسبات العصرية যুগোপযোগী অনেক বিষয়কে একত্র করে জুমআর খুৎবা হিসাবে লিখা হয়েছে। এটি দুই খন্ডে ছাপানো হয়েছে।

৮) ইসলামের সংস্কারক ইমামগণ

৯) বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা

১০) বিদ‘আত থেকে সাবধান। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

১১) مجموع فتاوى في العقيدة والفقه ফতোয়া ও আক্বীদা বিষয়ক সংকলন

১২) شرح كتاب التوحيد- للإمام محمد بن عبد الوهاب এটি শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর লিখিত কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা।

১৩) الملخص الفقهي ফিকাহর উপর লিখিত শাইখের এটি একটি বিশাল কিতাব।

১৪) إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان রমাদ্বান মাসের জন্য খাস করে অনেকগুলো দারস এখানে জমা করা হয়েছে।

১৫) হাজ্জ ও উমরাহকারীর জন্য যা করণীয়

১৬) কিতাবুত তাওহীদ। এটি সৌদি আরবের স্কুলসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

১৭) কিতাবুদ দাওয়া

১৮) রমাদ্বানুল মুবারকের মজলিস

১৯) আক্বীদাতুত তাওহীদ। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

২০) كشف الشبهات এর ব্যাখ্যা।

২১) যাদুল মুসতাকনি

২২) الملخص في شرح كتاب التوحيد এটি কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যা।

২৩) شرح مسائل الجاهلية এটি জাহেলী যুগের অনেক শির্ক, কুফর এবং কুসংস্কারের প্রতিবাদে লিখিত হয়েছে।

২৪) حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদ উদ্‌যাপন করা।

২৫) الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং মানব জীবনে তার প্রভাব।

২৬) مجمل عقيدة السلف الصالح সালাফদের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

২৭) حقيقة التصوف সুফীবাদের হাকীকত।

২৮) من مشكلات الشباب যুবকদের সমস্যা

২৯) وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা আবশ্যক

৩০) من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা

৩১) دور المرأة في تربية الأسرة পরিবার পরিচালনায় নারীর ভূমিকা

৩২) معنى لا إله إلا الله লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহএর ব্যাখ্যা

৩৩) شرح نواقض الإسلام ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা

৩৪) التوحيد في القران কুরআনুল কারীমে তাওহীদ

৩৫) 4-1 سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب যুবকদের জন্য কতিপয় উপদেশ ও নির্দেশনা সিরিজ ১-৪

শাইখের প্রশংসায় বিভিন্ন আলিমের মন্তব্যঃ

সৌদি আরবে যে সব বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলিম এখনো জীবিত আছেন, তাদের মধ্যে শাইখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, শাইখ বিন বায রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার পরে আমরা কার কাছে দ্বীনের বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো? জবাবে বিন বায রহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনারা সালেহ ফাওযান জিজ্ঞসা করবেন। এমনি শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আপনার পরে কাকে জিজ্ঞাসা করবো? তিনি জবাব দিলেন যে, আপনারা সালিহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা তিনি একজন ফকীহ এবং ধার্মিক। শাইখ বিন গুদাইয়্যান প্রায়ই বলতেন, আপনারা দ্বীনের ব্যাপারে শাইখ সালেহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ যেন তাঁর আনুগত্যের উপর তাঁর বয়স বৃদ্ধি করেন, তাঁর শেষ পরিণাম যেন ভালো করেন এবং যেন হকের উপর তাঁকে টিকিয়ে রাখেন।

আমরা শাইখের জন্য দু‘আ করি, তিনি যেন তাঁর হায়াতে বরকত দান করেন এবং দ্বীনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তা যেন কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সত্য দ্বীনসহ যুগে যুগে অগণিত নাবী রসূল প্রেরণ করেছেন। নির্ভেজাল তাওহীদই ছিল নাবী-রসূলদের দ্বীনের মূল বিষয়। পৃথিবীর মানুষেরা এই তাওহীদকে যখনই ভুলে গেছে, তখনই তা পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন নতুন নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আগমন করেন সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দাওয়াতের মূল বিষয়ও ছিল এই তাওহীদ। মক্কায় অবস্থান করে একটানা ১৩ বছর তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করে তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন। উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণ তাঁর এই দাওয়াত গ্রহণ করলো এবং তারা তাঁর সাহায্য করলো। আল্লাহ তা'আলা অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করলেন। আরব উপদ্বীপসহ পৃথিবীর সর্বত্রই এই দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে গেল। তাওহীদের মাধ্যমে তারা সমগ্র জাতির উপর যে গৌরব, সম্মান, শক্তি, প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মুসলিমগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলিমদের শক্তির মূলভিত্তি এই নির্ভেজাল তাওহীদের উপর শির্ক ও কুসংস্কারের আবর্জনা পড়ে যাওয়াই মুসলিমদের বিপর্যয়ের প্রধান ও মূল কারণ।

ইসলামের এই মূলভিত্তি নির্ভেজাল তাওহীদ থেকে যখনই মুসলিম জাতি দূরে চলে গেছে, দ্বীনি লেবাসে বিভিন্ন সময় শির্ক, বিদআত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় আচার-আচরণ মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তখনই নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে জাতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সকল প্রকার আবর্জনা থেকে তাওহীদকে পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ করার জন্য ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে আল্লাহ তা'আলা বহু মর্দে মুজাহিদ প্রেরণ করেছেন। তারা পথহারা জাতিকে সুপথে ফিরিয়ে এনেছেন, তাওহীদের দাওয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং দ্বীনকে সকল প্রকার শির্ক-বিদ'আত থেকে সংস্কার ও সংশোধন করেছেন। তাদেরই ধারাবাহিকতায় হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতকে আগমন করেন বিপ্লবী সংস্কারক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀। বহু প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি

মোকাবেলা করে এবং জেল-যুলুম সহ্য করে তাওহীদ পুনরুদ্ধার ও সংস্কারে তিনি যে অতুলনীয় অবদান ও খেদমত রেখে গেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্য তা দিশারী হয়ে থাকবে। তাঁর বরকতময় জীবনী, দাওয়াত ও সংস্কারের সকল দিক উল্লেখ করতে গেলে বড় মাপের একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার। তাই আমরা স্বল্প পরিসরে শাইখের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, জীবনী ও সংস্কার আন্দোলনের কিছু দিক এখানে উল্লেখ করেছি।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়:

তিনি হলেন আবুল আব্বাস তকীউদ্দীন শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমাদ বিন আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ। ৬৬১ হিজরী সালের ১০ রবীউল আওয়াল মাসে তিনি বর্তমান সিরিয়ার হারান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এবং দাদা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন আব্দুস সালাম বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফিকাহবিদ ছিলেন। সে হিসাবে তিনি এমন একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যার সকল সদস্যই ছিলেন আলিম ও দ্বীনদার। আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে শিশুকালেই তিনি ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। উল্লেখ্য যে, আলিমদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তাইমীয়া ﷺ ছিলেন শাইখের নানী। তিনি ওয়াজ-নাসীহত ও ভাষণ-বক্তৃতা দানে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা:

ইমামের বয়স যখন সাত বছর, তখন মুসলিম অঞ্চলগুলো তাতারীদের আক্রমণের শিকার হয়। শাইখের জন্মস্থান হারান এলাকা তাতারীদের আক্রমণের কবলে পড়লে মানুষ জানের ভয়ে সবকিছু পানির দামে বিক্রি করে পালাচ্ছিল। এই ভীতি ও আতঙ্কের দিনে ইমামের পরিবারবর্গ ও দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তারা প্রয়োজনীয় সবকিছু ফেলে দিয়ে শুধু পারিবারিক লাইব্রেরীর বই-পুস্তকগুলো গাড়ী বোঝাই করলেন। শুধু কিতাবেই কয়েকটি গাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। গাড়ীগুলো টানার জন্য

প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও গাধাও ছিলনা। তাই গাধার পাশাপাশি পরিবারের যুবক সদস্যদেরও মাঝে মাঝে কিতাবের গাড়ী টানতে হতো।

দামেস্কে পৌঁছার পর তথাকার লোকেরা শাইখের পরিবারকে অভ্যর্থনা জানালো। দামেস্কবাসীরা শাইখের পিতা ও দাদার জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতির কথা আগে থেকেই অবহিত ছিল। পিতা আব্দুল হালীম দামেস্কের বড় মসজিদ জামে উমুবীতে দারস দেয়ার দায়িত্ব লাভ করলেন। শীঘ্রই তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলো।

কিশোর ইবনে তাইমীয়া ﷬ অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে হাদীস, ফিক্হ ও আরবী ভাষা চর্চায় মশগুল হলেন। সেই সাথে তিনি পিতার সাথে বিভিন্ন ইলমী মজলিসে শরীক হতে লাগলেন।

ইমামের মেধা ও স্মরণশক্তি:

ইমামের খান্দানের সবাই মেধাবী ছিলেন। কিন্তু তাদের তুলনায় ইমামের স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ। শিশুকাল থেকে তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি শিক্ষকদের অবাক করে দিয়েছিল। দামেস্কের লোকদের মুখে মুখে তাঁর স্মরণশক্তির কথা আলোচনা হতো।

একদা আলেপ্পো নগরীর একজন বিখ্যাত আলেম দামেস্কে আসেন। তিনি কিশোর ইবনে তাইমীয়ার স্মরণশক্তির কথা লোকমুখে আগেই শুনেছিলেন। ইমামের স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটি দর্জির দোকানে বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একদল ছেলেকে আসতে দেখা গেলো। দর্জি ইঙ্গিতের মাধ্যমে ইমামকে দেখিয়ে দিল। তিনি ইমামকে ডাকলেন। ইমামের খাতায় হাদীসের তের-চৌদ্দটি মতন লিখে দিয়ে বললেন, পড়ো। কিশোর ইমাম ইবনে তাইমীয়া গভীর মনোযোগের সাথে হাদীসগুলো একবার পড়লেন। তিনি এবার খাতা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, মুখস্থ শুনিয়ে দাও। ইবনে তাইমীয়া তা মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। এবার একগাদা সনদ লিখে দিয়ে পড়তে বললেন। পড়া হলে মুখস্থ বলতে বললেন। ইমাম সনদগুলোও মুখস্থ বললেন। শাইখ এতে অবাক হয়ে বললেন, বড় হয়ে এই ছেলে অসাধ্য সাধন করবে।

ইমামের জ্ঞান অর্জন ও চর্চা:

ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ মাত্র সাত বছর বয়সে শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর জ্ঞানের ভান্ডার পরিপূর্ণ করে তুলেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ এবং উসূলের সাথে সাথে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি দুই শতাধিক উস্তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। কুরআনের তাফসীরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। যে সব উস্তাদদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে ইবনে কুদামা, ইবনে আসাকেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একটানা সাত থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত জ্ঞান লাভের পর শিক্ষকতা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাইশ বছর বয়সে উপনীত হলে তার পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন দামেস্কের সর্ববৃহৎ দারুল হাদীসের প্রধান মুহাদ্দিস। আব্দুল হালীমের মৃত্যুর পর এই পদটি শুন্য হয়ে যায়। সুযোগ্য পুত্র ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ সেই পদ পূরণ করেন। তাঁর দারসে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও আলেমগণ উপস্থিত হতে শুরু করেন। যুবক আলেমের জ্ঞান ও পান্ডিত্য সবাইকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। কিছু দিন পরেই দামেস্কের প্রধান মসজিদ জামে উমুবীতে তিনি পিতার স্থানে কুরআনের তাফসীর করার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তাঁর জন্য বিশেষভাবে মিম্বার তৈরী করা হয়। প্রতি সপ্তাহেই তাঁর তাফসীরের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ছাত্রের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কুরআনের তাফসীরের সাথে সাথে সমকালীন সব সমস্যার কুরআনিক সমাধান বর্ণনা করতেন।

তাঁর হাতে তৈরী হয় যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য আলেম। তাদের মধ্য হতে স্বনামধন্য লেখক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম ইবনে কাছীর এবং ইমাম যাহাবীর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

ইমামের মাযহাব:

তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তারা সকলেই ছিলেন আলিম। তারা ফিক্হের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন। কিন্তু

পরবর্তীতে তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাকলীদ করতেন না। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের অনুসরণ করতেন, সুন্নাতের সাহায্য করতেন এবং সালাফী নীতি গ্রহণ করতেন। সুন্নাত ও সালাফী নীতির পক্ষে তিনি এমন এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন, যা তাঁর পূর্বে অন্য কেউ পেশ করার সাহসিকতা প্রদর্শন করতেন না।

সত্য প্রকাশে ইমামের সাহসকিতাঃ

তাতারীদের আক্রমণের খবর যখন সিরিয়ায় পৌঁছল, তখন সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে মুসলিমগণ আগেই অবহিত ছিল। তাই তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আশপাশের সকল এলাকা ছেড়ে লোকেরা রাজধানী দামেস্কের দিকে চলে আসতে লাগল। দামেস্কের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে খবর আসলো যে, মিশরের বাদশাহ প্রচুর সেনাবাহিনীসহ দামেস্কের মুসলিমদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছেন। এই খবর শুনে নগরীতে প্রাণের সাড়া জাগল। মুসলিমগণ নতুন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

৬৯৯ হিজরীর ২৭ রবীউল আওয়াল মাসে তাতারী সম্রাট কাজানের সাথে মিশরের সুলতানের সংঘর্ষ হলো। অনেক চেষ্টা করেও এবং অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করেও মুসলিমরা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। মুসলিমরা হেরে গেল। মিশরের সুলতান পরাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোর পথে রওয়ানা হলেন।

এবার দামেস্কবাসীরা পড়লো মহাসংকটে। তাতারী সম্রাট সেনাদলসহ এবার বিজয়ী বেশে নগরে প্রবেশ করবে। তাতারী বিভীষিকার কথা চিন্তা করে বড় বড় আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা শহর ত্যাগ করতে লাগল। এর আগেই শহরের বিচারক, পরিচিত আলেম-উলামা, সরকারী অফিসার, বড় বড় ব্যবসায়ী এমনকি দামেস্কের গভর্ণর নিজের শহরের মায়া ত্যাগ করে মিশরের পথে পাড়ি জমালেন। জনগণের এক অংশও তাতারীদের হত্যাযজ্ঞের ভয়ে দামেস্ক ছেড়ে দিল। এখন কেবল সাধারণ জনগণের একটি অংশই দামেস্কে রয়ে গেল।

এদিকে কাজানের সেনাদল দামেস্কে প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে একটা সিদ্বান্ত গ্রহণ করলেন। তারা সিদ্বান্ত নিলেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এর নেতৃত্বে নগরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল কাজানের নিকট যাবে। তারা নগরবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার একটি ফরমান লিখে আনবে।

এ উদ্দেশ্যে তাতারী সম্রাট কাজানের সামনে দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন ইসলামের অগ্রদূত ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ। কাজানের সম্মুখে ইমাম কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ন্যায়-ইনসাফের পক্ষে এবং যুলুম নির্যাতনের বিপক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নির্ভয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন এবং কাজানের কাছাকাছি হচ্ছিলেন। তাঁর আওয়াজ ধীরে ধীরে উঁচু ও গুরুগম্ভীর হচ্ছিল। কুরআনের আয়াত ও হাদীস শুনাতে শুনাতে তিনি কাজানের অতি নিকটবর্তী হচ্ছিলে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পরাক্রমশালী কাজান এতে মোটেই বিরক্তিবোধ করছিলেন না। বরং তিনি কান লাগিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। ইতিমধ্যেই কাজান ইমামের ভাষণে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে গেলেন। ইমামের ভাষণ কাজানকে অনুবাদ করে শুনানো হলে তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আলেমটি কে? আমি এমন সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প লোক আজকের পূর্বে আর কখনো দেখিনি। ইতিপূর্বে আমাকে অন্য কেউ এমন প্রভাবিত করতে পারেনি।

লোকেরা ইবনে তাইমীয়া ﷺ সম্পর্কে কাজানকে জানালো এবং ইমামের ইলম ও কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ কাজানকে সেদিন বলেছিলেন, হে কাজান! আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করেন। আমি জানতে পেরেছি, আপনার সাথে রয়েছেন কাযী, শাইখ, মুয়ায্যিন এবং ইমামগণ। এসব সত্ত্বেও আপনি মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছেন, তাদেরকে হত্যা করেছেন, তাদের নারীদেরকে বন্দী করেছেন এবং মুসলিমদের মালামাল লুণ্ঠন করেছেন। অথচ আপনার পিতা ও দাদা কাফের হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের কাজ করতে ইতস্ত করতেন। তারা নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার

পালন করেছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আপনি আল্লাহর বান্দাদের উপর মারাত্মক যুলুম করেছেন।

সে সময় ইমামের সাথে ছিলেন প্রধান বিচারপতি নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস। তিনি লিখেছেন, ইবনে তাইমীয়া ﵀ যখন কাজানের সাথে কথা শেষ করলেন, তখন তাঁর ও সাথীদের সামনে খাবার রাখা হলো। সবাই খেতে লাগলেন। কিন্তু ইমাম হাত গুটিয়ে নিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, এ খাবার হালাল নয়। কারণ গরীব মুসলিমদের থেকে লুট করা ছাগল ও ভেড়ার গোশত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মযলুম মানুষের কাছ থেকে জোর করে কাঠ সংগ্রহ করে তা পাকানো হয়েছে।

অতঃপর কাজান ইমামকে দু'আ করার আবেদন করলেন। ইমাম দু'আ করতে লাগলেন। দু'আতে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এই যুদ্ধের পিছনে কাজানের উদ্দেশ্য যদি হয় তোমার দ্বীনকে সাহায্য করা, তোমার কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা, তাহলে তুমি তাঁকে সাহায্য করো। আর যদি দুনিয়ার রাজত্ব লাভ এবং লোভ-লালসা চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই তাকে ধ্বংস করো। আশ্চর্যের বিষয় হলো ইমাম দু'আ করছিলেন, আর কাযান আমীন আমীন বলে যাচ্ছিলেন।

কাযী আবুল আব্বাস নাজমুদ্দীন বলেন, ইমাম যখন কাযানের সামনে বক্তৃতা করছিলেন, তখন আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং নিজেদের জামা-কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। কি জানি কখন ইমামের উপর জল্লাদের তরবারী ঝলসে উঠবে এবং তার রক্তে আমাদের বস্ত্র রঞ্জিত হবে। কাযী নিযাম উদ্দীন আরো বলেন, কাযানের দরবার থেকে বের হয়ে এসে আমরা ইমামকে বললাম, আমরা আপনার সাথে যাবো না। আপনি তো আমাদেরকে প্রায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আপনার কারণে আমাদের উপর বিরাট মসীবত চলে আসার উপক্রম হয়েছিল। ইমাম তখন ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, বরং আমিই তোমাদের সাথে যাবো না। অতঃপর আমরা সকলেই তাঁকে রেখে চলে আসলাম। ইমাম একাই

রওয়ানা দিলেন। রওয়ানা দেয়ার সময় কাযান আবার দু'আ করার আবেদন করলেন। ইমাম পূর্বের দু'আর পুনরাবৃত্তি করলেন।

ইমামকে একাকী চলতে দেখে স্বয়ং কাযান একদল সৈন্য পাঠিয়ে ইমামের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। ইমামের একাকীত্বের খবর শুনে শহরের একদল লোক বের হয়ে এসে ইমামকে সঙ্গ দেয়ার কথাও জানা যায়। কাযী নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস বলেন, ইমাম নিরাপদে দামেস্কে ফিরে এলেন। ঐদিকে আমাদের অবস্থা এতই শোচনীয় হলো যে, রাস্তায় একদল লুটেরা বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করলো এবং সর্বস্ব খুইয়ে নিল। আমরা একদম উলঙ্গ হয়ে শহরে ফিরলাম।

অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ইমাম তাতারীর দরবার থেকে ফিরে আসলেন এবং নগরবাসীর জন্য নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখিয়ে আনলেন। তাতারীরা যাদেরকে বন্দী করেছিল, তাদেরকেও ছাড়িয়ে আনলেন। তাতারীদের বর্বরতার কাহিনী তিনি যেমন শুনেছিলেন, তেমনি নিজ চোখেও তাদের তান্ডব দেখেছিলেন। তারপরও তিনি একটুও বিচলিত হননি। তাতারী সম্রাটের মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে এবং তাতারী সেনাদের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করতে তিনি একটুও ভীতি অনুভব করেন নি। তিনি বলতেন, যার অন্তরে রোগ আছে সেই কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করতে পারে।

জিহাদের ময়দানে ইমামঃ

আল্লাহর দ্বীনকে সকল প্রকার কুসংস্কার-আবর্জনা ও শির্ক-বিদ'আত হতে পরিস্কার করার জন্য শাইখ যেমন আমরণ কলম ও জবান দ্বারা জিহাদ করেছেন, ঠিক তেমনি শাইখুল ইসলাম তাতারীদের বিরুদ্ধে স্বসস্ত্র সংগ্রাম করে ময়দানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিম উম্মার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য মুসলিমদেরকে তিনি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি নিজেও ময়দানে নেমে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে সম্রাট কাযানের নিকট প্রবেশ করে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তার সাহসিকতা দেখে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। ৭০২ হিজরী সালের রামাযান মাসে তাতারীদের

বিরুদ্ধে সিরিয়ার শাকহব নামক অঞ্চলে যেই যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে তিনি মুজাহিদদের কাতারের সর্বাগ্রে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধে তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। এমনি আরো অনেক যুদ্ধেই তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। মিশরের সুলতান যখন তাতারীদের হাতে দেশ সমর্পন করে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি সুলতানকে ধমক দিয়েছিলেন। জিহাদের প্রতি মুসলিমদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং নিজে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে মুসলিমদের অন্তর থেকে তাতারী আতঙ্ক দূরিভূত করে। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি মুসলিমদের অবহেলার কারণে তাদের কপালে যে দুর্দশা নেমে এসেছিল, কুরআন ও সুন্নার পথ বর্জন করার ফলে তারা রাজনৈতিকভাবে তারা যে দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল, ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله এর সংস্কার ও জিহাদী আন্দোলনে মুসলিমরা নতুন করে জেগে উঠেছিল। মুসলিমগণ নতুন করে জিহাদী চেতনা ফিরে পায়। তাতারীরা ইসলামী সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র বাগদাদ দখল করে খলীফাকে যবাই করে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তে রাজপথ রক্তাক্ত করে তাতারীরা যেভাবে একের পর এক অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সিরিয়ার দামেস্ক এবং মিশরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ইবনে তাইমীয়া رحمه الله মুসলিমদেরকে সুসংগঠিত করে সিরিয়া ও মিশরের দিকে তাতারীদের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে না দিলে মুসলিমদের ভাগ্যাকাশ কেমন হতো, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

অন্যায় ও অপকর্ম নির্মূলে ইবনে তাইমীয়া رحمه الله :

তাতারীরা দামেস্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শহরে প্রকাশ্যে মদ পানসহ নানা অপকর্ম ব্যাপকতা লাভ করে। কারণ তখন সিরিয়া এক সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন ছিল। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله একদল ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শহরে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন এবং মদের দোকানগুলোতে ঢুকে পড়েন। মদের পেয়ালা ও কুঁজো ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন এবং দোকানের মদ নালায় ঢেলে দিলেন। অন্যায় ও অপকর্মের আস্তানায় প্রবেশ করে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন, ইসলামের নির্দেশ বুঝাতেন এবং তাওবা করাতেন। প্রয়োজনে শাস্তি দিতেন। ইমামের অভিযানে সারা দামেস্ক শহর পুনরায় দ্বীনি পরিবেশ ফিরে পেল।

ভ্রান্ত তাসাউফের কবল থেকে ইসলামী আক্বীদার সংস্কারে ইবনে তাইমীয়া رحمه الله :

সাহাবী ও তাবেঈদের যুগ থেকে খালেস ইসলামী তাসাউফের একটি ধারা চলে আসছিল। ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনই ছিল এর একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীতে এর কর্মধারায় নানা আবর্জনা এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেল যে, মুসলিমদের এক বিরাট গোষ্ঠিও এই আবর্জনা ধোয়া পানি পান করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগল। হিজরী অষ্টম শতকে এসে সুফীবাদ এক গোমরাহী ও ভ্রান্ত মতবাদে পরিণত হয়। তাসাউফের লেবাস ধরে নির্ভেজাল ইসলামী আক্বীদার বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রীক দর্শন, সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈত্ববাদ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আবর্জনা মিশ্রিত সুফীবাদের দাবীদাররা ইলমকে যাহেরী-বাতেনীতে বিভক্ত করতে থাকে, একজনের বক্ষদেশ থেকে অন্যজনের বক্ষদেশে জ্ঞানের গোপন বিস্তার হয় বলে প্রচার করতে থাকে এবং কামেল পীর-মুরশিদ ও আল্লাহর প্রেমে পাগল ভক্তের জন্য শারীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাস তাসাউফের নামে মুসলিমদের বিরাট এক অংশের উপর চেপে বসে।

আল্লাহর অলী ও তাঁর নেক বান্দাদের ব্যাপারে অমুসলিমদের ন্যায় মুসলিমরাও বাড়াবাড়ি শুরু করে। তাদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে এবং নিজেদের দিলের মাকসুদ পূরা করতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেমগণও অলীদের কবরে ধরণা দিত।

ইসলামের নামে এই সব জাহেলীয়াতের অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খালেস তাওহীদের দিকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য এমন একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত, জাহেলীয়াতের সকল চেহারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে যিনি অবগত এবং যিনি জাহেলীয়াতের মূলোৎপাটন করে মুসলিমদের জন্য সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবী ও তাবেঈদের আমল থেকে নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমল তুলে ধরবেন। এই গুরু

দায়িত্বটি পালন করার জন্য হিজরী অষ্টম শতকে আল্লাহ তা‘আলা ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ চয়ন করেন। তিনি মুসলিমদের সামনে ইসলামের পরিচ্ছন্ন আক্বীদা্ বিশ্বাস তুলে ধরেন এবং সকল প্রকার শির্ক-বিদআত থেকে ইসলামকে পরিশুদ্ধ করেন।

মুসলিমদের আক্বীদাকে শির্কমুক্ত করা ও তার মূলোৎপাটনে ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ এর প্রচেষ্টা:

মানুষের রক্ত-মাংসের দেহটার স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, ঠিক তেমনি তার মধ্যে যেসব বিমূর্ত এবং অলৌকিক গুণাবলী রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এগুলোর জন্য কোন কৃতিত্ব মানুষের প্রাপ্য নয়। প্রাপ্য একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার। কিন্তু মানুষের গোমরাহীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় থেকেই মানুষ মানুষের পূজা করে আসছে। এটা জীবিত ও মৃত উভয় পর্যায়েই স্থান করে নিয়েছে। পীর পূজা, আওলীয়া পূজা, কবর পূজা, মাযার পূজা প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়েছে মানব সমাজে। রসূল ﷺ বলেন, মুসলিমগণ কোন দিন প্রকাশ্যে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবেনা। রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমরা অবশ্য প্রকাশ্য শির্ক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়নি। কিন্তু শির্ক মিশ্রিত কার্যকলাপ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মূর্তিপূজার পরিবর্তে তাদের একটি গ্রুপ আওলীয়া পূজা ও কবর পূজায় লিপ্ত রয়েছে। কবরের মধ্যে আবার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে শহীদদের মাযার। এগুলোকে ‘মাশহাদ’ বলা হয়। আওলীয়াদের মাযার ও শহীদের মাশহাদ কিছু কিছু জাহেল মুসলিমদের কাছে মসজিদের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা মসজিদের বদলে এগুলোতেই দান-খয়রাত করে, বাতি জ্বালায়, ধন-সম্পদ ওয়াক্ফ করে, এগুলোর উপর দালান-কোঠা ও গম্বুজ নির্মাণ করে। অনেক মাযারের চাকচিক্য ও গম্বুজ মসজিদের সৌন্দর্যকেও হার মানায়।

লোকেরা জাঁকজমকের সাথে বরকতের আশায় এগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করে, গরু-ছাগল নিয়ে যায়। আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হাজীদের

কাফেলার মতই দেখা যায় তাদের কাফেলা। এভাবে মসজিদের পরিবর্তে মাযার ও মাশহাদের দিকেই বিরাট এক শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে এই অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুসলিমদেরকে উদ্ধার করার জন্য ইমাম ইবনে তাইমীয়ার ﵀ মত একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল। তিনি অজ্ঞ ও জাহেল মুসলিমদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলো ইসলাম নয়; বরং ভিন্ন নামে মূর্তি পূজারই নামান্তর। তার রচনার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিমদের গোমরাহীর আলোচনা এবং কবর ও মাযার পূজার প্রতিবাদ।

৭০২ হিজরীতে সিরিয়া তাতারী আক্রমণ থেকে মুক্ত হবার পর ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ পুনরায় তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলী শুরু করেন। অধ্যাপনা, তাফসীর ও হাদীসের দার্স দান, ইসলামের নামে প্রচলিত শির্ক ও বিদ‘আত বর্জনের আহবান করেন। সেই সাথে শির্ক, বিদআত ও জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে অভিযানও পরিচালনা করেন। এ যুগে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে বসবাস করার কারণে ইসলাম বিরোধী অনেক আক্বীদা মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। সে সময় দামেস্কের অদূরে একটি বেদী ছিল। বেদীটি সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের মধ্যে অদ্ভুত ধরণের বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল। এটি মুসলিমদের জন্য বিরাট ফিতনায় পরিণত হয়েছিল। মুসলিমরা সেখানে মানত করতো।

৭০৪ হিজরীতে ইবনে তাইমীয়া ﵀ একদল মজুর ও পাথর কাটা মিস্ত্রি নিয়ে সেখানে হাযির হন। তাদের সহায়তায় বেদীটি কেটে টুকরা টুকরা করে নদীতে নিক্ষেপ করে শির্ক-বিদ‘আতের এই আস্তানাটির মূলোৎপাটন করেন। মুসলিমরা বিরাট একটি ফিতনা থেকে মুক্তি পায়।

ওয়াহদাতুল উজুদ ও সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামঃ

অষ্টম হিজরী শতকে দু’টি দার্শনিক মতবাদ মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ কে এ ভ্রান্ত মতবাদ দু’টির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়। একটি হলো ওয়াহদাতুল উজুদ এবং অন্যটি হুলুল ও ইত্তেহাদ। আমাদের ভারতবর্ষের

দার্শনিক পরিভাষায় এ মতবাদ দু'টিকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ। পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের সুফীদের মধ্যেও এ মতবাদ দু'টি প্রবেশ করে। আনন্দের বিষয় হলো, মুজাদ্দেদ আলফেসানী এই মতবাদ দু'টির বিরুদ্ধে প্রচন্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবে অতি দু:খের সাথে বলতে হয় যে, ভারতবর্ষের সুফীদের মধ্যে আজও এই মতবাদ দু'টির উপস্থিতি প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এখন পাঠকগণ প্রশ্ন করতে পারেন, আসলে এই মতবাদ দু'টির ব্যাখ্যা কী? ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এই মতবাদ দু'টির প্রধান প্রবক্তা মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, অস্তিত্ব মাত্র একটি। সৃষ্টির অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। (নাউযুবিল্লাহ) তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি, এ দু'টো পৃথক সত্তা হিসাবে তারা স্বীকার করেনা। বরং তাদের মতে স্রষ্টাই হলো সৃষ্টি আর সৃষ্টিই হলো স্রষ্টা। তাদের মতে বনী ইসরাঈলের যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। তারা আরো বলে, ফেরাউনের "আনা রাব্বুকুমুল আ'লা" অর্থাৎ আমি তোমাদের মহান প্রভু, এই দাবীতে সত্যবাদী ছিল। ইবনে আরাবী নূহ আলাইহিস সাল্লামের সমালোচনা করে বলে যে, তার কাওমের লোকেরা মূর্তি পূজার মাধ্যমে আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। আর তাঁর সময়ের মহাপ্লাবন ছিল মারেফতে ইলাহীর প্লাবন। এ প্লাবনে তারা ডুবে গিয়েছিল।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ ওয়াহদাতুল উজুদ ও সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মতবাদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করাকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

সৃষ্টি এবং স্রষ্টা কখনই এক হতে পারে না। আমরা মস্তিস্কের মধ্যে যা কল্পনা করি তার সবগুলোর অস্তিত্ব মস্তিস্কের বাইরে খুঁজে পাওয়া যায়না। আমার মাথায় দশহাত বিশিষ্ট এবং তিন মুখ বিশিষ্ট মানুষের কল্পনা জাগতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে এই ধরণের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে। মস্তিস্কের বাইরে যেসব বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, তা মূলতঃ দুই প্রকার।

(১) সৃষ্টি ও (২) স্রষ্টা।

পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা এমনিতেই হয়ে গেছে। প্রত্যেক জিনিসের একজন উদ্ভাবক ও কারিগর রয়েছে। তাদের উভয়ের স্বভাব এবং বৈশিষ্ট এক ও অভিন্ন নয়। বরং কম্পিউটারের বৈশিষ্ট এবং যে উহা তৈরী করেছে, তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট একরকম নয়। মহান আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান, কুদরত এবং ইচ্ছা দ্বারা এই আসমান-যমীন ও এতোদুভয়ের মধ্যকার সকল বস্তু তৈরী করেছেন। সুতরাং তিনি এবং তাঁর তৈরী মাখলুক এক হয় কিভাবে? তাঁর সুউচ্চ সিফাত এবং সৃষ্টির সাধারণ স্বভাব ও বৈশিষ্ট এক রকম হয় কিভাবে?

আল্লাহ্ ব্যতীত বাকী সকল বস্তু হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

"আল্লাহই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?" (সূরা সাজদাহ ৩২:৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবক। কিরূপে আল্লাহ্র পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। (সূরা আন'আম ৬:১০১)

বাস্তব কথা হচ্ছে, অস্তিত্ব একটি নয়; বরং দু'টি। একটি স্রষ্টার (আল্লাহর) অস্তিত্ব, আরেকটি সৃষ্টির অস্তিত্ব।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে দিবালোকের মত পরিস্কার করে বলা আছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি আরশের উপরে সমুন্নত, তার সুউচ্চ গুণাবলী সৃষ্টি জীবের গুণাগুণ, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সাথে মিশ্রিত নন, কোন সৃষ্টির ভিতরে নন; যেমন সুফীরা ধারণা করে থাকে। বরং তিনি সৃষ্টির বহু উপরে, সকল সৃষ্টি তার নীচে, তিনি আসমানের উপরে, আরশের উপর সমুন্নত। উপরে থাকাই আল্লাহর সত্তাগত সিফাত বা বিশেষণ।

দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের প্রতিবাদ, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের উপস্থাপনঃ

কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর সত্তা, তাঁর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, ফেরেশতা, আখেরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে যে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তা ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। রসূল ﷺ থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝার কোন সুযোগ নেই। অহীর উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সেই সাথে গায়েবী বিষয়গুলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। আব্বাসী খেলাফতকালে সরকারীভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণের গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুকে পড়ে। ইসলামী আক্বীদার উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি, পরিণাম, কিয়ামাত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ ধরণের অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নাহর পথ ছাড়া আর

কোন পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এসব চোখেও দেখা যায়না। কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে,

ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (সূরা শূরা ৪২:১১)"।

কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নাহর সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ দিয়ে গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে। তাদের জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলেম দাঁড়িয়ে যান। তারাও দার্শনিকদের জবাবে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক দার্শনিকদের জবাবে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের যুক্তিগুলো ছিল দুর্বল। এগুলো সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এমনসব জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, যার জবাব কালামশাস্ত্রবিদগণ খুজেঁ না পেয়ে তারা নিজেরাই সংশয়ে পড়েছে।

ইমাম রাযী শেষ বয়সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি ইলমে কালাম, দর্শন শাস্ত্রের উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছেন। শেষে তিনি এ সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে রোগীর রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়, এবং পিপাসার্তের পিপাসা মোটেই নিবারণ হয়না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতিই আমি নিকটতর পেয়েছি।

আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা ও গুনাবলী সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুসলিম দার্শনিকগণ যে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাতে মোটেই সন্তুষ্টি ছিলেন না। কারণ তার মোকাবেলায় কুরআন-সুন্নাহর যুক্তি-প্রমাণ অনেক সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, দ্ব্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী।

তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া আল্লাহর সত্তা ও গুনাবলী এবং ঈমানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যা আবশ্যক, কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে তিনি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি একাধিক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন এবং দার্শনিক কালামীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। ওয়াসেতীয়া, তাদমুরীয়া এবং হামুবীয়া এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমামের কারাবরণঃ

যুগে যুগে যারা সত্য দ্বীনের খেদমতে নিজেদের জীবন ও যৌবন ব্যয় করেছেন, তাদের কেউই যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পান নি। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করার কারণে স্বার্থবাদী ও বিদ্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হন। সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদীদের লোকেরা তাদের মতবাদ প্রচার করার সাথে সাথে প্রকাশ্যে মদ পান এবং সমস্ত হারাম কাজেই লিপ্ত হতো। কারণ তাদের মতানুযায়ী অস্তিত্ব যখন মাত্র একটি তখন হালাল হারামের পার্থক্য থাকবে কেন? শরীয়তেরই বাধ্যবাধকতা থাকবে কেন? তাদেরকে যখন বলা হলো এই বক্তব্য তো কুরআন-হাদীসের বিরোধী, তখন তারা বলল, কুরআন-হাদীসের দলীলের মাধ্যমে নয়; বরং কাশফের মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত। মোটকথা কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা, অলী-আওলীয়াদের উসীলা ধরা, তিন তালাকের মাসআ'লাসহ আরো অনেক কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷬ হিংসুকদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। কুচক্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এক পর্যায়ে তারা সরকারের সহায়তা লাভে সমর্থ হয়। মিশরের তদানীন্তন শাসককে তারা ইমামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। আর তখন সিরিয়া ও মিশর ছিল একই রাষ্ট্রভূক্ত। রাজধানী ছিল মিশরের কায়রোতে। সিরিয়া ছিল মিশরের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রদেশ। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা সহজেই সরকারকে প্রভাবিত করে ফেলে। তাদের প্ররোচনার ফলে শাহী ফরমানের মাধ্যমে ইমামকে কায়রোতে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ২২ রামাযান জুমু'আর দিন তিনি মিশরে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে কেল্লার জামে মাসজিদে সলাত পড়ার পর তিনি আলোচনা

শুরু করতে চান। কিন্তু তাঁর কিছু কিছু আক্বীদা-চিন্তা ইসলাম বিরোধী হওয়ার অভিযোগে তাকে কথা বলার অনুমতি না দিয়ে জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর কাযী ইবনে মাখলুফের নির্দেশে তাঁকে কেল্লার বরুজে কয়েকদিন আটক রাখার পর ঈদের রাতে মিশরের বিখ্যাত জুব কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।

তাঁর কারাবরণের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ইতিহাসের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ২১বার কারা বরণ করেছেন। যতবারই তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করে অন্যায় স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই তিনি সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শর্তসাপেক্ষ কারাগার থেকে বের হওয়ার সুযোগ তিনি একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জেলখানার ভিতরে তিনি দেখলেন কয়েদীরা নিজেদের মন ভুলাবার ও সময় কাটানোর জন্য আজে বাজে কাজ করছে। তাদের একদল তাস খেলছে। আরেকদল দাবা খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। সলাতের দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। খেলার ঝোকে সলাত কাযা হয়ে যাচ্ছে। ইমাম এতে আপত্তি জানালেন, তাদেরকে সলাতের প্রতি আহবান জানালেন এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলেন। তাদের পাপকাজগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার উপদেশ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই জেলখানার মধ্যে দ্বীনি ইলমের এমন চর্চা শুরু হয়ে গেল যে, সমগ্র জেলখানাটি একটি মাদরাসায় পরিণত হলো। অবস্থা এমন হলো অনেক কয়েদী মুক্তির ঘোষনা শুনেও আরো কিছুদিন শাইখের সংস্পর্শে থেকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

মূলতঃ সুফীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা, কবর ও মাযারের উদ্দেশ্যে সফর করা, তালাকের মাসআ'লা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি মাসআ'লা নিয়ে ইমামের সাথে বিরোধীদের দ্বন্ধের কারণেই তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়।

কারাগারে থেকেও ইমামের কর্মতৎপরতাঃ

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকে যারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তারা দুনিয়ার কোন বাধাকে বাধা মনে করেন না। অনুকূল-প্রতিকূল যে কোন পরিবেশেই তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অনুকূল পরিবেশের আশায় তারা কাজ ও প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে চুপচাপ বসে থাকেন না। দামেস্কের কারাগারে ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ একই পন্থা অবলম্বন করলেন। ইবাদাত-বন্দেগী ও কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি তিনি কলমযুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। বিশেষ করে নিজের লেখা বইগুলোতে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিতে থাকলেন। জেলখানার ভিতরে তিনি যা লিখতেন এবং লোকদের প্রশ্নের যেসব জবাব দিতেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই কারাগারের দেয়াল ভেদ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। আস্তে আস্তে জেলের পরিবেশ তাঁর কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছিলেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে। এক সময় তার কাছ থেকে দোয়াত-কলম, খাতাপত্র ও বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়া হলো। এগুলো ছিনিয়ে নেয়ার পর জেলখানার ভিতর থেকে ছেড়া কাগজ সংগ্রহ করে কয়লা দিয়ে তার উপরই লিখা শুরু করলেন। এতেই বেশ কয়েকটি পুস্তিকা লিখা হয়ে গেল।

ইমামের উপর মিথ্যারোপঃ

ইমামের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিল, তার সবগুলোই ছিল মিথ্যা ও বানায়োট। সমকালীন স্বার্থান্বেষী মহল,এক শ্রেণীর সুফী সম্প্রদায়, কালামশাস্ত্রবিদ এবং বিদ‘আতীরা শত্রুতার বশবতী হয়ে মনের জ্বালা মেটানোর জন্য এবং পার্থিব ফায়দা হাসিল করার জন্যই অভিযোগগুলো করেছিল। হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অভিযোগ নতুন কিছু নয়। আজও চলছে সেই ধারাবাহিকতা। কিন্তু বিরোধী ও বিদ‘আতীরা তাঁর উপর যেসব মিথ্যারোপ করেছে, তার মধ্যে আশ্চর্যজনক হলো বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার মিথ্যাচার। তিনি লিখেছেন, আমি ৭২৬ হিজরীর রামাযান মাসের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার দিন দামেস্ক শহরে পৌঁছলাম। তখন দামেস্ক শহরে হাম্বলী আলেমদের মধ্যে তকীউদ্দীন ইবনে

তাইমীয়া ﷺ ছিলেন অন্যতম। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন, তবে তার মস্তিস্কে কিছু সমস্যা ছিল!! দামেস্কবাসীরা তাঁকে খুব সম্মান করতো। তিনি জামে উমুবীর মিম্বারে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন। পরের দিন (জুমু'আর দিন) আমি মাসজিদে গিয়ে দেখি, তিনি আলোচনা করছেন। সেদিন তাঁর আলোচনার মধ্যে এটাও ছিল যে, তিনি বলে যাচ্ছিলেন, إن الله يترل إلى سماء الدنيا كترولي هذا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন আমার এই নামার মতই"। এই কথা বলে তিনি মিম্বারের সিঁড়িসমূহের একটি সিঁড়িতে নেমে আসলেন। তখন মালেকী মাযহাবের ফকীহ ইবনে যাহরা ﷺ তার বিরোধীতা করলেন। এতে জনগণ উত্তেজিত হয়ে মালেকী ফকীহকে প্রচুর মারপিট করলো। মারপিটের কারণে ফকীহর মাথার পাগড়ী পড়ে গেল......। এই ছিল ইবনে বতুতার মিথ্যাচার।

ইবনে বতুতার এই কথা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ হলো, সে উল্লেখ করেছে, ৭২৬ হিজরীর রামাযান মাসের নয় তারিখে দামেস্কে প্রবেশ করল। ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতে শাইখুল ইসলাম তখন দামেস্কের কারাগারে বন্ধী ছিলেন। নির্ভরযোগ্য আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ ৭২৬ হিজরীর শাবান মাসে কারাগারে প্রবেশ করেছেন। আর ৭২৮ হিজরী সালের যুলকাদ মাসে লাশ হয়ে সেখান থেকে বের হয়েছেন। (দেখুনঃ তাবাকাতুল হানাবেলা, বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! লক্ষ্য করুন এই মিথ্যুকের প্রতি। সে বলছে যে, রামাযান মাসের কোন এক জুমু'আর দিন ইমামকে জামে উমুবীর মিম্বারে আলোচনা করতে দেখল। এখন প্রশ্ন হলো জামে উমুবীর মিম্বার কি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল? বিশাল জামে উমুবী কি উপস্থিত সকল মানুষসহ কারাগারে প্রবেশ করেছিল? যাতে করে ইমাম সেখানে ভাষণ দিতে পারেন?

এখন কথা হলো, যারা বলে ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের সাথে তুলনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন

মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত তারা কি ইবনে বতুতার সেই মিথ্যা তথ্যের উপর নির্ভর করেছে?

আসল কথা হলো ইমাম কখনোই আল্লাহর কোন সিফাতকে মানুষের সিফাতের সাথে তুলনা করেন নি; বরং তিনি মুশাব্বেহাসহ অন্যান্য সকল বাতিল ফির্কার জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। তার লেখনীগুলোই এর উজ্জল প্রমাণ। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন তাঁর সুউচ্চ সিফাতগুলো সৃষ্টির সিফাতের মত নয়। দুনিয়ার আকাশে তাঁর নেমে আসা মাখলুকের নামার মত নয়। তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে যেভাবে নেমে আসা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই নেমে আসেন। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। আক্বীদা আল ওয়াসেতীয়ার বহু স্থানে তিনি এই মূলনীতিটি সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير "তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

ইমামের সুপরিসরে ইলমী খেদমতঃ

ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই লিখতেন। জেলখানায় ঢুকিয়েও যখন তাঁকে লেখালেখি থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলোনা, তখন তাঁর নিকট থেকে দোয়াত-কলম ও বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়া হলো। বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়ার পর তিনি স্মরণশক্তির উপর ভিত্তি করেই লেখালেখি চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাদির সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। নিম্নে আমরা তাঁর কয়েকটি বহুল প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম উল্লেখ করছি।

(১) মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমীয়া, এটি শাইখের সর্ববৃহৎ সংকলন, সৌদি আরব সরকার ৩৭ খন্ডে এটিকে ছাপিয়েছে,

(২) আল আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বীয়া,

(৩) আল-ফুরকানু বাইনা আওলিয়াইর রহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান,

(৪) আলকালিমুত তাইয়্যিব,

(৫) মিনহাজুস সুন্নাহ আন নাবুবীয়াহ,

(৬) যিয়ারাতুল কুবুর,

(৭) শরহুল উমদাহ,

(৮) আল জাওয়াবুস সহীহ,

(৯) রিসালাতুদ তাদমুরীয়াহ,

(১০) রিসালাতুল হামবীয়া,

(১১) মুকাদ্দিমাহ ফীত্ তাফসীর,

(১২) ইক্তেযাউস্ সিরাতিল মুস্তাকীম,

(১৩) আর্ রাদ্দু আলা ইবনে আরাবী,

(১৪) আস্ সিয়াসা আশ্ শারঈয়াহ এবং

(১৫) আলউ-বুদীয়াহ। এছাড়া দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আরো অনেক মূল্যবান কিতাব রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে পাঠকদেরকে মাকতাবাতুস শামেলার দ্বারস্থ হওয়ার অনুরোধ করা হলো।

পরলোকের পথে যাত্রাঃ

ইমামের বয়স শেষ হয়ে আসছিল। এমন সময় একদিন দামেস্কের গভর্ণর কারাগারে ইমামকে দেখতে আসলেন। গভর্ণর তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। জবাবে ইমাম বললেনঃ আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি, যারা আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। সুলতানের বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় নয়; বরং উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার কারণেই আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু আমি ঐসব লোকদেরকে ক্ষমা করতে পারিনা, যারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু। সত্য দ্বীনের প্রতি আক্রোশের কারণে যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং আমাকে কারারুদ্ধ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে।

৭২৮ হিজরীর ২২ যুলকাদ মাসে ৬৭ বছর বয়সে উপনীত হয়ে দামেস্কের কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷬ এ সময় তাঁর কাছেই ছিলেন। দুর্গের মুআয্যিন মাসজিদের মিনারে উঠে ইমামের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। মুহূর্তের মধ্যে শহরের সমস্ত মাসজিদে অলিতে-গলিতে, রাজপথে এবং সর্বত্রই ইমামের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলো। শেষবারের মত ইমামকে দেখার জন্য দুর্গের পথে জনতার ঢল নামলো। দুর্গের দরজা খুলে দেয়া হলো। গোসলের পর তাঁর জানাযা শহরের বৃহত্তম মাসজিদ জামে উমুবীতে আনা হয়। জামে উমুবী এবং রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বে আর কোথাও এত বড় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সালাফদের মানহাজের পক্ষে দীর্ঘ সংগ্রাম, যুক্তি-তর্ক, লেখালেখি, ফতোয়া দান, শিক্ষকতা, দাওয়াত এবং আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এভাবেই চলে গেলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে পার্থিব জীবনের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ পান নি। এমনকি বিবাহ করার সুযোগও পাননি।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র, বৈশিষ্ট এবং দ্বীনের পথে তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা আমাদের আজকের আলেম সমাজকে সজাগ করবে, প্রেরণা যোগাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বীনের ব্যাপারে যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন সয়ে যেতে প্রস্তুত হন, দ্বীনের উপর কোন প্রকার যুলুম বরদাশত করতে তিনি মুহূর্তকালের জন্যও প্রস্তুত হননি।

হে আল্লাহ! তুমি তোমাদের দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, সেবক ও মর্দে মুজাহিদ আমাদের প্রাণের শাইখকে তোমার রহমতের প্রশস্ত চাদর দ্বারা ঢেকে নাও, তোমার সুবিশাল জান্নাতে তাঁর ঠাই করে দাও এবং নাবী,সিদ্দীক, শুহাদা ও সালেহীনদের সংশ্রবে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে দাও। আমাদেরকেও তাদের সাথে কবুল করে নাও। আমীন

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷀ বলেনঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় এবং দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷀ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের অনুসরণ করে বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা পুস্তকটি লিখা শুরু করেছেন। সূরা তাওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখা রয়েছে। বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার মাধ্যমে নাবী ﷺ এর সুন্নাতেরও অনুসরণ করা হয়েছে। নাবী ﷺ যখন রাজা-বাদশাহদের কাছে পত্র লিখতেন তখন শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লিখতেন।

বিস্‌মিল্লাহ (بِسْمِ الله): এখানে با হরফে জারটি استعانة (ইস্তেআনা) তথা সাহায্য প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে যে শব্দ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে, তাকে ইসম বলা হয়। আরবী ব্যাকরণ বিদদের পরিভাষায় যে শব্দ কোন কালের সাথে যুক্ত না হয়েই সরাসরি নিজের অর্থ প্রকাশ করে, তাকে اسم (ইসম) বলা হয়।

جر (জার) এবং مجرور মাজরুর মিলে একটি উহ্য বিষয়ের সাথে متعلق (সম্পৃক্ত) হয়েছে। সেই উহ্য বিষয়টি 'আল্লাহ' শব্দের পরে হওয়া উচিত। যাতে করে এটি 'হাসর' তথা সীমিত অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ অর্থটি যেন এমন হয় যে, আমি আল্লাহর নামেই শুরু করছি, অন্য কারো নামে নয় এবং তাঁর কাছেই কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি, অন্য কারো কাছে নয়।

কেউ কেউ বলেছেনঃ এখানে উহ্য শব্দটি হচ্ছে فعل বা ক্রিয়া। অর্থাৎ بسم الله أقرأ أو أكتب "আমি আল্লাহর নামে পড়ছি বা লিখছি। এমনি যখন যে কাজ শুরু করা হবে, তখন সেই কাজের অর্থবোধক একটি فعل (ক্রিয়া) উহ্য থাকবে।

আবার কেউ কেউ মাসদার উহ্য মেনে থাকেন। অথাৎ بسم الله ابتدائي তথা আল্লাহ তা'আলার নামেই আমার শুরু

আল্লাহ (الله): শব্দটি মহান পবিত্র সত্তার জন্য নির্দিষ্ট একটি নাম। এর অর্থ হচ্ছে, তিনিই সমস্ত মাখলুকের ইবাদাত ও উলুহীয়াতের একমাত্র অধিকারী ও হকদার। এই মহান নামটি أله يأله ألوهة থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে عَبِدَ يُعْبَدُ عبادة অর্থাৎ তার ইবাদাত ও দাসত্ব করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ বা মাবুদ।

আর্ রহমান আর রহীম (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ): আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও অতি সুন্দর নাম সমূহের মধ্য হতে রহমান ও রহীম দু'টি সম্মানিত নাম। এই নাম দু'টি প্রমাণ করে, যেমন রহমত আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়, তিনি তেমন রহমত ও দয়ার গুণেই গুণান্বিত।

আল্লাহ্ তা'আলার الرحمن 'রহমান' নামটি সমস্ত সৃষ্টির উপর তাঁর ব্যাপক রহমতের প্রমাণ বহন করে। আর الرحيم 'রহীম' নামটির মধ্যে এমন রহমত রয়েছে, যা শুধু মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

"এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান" (সূরা আহযাব ৩৩:৪৩)।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার প্রাথমিক খুতবা

ভূমিকা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله বলেনঃ

الحمْدُ للهِ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسليمًا مَزِيدًا

"সেই আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। যেন তাকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। আর এ সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি তাওহীদের এই স্বীকৃতি প্রদান করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি।

আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রসূল। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের উপর অপরিমিত সালাত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله এই মূল্যবান কিতাবটি আল্লাহর প্রশংসা, তাওহীদ, রেসালাতের সাক্ষ্য এবং রসূল ﷺ উপর সলাত ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে শুরু করেছেন।

এর মাধ্যমে তিনি রসূল ﷺ সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন। কেননা রসূল ﷺ তাঁর সকল আলোচনা ও ভাষণ আল্লাহর প্রশংসা, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য এবং তাঁর নিজের প্রতি সলাত ও সালাম পেশ করার মাধ্যমেই শুরু করতেন। সেই সাথে শাইখুল ইসলাম নাবী ﷺ ঐ হাদীসের উপরও আমল করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন:

«كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ، فَهُوَ أَقْطَعُ»

"প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ যেই কাজ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দিয়ে শুরু করা হয় না, তা বরকতশূণ্য।

ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১]

অন্য বর্ণনায় আল্লাহর প্রশংসার স্থলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এসেছে।[২]

أقطع শব্দের অর্থ হচ্ছে বরকতশূণ্য হওয়া ও বরকত থেকে খালী হওয়া। হাদীসের এই উভয় বর্ণনাকে এইভাবে একত্রিত করা যেতে পারে যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে হাকীকী। আর আল-হামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে নিসবী ইযাফী।[৩]

الحمد لله: এখানে আলিফ লাম ইস্তেগরাক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রশংসার একমাত্র মালিক এবং হকদার হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।

الحمد প্রশংসা: শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, উত্তম গুণাবলী ও ভাল কর্মের প্রশংসা করা। আর ইসলামের পরিভাষায় হামদ এমন কাজের নাম, যার মাধ্যমে নিয়ামত প্রদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঘোষণা করে। এটি ذم (নিন্দার) বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

الله আল্লাহ: একটু পূর্বে আল্লাহর সম্মানিত এই নামের ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

الذي أرسل رسوله যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন: অগণিত নেয়ামতের কারণে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা আবশ্যক। আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যত নেয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে সর্বাধিক বড় নেয়ামত হচ্ছে তিনি তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন।

---

১. তবে হাদীসের সনদ দুর্বল। দেখুন: সুনানে আবূ দাউদ ৪৮৪০।

২. তবে হাদীসের সনদ খুবই দুর্বল। দেখুন: ইরওয়াউল গালীল ১।

৩. কিতাব লিখার শুরুতে সর্বপ্রথম যা দিয়ে শুরু করা হয় এবং যার পূর্বে অন্য কিছু থাকে না তাকে ইবতেদায়ে হাকীকী প্রকৃত প্রথম বা শুরু বলা হয়। আর যার পূর্বে অন্য কিছু থাকে, তাকে ইবতেদায়ে নিসবী ইযাফী বা তুলনামূলক প্রথম বা শুরু বলা হয়।

الرسول। **রসূল:** আভিধানিক অর্থে রসূল এমন পুরুষ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে রিসালাত তথা বার্তাসহ পাঠানো হয়। আর ইসলামী শারীয়াতের পরিভাষায় এমন পুরুষকে রসূল বলা হয়, যার প্রতি কোন একটি আসমানী শারীয়াতের অহী পাঠানো হয়েছে এবং তাকে সেই শারীয়াতের তাবলীগ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

الهدى। **হেদায়াত:** হেদায়াত হচ্ছে উপকারী ইলম। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নাবী ﷺ যেসব সত্য খবর, কল্যাণকর আদেশ-নিষেধ এবং অন্যান্য উপকারী বিধানমালা নিয়ে এসেছেন, তার সবগুলোই হেদায়াতের মধ্যে শামিল।

হেদায়াতের প্রকারভেদ: হেদায়াত শব্দটি দেখিয়ে দেয়া ও বর্ণনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾

"আর আমি সামূদ জাতির সামনে হেদায়াত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা পথ দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকা পছন্দ করলো " (সূরা হামীম সাজদাহ ৪১:১৭)। সুতরাং এই কাজ অর্থাৎ সঠিক রাস্তা দেখানো রসূলদের কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

নিশ্চয়ই তুমি সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করো"। (সূরা শুরা ৪২:৫২)

হেদায়াতের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সঠিক পথ কবুল করার তাওফীক দেয়া এবং ইলহাম করা। এটি কোন রসূল করতে পারেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ এটি করতে সক্ষমও নয়। নিম্নের আয়াতে এই প্রকার হেদায়াতের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾

"হে নাবী! তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়াত দান করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন (সূরা কাসাস: ৫৬)।

دين الحق সত্য দ্বীন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ আমল। দ্বীন শব্দটি কখনো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এর দ্বারা প্রতিদান ও বিনিময় উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

"প্রতিদান দিবসের মালিক" (সূরা ফাতিহা ১:৪)।

আবার কখনো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা ইবাদাত করা (বশ্যতা স্বীকার ও নত হওয়া) উদ্দেশ্য হয়। দ্বীনকে হকের দিকে সম্বোধিত করা মাওসুফকে সিফাতের দিকে এযাফতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মূলতঃ الدين الحق ছিল। الحق শব্দটি حق يحق -এর মাসদার। এর অর্থ সুসাব্যস্ত হয়েছে, সত্যে পরিণত হয়েছে, আবশ্যক হয়েছে। হকের বিপরীত হচ্ছে বাতিল।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর সত্য দ্বীনকে বিজয়ী করেন: অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তা'আলা দলীল-প্রমাণ, সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং জিহাদের মাধ্যমে এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর সমুন্নত করেন এবং পৃথিবীর অধীবাসীদের মধ্য হতে যারা এই দ্বীনের বিরোধীতা করবে, তাদের উপর তিনি এই দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। চাই তারা আরব হোক কিংবা অনারব হোক অথবা অন্য কোন দ্বীনের অনুসারী হোক। আল্লাহর এই ওয়াদা বাস্তবায়ন হয়েছে। মুসলিমগণ আল্লাহর রাস্তায় উত্তমভাবে জিহাদ করেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এর মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সুপ্রশস্ত হয়েছে। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমসহ সকল দিকেই এই দ্বীন ছড়িয়ে পড়েছে।

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহই এর সাক্ষী। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। তিনি তাঁর রসূলের সকল অবস্থা ও কর্ম সম্পর্কে অবগত এবং শত্রুদের মোকাবেলায় তিনি তার সাহায্যকারী। আল্লাহ তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর দাওয়াতকে শক্তিশালী করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে অকাট্য

প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন আল্লাহর সত্য রসূল। তিনি যদি মিথ্যুক হতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পৃথিবীতেই তাড়াতাড়ি কঠিন শাস্তি দিতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾

"যদি এ নাবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম"। (সূরা আল হাক্কাহ ৬৯:৪৪-৪৬)

وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ **আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই:** অর্থাৎ আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করার পর জবান দিয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই।

وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ **তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই:** 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক যে অর্থ রয়েছে, এই শব্দ দু'টির মধ্যে তারই তাগীদ (গুরুত্ব) রয়েছে। অর্থাৎ **وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ**-এর মাধ্যমে তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের মর্মার্থকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল মাবুদ হতে উলুহীয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং وحده (তিনি এক) এটি হচ্ছে ইছবাত তথা ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই, -এই কথার তাগীদ। لا شَرِيكَ لَه তাঁর কোন শরীক নেই, এটি হচ্ছে নাফীর জন্য তাগীদ স্বরূপ।

إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا **আমি তাওহীদের এই স্বীকৃতি প্রদান করছি:** إقرارا ও توحيدا এ শব্দ দু'টি হলো মাসদার। এ দু'টি শব্দ পূর্বোক্ত তাওহীদের সাক্ষ্য **وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ**-এর মর্মাথকে শক্তিশালী করেছে।

অর্থাৎ আমি জবানের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভাষায় তাওহীদের স্বীকারোক্তি প্রদান করছি এবং আমার প্রতিটি ইবাদাতকে আল্লাহর জন্য খালেস (আন্তরিকতার সাথে) করছি। চাই সে ইবাদাত মুখের কথার মাধ্যমে হোক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে হোক অথবা অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক।

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূলঃ

অর্থাৎ আমি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করছি এবং জবানের মাধ্যমে স্বীকার করছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ ﷺ সমস্ত মানুষের নিকট রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। রসূলের রেসালাতের এই সাক্ষ্যকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। এ দু'টি সাক্ষ্য প্রদানের একটি অন্যটির পক্ষ হতে যথেষ্ট নয়। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল, এই কথার দ্বারা আহলে ইফরাত তথা রসূলকে নিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্তদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেই সাথে আহলে তাফরীত অর্থাৎ রসূল ﷺ দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান কারীদের এবং তা থেকে যারা এমনভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, যাতে মনে হয় তিনি আল্লাহর রসূলই নন, এর মাধ্যমে তাদেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। সুতরাং তিনি আল্লাহর বান্দা, এই সাক্ষ্য তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে এবং তাঁর নিজস্ব মর্যাদার উপরে উঠানোকে অস্বীকার করেছে।

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল, এই সাক্ষ্য দেয়ার দাবী হচ্ছে, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তিনি যে আদেশ করেছেন, তাতে তাঁর আনুগত্য করা, তিনি যেই সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি যেই শারীয়ত নিয়ে এসেছেন, তাতে কেবল তাঁরই অনুসরণ করা।

صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের উপর অপরিমিত শান্তির ধারা বর্ষণ করুনঃ সলাত শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'আ। আল্লাহর পক্ষ হতে রসূল ﷺ এর

উপর সলাত পেশ করার অর্থ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো, যা ইমাম বুখারী ﷬ আবুল আলীয়া হতে স্বীয় সহীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল ﷺ এর উপর দুরূদ পেশ করেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের কাছে রসূলের প্রশংসা করেন।

وعلى آله তাঁর পরিবারের উপর: কোন ব্যক্তির 'আল' বলতে ঐ সমস্ত লোককে বুঝানো হয়, যারা তার সাথে আত্মীয়তার মজবুত বন্ধনে বা অন্য কোন গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। রসূল ﷺ এর'আল' দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম মত হচ্ছে, এখানে 'আল' দ্বারা ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করে।

وأصحابه এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর: أصحاب শব্দটি صاحب শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ সাহাবীগণ। এখানে আমের (ব্যাপকার্থবোধক শব্দের) উপর খাসকে (নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দকে) আতফ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে 'আল' উল্লেখ করা হয়েছে। 'আলে'র মধ্যে রসূল ﷺ এর সাহাবী এবং পরবর্তীতে যারা আগমন করবে ও তাঁর দ্বীন পালন করবে তারাও শামিল।

যেই মুসলিম ঈমানদার অবস্থায় নাবী ﷺ কে দেখেছেন এবং ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন, তিনিই হলেন সাহাবী।

وسلم تسليمًا مزيدًا আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর উপর অগণিত সালাম বর্ষণ করুন: سلام (সালাম) শব্দটি ইসলামের অভিবাদন, সম্মান, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা প্রদান অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথবা সালাম অর্থ মুক্ত ও নিরাপদ হওয়া। অর্থাৎ সকল ত্রুটি ও মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত হওয়া। مزيدا শব্দটি زيادة ক্রিয়ামূল হতে ইসমে মাফউল। 'যিয়াদাহ' অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি সলাত পেশ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি সলাত ও সালাম পাঠাও (সূরা আহযাব ৩৩:৫৬)।[৪]

---

৪. আভিধানিক দিক থেকে সলাত শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হলেও ব্যবহারের স্থান অনুযায়ী সলাতের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ হতে নাবী-রসূল কিংবা সৎ বান্দাদের প্রতি সলাত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিকট তাঁর নাবীর ও সৎবান্দাদের প্রশংসা করেন, তাদের নাম বুলন্দ করেন, তাদের কাজে বরকত দেন এবং তাদের প্রতি নিজের রহমত বর্ষণ করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

"তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দু'আ করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান" (সূরা আহযাব ৩৩:৪৩)।

সলাত শব্দটি ফেরেশতাদের পক্ষ হতে আল্লাহর নাবীর জন্য ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে তারা আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য দু'আ করেন। আল্লাহ যেন তাকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তার শারীয়াতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং একমাত্র তাকে মাকামে মাহমুদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি দুরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠাও" (সূরা আহযাব: ৫৬)।

আর ফেরেশতাদের পক্ষ হতে সাধারণ মুমিনদের জন্য যখন সলাত শব্দটি ব্যবহৃত হবে, তখনো এর দ্বারা মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের দু'আ ও মাগফিরাত কামনা উদ্দেশ্য।

আর সলাত শব্দটি যদি এক মুমিনের পক্ষ হতে অন্য মুমিনের জন্য ববহৃত হয়, তখনো এর দ্বারা দু'আ উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"হে নাবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত নিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো এবং তাদের জন্য রহমতের দু'আ করো। তোমার দু'আ তাদের সান্তনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন" (সূরা তাওবা: ১০৩)।

আর সলাত শব্দটি যখন বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হবে তখন এর দ্বারা মুসলিমদের নিকট পরিচিত সেই ইবাদাত উদ্দেশ্য হবে, যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে কতিপয় কাজ ও কথার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এর শুরু তাকবীরে তাহরীমাহ দ্বারা এবং শেষ হয়

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অনুসরণ করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ এখানে সলাত ও সালামকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।

الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ

মুক্তিপ্রাপ্ত দল

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেনঃ

أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

অতঃপর এই হচ্ছে কিয়ামাত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষদের মধ্য হতে নাজাত ও সাহায্য প্রাপ্ত দল

ব্যাখ্যাঃ বাক্যের এক রীতি থেকে অন্য রীতিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় আরবী ভাষায় أما بعد ব্যবহার করা হয়। ভাষণ দেয়ার সময় এবং চিঠি লিখার সময় রসূল ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করে أما بعد ব্যবহার করা সুন্নাত। নাবী ﷺ খুতবা দেয়া এবং চিঠি লিখার সময় 'আম্মা বা'দ' ব্যবহার করতেন।

এই কিতাবটি সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী আক্বীদা্ ও ঈমানের যেসব বিষয়কে শামিল করেছে, শাইখুল ইসলাম هذا ইসমে ইশারার মাধ্যমে সে দিকেই ইংগিত করেছেন। শাইখুল ইসলাম هو الإيمان بالله.....الخ দ্বারা আক্বীদার বিষয়গুলোর বর্ণনা শুরু করেছেন।

সালামের দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা বলেন فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "কাজেই তুমি নিজের রবের জন্যই সলাত সম্পাদন করো এবং তাঁর জন্যই কুরবানী করো" (সূরা কাওছারঃ ২)।

اعتقاد শব্দটি বাবে ইফতিআলের মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বলা হয় اعتقد كذا সে এ রকম আক্বীদা গ্রহণ করেছে। ইহা ঠিক ঐ সময়ই বলা হয়, যখন কেউ কোন বিষয়কে তার নিজের আক্বীদা হিসাবে গ্রহণ করে। আর যে বিষয়ের সাথে মানুষ তার অন্তরের বন্ধন তৈরী করে উহাকে আক্বীদা বলা হয়। যেমন আপনি বলে থাকেন اعتقدت عليه القلب والضمير "আমি এই বিশ্বাসের উপর অন্তর-মনকে বেধে দিয়েছি। আক্বীদা শব্দটি আরবদের কথা عقد الحبل إذا ربطه থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখল। এই কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন সে কোন জিনিসকে রশি দিয়ে বেধে রাখে। অতঃপর এই শব্দটি অন্তরের বিশ্বাস ও সুদৃঢ় সংকল্পের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

ফির্কাহ অর্থ হচ্ছে দল ও জামা'আত। নাজী ফির্কা ঐ জামা'আতকে বলা হয়, যারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে রেহাই পাবে। তাদের বৈশিষ্ট্য রসূল ﷺ এর এই হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন:

وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَل

"আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে সমস্ত লোক তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা কিয়ামাত পর্যন্ত সেই দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না"।[৫]

المنصورة সাহায্যপ্রাপ্ত: অর্থাৎ তারা কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর আল্লাহর সাহায্য ও মদদ পেয়ে শক্তিশালী থাকবে। এখানে 'কিয়ামাত পর্যন্ত' কথাটির মর্ম হচ্ছে কিয়ামাতের আগে যেই বাতাস এসে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির রূহ কবয করবে, সেই বাতাস থেকে উদ্দেশ্য হল এ বাতাসই হবে সেই সময়ের মুমিনদের জন্য কিয়ামাত স্বরূপ।

---

৫ . সহীহ বুখারী ৩৬৪১, সহীহ মুসলিম ১৯২০, তিরমিযী ২২২৯, আবূদাউদ ৪২৫২, ইবনে মাজাহ ৩৯৫২, মুসনাদে আহমাদ।

আর যেই কিয়ামাতের দিন দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তা কেবল নিকৃষ্টতম লোকদের উপরই কায়েম হবে। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

যতদিন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলা হবে, ততদিন কিয়ামত হবে না।[৬]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন:

يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

"কিয়ামাতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। এই বাতাসের সুঘ্রাণ হবে কস্তুরীর সুঘ্রাণের মত এবং রেশমের মত নরম। সেদিন যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সেও এই বাতাসের কারণে মৃত্যু বরণ করবে। এরপর কেবল খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। এই নিকৃষ্ট লোকদের উপরই কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে।[৭]

---

৬. সহীহ মুসলিম ১৪৮, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী ২২০৭, মুসনাদে আহমাদ।
৭. সহীহ মুসলিম ১৯২৪।

أهلُ السنة والجماعة

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷀ বলেনঃ

أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত।

أهلِ السنة والجماعة আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত: الفرقة শব্দ হতে বদল হিসাবে أهلِ শব্দের লাম বর্ণে যের – দিয়ে পড়া হয়েছে। অথবা উহ্য মুবতাদার খবর হিসাবে তাতে পেশ– ُ দিয়ে পড়া যেতে পারে। বাক্যের প্রকাশ্য রূপটি এমন هم أهلُ السنة والجماعة অর্থাৎ সেই নাজাতপ্রাপ্ত ফির্কার লোকেরা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত।[৮]

السنة সুন্নাত: সুন্নাত ঐ পথকে বলা হয়, যার উপর স্বয়ং রসূল ﷺ ছিলেন। অন্য অর্থে রসূল ﷺ এর কথা, কাজ ও সমর্থন সমূহকে সুন্নাত বলা হয়।

বিদ‘আতীরা যেমন বিভিন্ন মত ও পথের দিকে নিজেদেরকে সম্বোধিত করে, ফির্কায়ে নাজিয়ার লোকেরা তাদের খেলাফে সবকিছু বাদ দিয়ে যেহেতু শুধু রসূল ﷺ সুন্নাতকেই মেনে চলেন, সেই কারণে তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বলা হয়।

---

৮. আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে যারা রসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামদের পথের অনুসারী। তাঁরা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রসূল ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে। এ জন্য তাদেরকে আহলুস্ সুন্নাত বা আহলুল হাদীস বলা হয়। এমনিভাবে তাঁরা এই উম্মাতের প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের পথ অনুসরণ করেন। কারণ তারা ছিলেন রসূল ﷺ সাথী। তাঁরা অতি নিকটে থেকে অহী নাযিল প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রসূল ﷺ এর কাছ থেকে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং রসূল ﷺ এরপর তাঁরাই অনুসরণের অধিক হকদার।

বিদ‘আতীদেরকে তাদের বিদ‘আতের দিকেই সম্বন্ধ করা হয়; সুন্নাতের দিকে নয়। যেমন বলা হয় কাদরীয়া সম্প্রদায়ের লোক, মুরজীআ সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি।

কখনো তাদেরকে তাদের ইমামের দিকেও সম্বন্ধ করা হয়। যেমন জাহমীয়াদেরকে তাদের ইমাম জাহাম বিন সাফওয়ানের দিকে সম্বন্ধ করে জাহমীয়া বলা হয়।

আবার কখনো বিদ‘আতীদের নিকৃষ্ট কর্মসমূহের দিকেও নিসবত করা হয়। যেমন আবু বকর ও উমার এবং তাদের খেলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে শিয়াদের একটি দলকে রাফেযী এবং আলী ﷺ এর দল ত্যাগ করে যারা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তাদেরকে খারেজী বলা হয়।

الجماعة **জামা‘আত:** আভিধানিক অর্থে মানুষের ঐক্যবদ্ধ একটি দলকে জামা‘আত বলা হয়। তবে এখানে জামা‘আত দ্বারা ঐ সব লোক উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ﷺ এর সুন্নাত দ্বারা সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা হলো সাহাবী এবং যারা উত্তমভাবে সাহাবীদের অনুসরণ করে, যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন: যারা সত্যের অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছেন জামা‘আত। আপনি যদি একাই সত্যের অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি একাই একটি জামা‘আত সমতুল্য। যখন আপনি ব্যতীত হকের অনুসারী অন্য কোন লোক থাকবে না, তখন আপনি একাই একটি জামা‘আত বলে গণ্য হবেন।

أركان الإيمان

ঈমানের রুকনসমূহ

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেনঃ

وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

উহা অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার বিষয়গুলো হলো আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসের প্রতি এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ব্যাখ্যাঃ এখানে هو 'উহা' দ্বারা ফির্কা নাজিয়ার আক্বীদা-বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে।

الإيمان। বিশ্বাসঃ ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সত্যায়ন করা। ইয়াকুব عليه السلام এর পুত্ররা যখন তাদের ভাই ইউসুফকে কূপে ফেলে দিয়ে তাদের পিতার কাছে এসে বললঃ

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ في الآية (17) من سورة يوسف

"আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফের ১৭ নং আয়াতে ইউসুফ عليه السلام এর ভাইদের কথা উদ্ধৃত করেছেন।

আর ইসলামী শারীয়তের পরিভাষায়ঃ

أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح

জবানের স্বীকারোক্তি, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করাকে ঈমান বলা হয়।

আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসের প্রতি এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, এই ছয়টি হচ্ছে ঈমানের রুকন। আল্লাহর কিতাব ও রসূল ﷺ এর সুন্নাতের যে সঠিক পদ্ধতিতে এই ছয়টি রুকনের বর্ণনা এসেছে, একসাথে সেই রুকনগুলোর প্রতি বিশ্বাস না করলে কারো ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।

এই রুকনগুলো হচ্ছেঃ

১। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالله): আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনিই প্রত্যেক জিনিসের একমাত্র রব ও মালিক। তিনি সিফাতে কামালিয়ার (উত্তম ও পূর্ণ গুণাবলীর) দ্বারা গুণান্বিত এবং প্রত্যেক দোষ-ক্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত। সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা যে, তিনিই একমাত্র বান্দার এবাদতের হকদার, এতে তাঁর কোন শরীক নেই এবং ইলম ও আমালের মাধ্যমে এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকা।

২। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالملائكة): ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য হলো, অন্তর দিয়ে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে, তারা ঠিক সে রকমই, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾

"তারা তো মর্যাদাশীল বান্দা, তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধু তাঁর হুকুমেই কাজ করে"(সূরা আম্বিয়া ২১:২৬-২৭)।

আল্লাহর কিতাব ও রসূল ﷺ সুন্নাত বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা ও তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, তাদের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তারা

সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করে। এই সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।

৩। আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান (الإيمان بالكتب): অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলদের উপর যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলোকে সত্যায়ন করা। আরো বিশ্বাস করা যে, কিতাবগুলোতে যা আছে, তা আল্লাহর কালাম। তা সত্য, আলোর দিশারী এবং তাতে রয়েছে মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট হেদায়াত।

৪। **রসূলদের প্রতি ঈমান (الإيمان بالرسل):** আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য যে সমস্ত নাবী ও রসূল পাঠিয়েছেন তাদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। তারা যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তাতে তারা সত্যবাদী। তারা তাদের প্রভুর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না; বরং তাদের সকলের উপর ঈমান রাখি।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রতি ঈমান রাখি এবং তাদের মধ্য হতে যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান রাখি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾

"আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে বহু রসূলের ঘটনা বর্ণনা করেছি এবং এমন আরো অনেক রসূল রয়েছেন, যাদের কথা তোমাকে বলিনি"। (সূরা নিসা ৪:১৬৪)

রসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন أولوا العزم অর্থাৎ আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রচারে সুদৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী রসূলগণ। তারা হলেন নূহ, عليه السلام ইবরাহীম, মুসা, عليه السلام ঈসা عليه السلام এবং মুহাম্মাদ ﷺ। সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের পরে ছিলেন অন্যান্য রসূলগণ। অতঃপর নাবীগণ। নাবী-রসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশেষ হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ।

নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে:

নাবী ঐ পুরুষ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে শারীয়তের অহী পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাঁকে তাবলীগ করার আদেশ দেয়া হয়নি।

আর রসূল ঐ পুরুষ লোককে বলা হয়, যার কাছে আল্লাহর শারীয়ত পাঠানো হয়েছে এবং সেই শারীয়তের তাবলীগ করার আদেশও দেয়া হয়েছে।

৫। **পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান (الإيمان بالبعث):**

এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামত দিবসে মৃতদেরকে তাদের কবর হতে জীবিত অবস্থায় বের করার প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

কবর হতে জীবিত অবস্থায় বের করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং রসূল ﷺ তাঁর পবিত্র সুন্নাতে আমল অনুযায়ী তাদেরকে যে পদ্ধতিতে বিনিময় দেয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই তাদেরকে বিনিময় প্রদান করবেন।

৬। **তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করা (الإيمان بالقدر خيره وشره):** তাকদীরের ভাল ও মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ হচ্ছে, অন্তর দিয়ে এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই সমস্ত বস্তুর তাকদীরসমূহ এবং উহার সময়কাল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে কী রয়েছে এবং তা সে কখন পাবে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই অবগত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম মোতাবেক উহাকে লাওহে মাহফুযে লিখে দিয়েছেন। অতঃপর স্বীয় ক্ষমতা ও ইচ্ছা দ্বারা প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার নির্ধারিত সময়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ভাল-মন্দ প্রত্যেক সৃষ্টিই তাঁর ইলম, তাঁর নির্ধারণ, তাঁর ইচ্ছা অনুপাতেই হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ

তা'আলা যা চান, তা হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না।

এই ছিল ঈমানের মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইনশা-আল্লাহ এই মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা

কোন রকম পরিবর্তন, বর্জন ও সাদৃশ্যকরণ ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেনঃ

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পবিত্র সুন্নাতে আল্লাহর যে মহান গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, কোন প্রকার تحريف (পরিবর্তন), تعطيل (অস্বীকার ও বাতিল), تكييف (পদ্ধতি ও ধরণ বর্ণনা) এবং কোন প্রকার تمثيل (উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ) করা ব্যতীতই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করাও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল।

....

ব্যাখ্যাঃ যেসব মূলনীতির উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ তা সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর এবার সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া শুরু করেছেন। মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সর্বাগ্রে প্রথম মূলনীতি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে আল্লাহর ঐ সুমহান সিফাতগুলোর প্রতি বিশ্বাস করাও শামিল হবে, যদ্বারা তিনি তাঁর কিতাবে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা যদ্বারা তাঁর সম্মানিত রসূল ﷺ পবিত্র সুন্নাতে তাঁকে গুণান্বিত করেছেন। ঐ সিফাতগুলো আমরা আল্লাহর জন্য ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করবো, যেভাবে তা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের

সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিফাতগুলো যে শব্দে বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলো যে অর্থ প্রদান করেছে, তা সহকারেই আমরা আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য সাব্যস্ত করি।

শব্দগুলোর কোন পরিবর্তন করি না, তার অর্থগুলোও বাদ দেই না এবং আল্লাহর সুমহান সিফাতগুলোকে আমরা মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনাও করি না।

এগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা কেবল আল্লাহর কিতাব ও রসূল ﷺ এর সুন্নাতের উপরই নির্ভর করি। কোন অবস্থাতেই আমরা এতে কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত সীমা অতিক্রম করি না। কেননা আল্লাহর সিফাতগুলো توقيفية তথা অহীর উপর নির্ভরশীল।

التحريف। পরিবর্তন: তাহরীফ অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করা এবং কোন জিনিসকে তার আসল অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা। বলা হয় انحرف عن كذا। লোকটি এই অবস্থান থেকে সরে গিয়েছে। এই কথা ঠিক তখনই বলা হয়, যখন লোকটি তার সঠিক অবস্থান থেকে সরে যায়। আল্লাহর সিফাতে তাহরীফ দুইভাবে হতে পারে।

(১) তাহরীফে লাফযী: যে শব্দসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর সিফাতগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে অন্য শব্দ দ্বারা বদল করাকে তাহরীফে লাফযী তথা শাব্দিক পরিবর্তন বলা হয়। এই প্রকার তাহরীফ এক শব্দের সাথে অন্য শব্দ বা অক্ষর যুক্ত করে অথবা অক্ষর কমানোর মাধ্যমে হতে পারে কিংবা শব্দের মধ্যকার অক্ষরের হরকত (জের, যবর ও পেশ) পরিবর্তন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

যেমন গোমরাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

“দয়াময় আল্লাহ আরশে সমুন্নত হয়েছেন” (সূরা ত্বহা ২০:৫)

-এর মধ্যে استوى শব্দকে পরিবর্তন করে استولى বানিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর আয়াতের মধ্যে তারা একটি অক্ষর তথা ي এবং واو -এর মাঝখানে লাম অক্ষর বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনি তারা আল্লাহর বাণী:

وَجَاء رَبُّكَ

"এবং তোমার রব আগমন করবেন" (সূরা ফাজর ৮৯:২২)

-এর মধ্যে একটি শব্দ বাড়িয়ে বলেছে وَجَاءَ أَمْرُ رَبُّكَ "এবং তোমার রবের আদেশ আগমন করবে"।

এখানে তারা أمر শব্দটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর 'আসা' সিফাতকে আল্লাহর আদেশ আসা দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। এমনি তারা আল্লাহর বাণী:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

"আল্লাহ মূসা ﷺ এর সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়"। (সূরা নিসা ৪:১৬৪)

এখানে তারা আল্লাহ তা'আলার সুমহান নাম اللهُ শব্দের ه অক্ষরের পেশকে যবর দ্বারা পাঠ করে থাকে। তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ মূসা ﷺ এর সাথে কথা বলেননি; বরং মূসা ﷺ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে কথা বলা যে আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের অন্যতম একটি গুণ, এটিকে অস্বীকার করার জন্য তারা পেশকে যবর দ্বারা বদল করার মাধ্যমে আল্লাহর কালামকে মূসার কালামে পরিণত করতে চাচ্ছে।

(২) তাহরীফে মা'নাবী। আর দ্বিতীয় প্রকার তাহরীফ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহের অর্থকে পরিবর্তন করে ফেলা। যেসব শব্দের মধ্যে আল্লাহর সিফাতের বর্ণনা এসেছে, সেগুলোর আসল অর্থ পরিবর্তন করে অন্য অর্থ প্রদান করাকে تحريف معنوي তথা শব্দগত পরিবর্তন বলা হয়।

যেমন الرحمة (দয়া করা) আল্লাহর সিফাতসমূহের অন্যতম একটি সিফাত। কিন্তু বিদ‘আতীরা এটিকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে না। তারা বলে রহমত অর্থ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানের ইচ্ছা করা। এমনি তাদের মতে আল্লাহ তা‘আলা ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করা।

التعطيل বাতিল ও অকর্মন্য করা: তা’তীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খালি করা। যেমন বলা হয় عطله অর্থাৎ উহাকে খালী করে দিল। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা‘আলার সিফাতগুলো অস্বীকার করা।

তাহরীফ ও তা’তীলের মধ্যে পার্থক্য হলো কুরআন ও হাদীসের দলীলের মাধ্যমে যে সঠিক অর্থটি সাব্যস্ত হয়, তা অস্বীকার করে তাকে অন্য একটি ভুল অর্থ দ্বারা বদল করাকে تحريف বলা হয়। আর সঠিক অর্থকে অন্য অর্থ দিয়ে বদল না করে সঠিক অর্থকেই অস্বীকার করার নাম تعطيل।

যেমন ‘মুফাওবেযা’ সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে। এরা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে; কিন্তু সেগুলোকে অন্য অর্থ দ্বারা বদল করে না। সে হিসাবে প্রত্যেক **محرف** (রদবদলকারীই) **معطل** (বাতিল কারী); কিন্তু প্রত্যেক বাতিল কারী রদবদলকারী নয়।

التكييف আল্লাহর সিফাতের ধরণ ও কায়া নির্ধারণ করা: যেমন আরবীতে বলা হয় كيف الشيئ সে বস্তুটির ধরণ বর্ণনা করল। এই কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন সে বস্তুটির জন্য নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত ধরণ ও আকার নির্ধারণ করে। আল্লাহর সিফাতের কাইফিয়াত বর্ণনা করার অর্থ হলো উহার জন্য নির্দিষ্ট ধরণ ও কায়া নির্ধারণ করা এবং তার জন্য বিশেষ কোন অবস্থা স্থির করা।

আল্লাহর সিফাতের ধরণ ও কায়া স্থির করা কোন মানুষের জন্য সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহর সিফাতের প্রকৃত অবস্থা ও ধরণ ঐ সব বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত, যার ইলম কেবল আল্লাহ তা‘আলার কাছেই রয়েছে। মাখলুকের পক্ষে সেই জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। আল্লাহর সিফাত তাঁর পবিত্র সত্তার

অনুগামী। তাই আল্লাহর পবিত্র সত্তার ধরণ সম্পর্কে মারেফত হাসিল করা যেমন সম্ভব নয়, অনুরূপ সিফাতের প্রকৃত রূপ ও ধরণ সম্পর্কে জানাও সৃষ্টির পক্ষে অসম্ভব।

ইমাম মালিক رحمه الله কে -আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো- ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন" (সূরা ত্বহা ২০:৫)।

كيف استوى আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন? জবাবে ইমাম মালেক رحمه الله বললেন:

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة

'আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত'।

আল্লাহ তা'আলার সব সিফাতের ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

التمثيل তামছীল তথা আল্লাহর সিফাতের উপমা ও নমুনা বর্ণনা করা: আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে এই কথা বলা যে, আল্লাহর সিফাতগুলো মানুষের সিফাতসমূহের মতই। যেমন কেউ বলল আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতই এবং আল্লাহর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মতই। আল্লাহ তা'আলা এই ধরণের কথার অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"(সূরা শুরার ৪২:১১)। সুতরাং আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, উহা আমাদের সিফাতের অনুরূপ কিংবা আমাদের সিফাতের সাথে তুলনীয় অথবা হুবহু আমাদের সিফাতের মতই। যেমন বলা জায়েয নয়

যে, আল্লাহর সত্তা আমাদের সত্তার অনুরূপ অথবা উহা আমাদের সত্তার সাথে তুলনীয়।

সুতরাং তাওহীদপন্থী মুমিনগণ আল্লাহর সকল সিফাত ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করেন, যেভাবে সাব্যস্ত করলে তাঁর মর্যাদাও বড়ত্বের জন্য শোভনীয় হয়। অপর পক্ষে معطلة (আল্লাহর সিফাতে অবিশ্বাসী) লোকেরা আল্লাহর সকল সিফাতকে অথবা তাঁর কতক সিফাতকে অস্বীকার করে এবং মুশাব্বেহা (আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের লো কেরা আল্লাহর সিফাতকে এমনভাবে সাব্যস্ত করে, যা আল্লাহ তা'আলার শান ও মর্যাদার সাথে শোভনীয় নয়; বরং তা কেবল মাখলুকের জন্যই প্রযোজ্য হয়।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেনঃ

بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই আল্লাহর মত নয়, অথচ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অতএব আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেই সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, উহাকে তারা তাঁর থেকে বাদ দেয়না এবং আল্লাহর কালামকে আসল স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে না।

....

ব্যাখ্যাঃ কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব সিফাত (গুণাবলী) রয়েছে, কোন প্রকার **تحريف** (পরিবর্তন করা), **تعطيل** (অস্বীকার ও বাতিল করা), **تكييف** (পদ্ধতি ও ধরণ বর্ণনা করা) এবং কোনো প্রকার **تمثيل** (উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা) ব্যতীতই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব।

এ কথা বলার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান কী? তা বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং তিনি বলেছেন, সঠিক ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতেই তারা আল্লাহ তা'আলার সেই সিফাতগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। সিফাতগুলোকে প্রকৃত অর্থসহকারেই তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেন এবং একই সাথে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর সাথেই সেই সিফাতগুলোর সাদৃশ্য ও তুলনা করা থেকে দূরে থাকেন।

সুতরাং আহলে সুন্নাতের লোকেরা সিফাতগুলোকে অস্বীকারও করেন না এবং সেগুলোকে সৃষ্টির মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনাও করেন না। বরং সূরা শুরার **১১** নং আয়াতে যেভাবে আল্লাহর সিফাতের বর্ণনা এসেছে, তারা সেভাবেই বিশ্বাস করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

"সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

আল্লাহর বাণী: ﴿لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ "সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়"-এই কথা দ্বারা ঐ সব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে। অর্থাৎ যারা বলে আল্লাহর সিফাতগুলো মাখলুকের সিফাতের মতই।

আর আল্লাহর বাণী: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ "তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" -এর দ্বারা আল্লাহর সিফাতে অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর মধ্যে আল্লাহর জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং এই সম্মানিত আয়াতটি আসমা ওয়াস সিফাতের (আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর) অধ্যায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি সংবিধান ও মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। কেননা এটি একই সাথে আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করে এবং মাখলুকের মধ্যে সেই সিফাতগুলোর উপমা ও দৃষ্টান্ত হওয়াকে অস্বীকার করে। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আসবে, ইনশা-আল্লাহ।

فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সুমহান গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেটা তারা অস্বীকার করেন না:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله এই কথার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়। এই বিশ্বাস তাদেরকে আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায় না। যেমনটি

করে থাকে আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সিফাত থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত এক শ্রেণীর লোক। এমনকি তাদের বাড়াবাড়ি এই পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সকল উত্তম গুণাবলী থেকে শুন্য করে ফেলেছে। তাদের খোড়া যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করলে মাখলুকের সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যায়। তাই তারা এ থেকে পালানোর জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সকল সিফাতকে অস্বীকার করেছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে আল্লাহ তা'আলার জন্য রয়েছে এমনসব সুউচ্চ গুণাবলী, যা তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য শোভনীয় ও প্রযোজ্য। আর মাখুলকের জন্যও রয়েছে এমন সিফাত ও কাজ, যা তার জন্য প্রযোজ্য ও শোভনীয়। মূলতঃ মহান স্রষ্টার সুউচ্চ সিফাত ও সৃষ্টির সাধারণ ও নগণ্য সিফাতের মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্যতা নেই। সুতরাং হে মুআত্তেলা (আল্লাহর সিফাতকে বাতিলকারী) সম্প্রদায়! তোমরা যেই আশঙ্কায় (স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা হয়ে যাওয়ার ভয়ে) আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করছো, তা মোটেই আবশ্যক নয়।

وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ তারা আল্লাহর কালামকে আসল স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে নাঃ

পূর্বে تحريف এর অর্থ অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের লোকেরা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে না। তারা কুরআন ও সুন্নার শব্দসমূহ অন্য শব্দ দিয়ে বদল করে না এবং তার আসল ও প্রকৃত অর্থগুলোকেও অন্য অর্থ দিয়ে পরিবর্তন করে না। অতঃপর তারা তার আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যাও করে না। যেমন করে থাকে মুআত্তেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা আল্লাহর কালাম **استوى** (ইস্তাওয়াকে) **استولى** (ইস্তাওলা) দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

এমনি তারা আল্লাহর কালামঃ وَجَاءَ رَبُّكَ "এবং তোমার রব আগমন করবেন" (সূরা ফাজর ৮৯:২২)। এর মধ্যে একটি শব্দ বাড়িয়ে وَجَاءَ أَمْرُ

رَبُّكَ "এবং তোমার রবের আদেশ আগমন করবে"-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এখানে তারা أمر শব্দটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর 'আসা' সিফাতকে 'আল্লাহর আদেশ আসা' দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

তারা আল্লাহর "রহমত তথা সৃষ্টির প্রতি দয়া করা" সিফাতকে নেয়ামত ও ছাওয়াব প্রদানের ইচ্ছা দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এমনি আরো অনেক সিফাতকে তারা বাতিল অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله বলেনঃ

وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহের বিকৃত করেন না, তারা আল্লাহর সিফাত সমূহের ধরণ ও আকৃতি বর্ণনা করেন না এবং তাঁর সিফাতসমূহকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনাও করেন না।

....

ব্যাখ্যাঃ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ **তারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও আয়াতসমূহের বিকৃতি করেন নাঃ** إلحاد (ইলহাদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাঁকা হওয়া, একদিকে ঝুকে পড়া, কোন জিনিস থেকে সরে আসা, ইত্যাদি। এখান থেকেই কবরকে লাহাদ বলা হয়। কবরকে লাহাদ বলার কারণ হলো, উহাকে খনন করার সময় গর্ত খননের সাধারণ রীতি ও পদ্ধতির ব্যতিক্রম করে কিবলার দিকে বাঁকা করে দেয়া হয়।

আর আল্লাহর অতি সুন্দর নাম, তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী এবং আয়াতসমূহের মধ্যে ইলহাদ হচ্ছে উহার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে বাতিল অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে ইলহাদ কয়েক প্রকার।

প্রথম: আল্লাহর নামে দেবতার নাম রাখা: আল্লাহর অন্যতম নাম الإله থেকে মুশরেকরা তাদের এক দেবতার নাম রেখেছে اللات (লাত), আল্লাহর নাম العزيز থেকে তারা তাদের আরেক মূর্তির নাম রেখেছে العزى (উয্যা) এবং আল্লাহর নাম المنان থেকে তারা তাদের আরেক বাতিল মাবুদের নাম রেখেছে مناة (মানাত)।

দ্বিতীয়: আল্লাহ তা'আলার এমন নাম রাখা, যা তাঁর মর্যাদা ও বড়ত্বের শানে শোভনীয় নয়: যেমন খৃষ্টানরা আল্লাহকে أب (FATHER বা পিতা) বলে। দার্শনিকরা আল্লাহকে موجب (আসল সংঘটক) কিংবা علة فاعلة (প্রভাবশালী উপকরণ) বলে থাকে।

তৃতীয়: আল্লাহ তা'আলাকে এমন ত্রুটিযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা, যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছেন:

যেমন অভিশপ্ত ইহুদীরা বলে থাকে ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী" (সূরা ইমরান ৩:১৮১)। তারা আরো বলে:

﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহর হাত বাঁধা। আসলে বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত এবং তারা যে কথা বলছে সে জন্য তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর দুই হাত সদা প্রসারিত। যেভাবে চান তিনি খরচ করেন" (সূরা মায়িদা ৫:৬৪)।

তারা আরো বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং উহার মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি করার পর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। মূলতঃ আল্লাহ তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

চতুর্থ: আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ সিফাতগুলোর অর্থ ও হাকীকত অস্বীকার করা:

যেমন জাহমীয়ারা বলে আল্লাহর নামগুলো শুধু শব্দের মধ্যেই সীমিত। এগুলো কোন গুণ বা অর্থকে নিজের মধ্যে শামিল করে না। তারা বলে আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে, السميع (সর্বশ্রোতা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি শুনেন কিংবা এটি প্রমাণ করে না যে, শ্রবণ করা তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট। আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে البصير (সর্বদ্রষ্টা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি দেখেন কিংবা দেখা তাঁর গুণ এবং আল্লাহ তা'আলার আরেকটি নাম হচ্ছে الحي (চিরজীবন্ত), কিন্তু ইহা প্রমাণ করে না যে, তাঁর হায়াত বা জীবন আছে। আল্লাহর অন্যান্য নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রেও তারা একই রকম কথা বলে থাকে।

পঞ্চম: আল্লাহর সিফাতসমূহকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনা করা:

যেমন মুশাব্বেহা (আল্লাহর সিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে। তারা বলে থাকে, আল্লাহর হাত আমার দুই হাতের মতই। অন্যান্য সিফাতের বেলাতেও তারা একই রকম কথা বলে। আল্লাহ তাদের এই ধরণের কথার অনেক উর্ধ্বে।

যারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও আয়াতের মধ্যে ইলহাদ করে, তাদেরকে তিনি কঠোর আযাবের ধমক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। সুতরাং তাঁকে সেই নামেই ডাকো এবং তাঁর নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল অবশ্যই তারা পাবে"(সূরা আরাফের ৭:১৮০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾

“যারা আমার আয়াতসমূহের বিকৃতি (উল্টা অর্থ) করে, তারা আমার অগোচরে নয়”(সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৪০)।

وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ তারা আল্লাহর সিফাত সমূহের ধরণ ও আকৃতি বর্ণনা করেন না এবং তারা তাঁর সিফাতসমূহকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনাও করেন না: تكييف এবং تمثيل এর ব্যাখ্যা একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ

“কারণ আল্লাহ তা‘আলার সমতুল্য কেউ নেই, তাঁর কোন সমকক্ষও নেই এবং তাঁর কোন শরীকও নেই। আল্লাহ তা‘আলাকে তাঁর সৃষ্টির উপর কিয়াস করা যাবে না। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। তাঁর কালাম সর্বাধিক সত্য এবং তাঁর সৃষ্টির কথার চেয়ে তাঁর কথাই সর্বাধিক সুন্দর”।

....

ব্যাখ্যা: لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ কারণ আল্লাহ তা‘আলার অনুরূপ অন্য কেউ নেই: পূর্বে যে বলা হয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ সিফাত সমূহের ধরণ, আকৃতি ও কায়া বর্ণনা করে না এবং তাঁর সিফাতগুলোকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনা করে না, তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সমতুল্য কেউ নেই।

سبحانه সুবহানাহু: سبحان **শব্দটি** غفران **শব্দের** ন্যায় একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বাবে তাফ-ঈলের মাসদার التسبيح থেকে এটিকে নেওয়া

হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সকল দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

لَا سَمِيَّ لَهُ তাঁর সমতুল্য কেউ নেই: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামের সমপর্যায়ের এমন কোন নাম নেই, যে তাঁর নামের সমান মর্যাদা ও সম্মানের দাবী রাখে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মারইয়ামের ৬৫ নং আয়াতে বলেন:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

তোমার জানা মতে তাঁর সমতুল্য কেউ আছে কি?

এখানে প্রশ্ন করা হলেও তার অর্থ হচ্ছে নাফী তথা এটি বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই এবং তাঁর নাম ও সত্তার মত অন্য কোন নাম ও সত্তা নেই।

وَلَا كُفْءَ لَهُ তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই: কুফু অর্থ সমকক্ষ, অনুরূপ। অর্থাৎ আল্লাহর অনুরূপ অন্য কেউ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাসের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই"।

وَلَا نِدَّ لَهُ তাঁর কোন শরীকও নেই: الند অর্থ হচ্ছে সদৃশ, অনুরূপ, সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ, শরীক ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২২নং আয়াতে বলেন:

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾

"কাজেই জেনে-বুঝে তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ো না"।

وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির উপর কিয়াস করা যাবে না: কিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে তুলনা করা, সদৃশ তৈরি করা ইত্যাদি। অর্থাৎ

সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তুলনা করা যাবে না এবং মাখলুকের সাথে তাঁকে সাদৃশ্যও করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৭৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾

"কাজেই তোমরা আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরি করো না।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যাত (সত্তা), তাঁর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী এবং তাঁর কর্মকে মাখলুকের সত্তা, নাম ও গুণাবলী এবং তাদের কাজ-কর্মের সাথে তুলনা করা যাবে না। সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ এবং মহান সৃষ্টিকর্তাকে কিভাবে ত্রুটিপূর্ণ মাখলুকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের অনুরূপ হওয়ার অনেক উর্ধ্বে।

وَتَعَالَى فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত:

পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব এবং তাঁকে যে কোন মাখলুকের সাথে তুলনা করা যাবে না। তার কারণ হিসাবে শাইখুল ইসলাম উপরোক্ত কথা বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, তাই যেসব সিফাত তিনি তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রসূল ﷺ যেসব সিফাত তাঁর প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা আমাদের উপর আবশ্যক। কেননা মানুষেরা তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও বেষ্টন করতে অক্ষম। তিনি এমন সিফাতে কামালিয়া তথা সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত, যে পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি পৌঁছতে পারে না। সুতরাং তিনি নিজের জন্য যেসব সিফাত সাব্যস্ত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাদেরও তাতে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাঁর জন্য যা শোভনীয়, সে সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত আছেন, আমরা তা অবগত নই।

وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ আল্লাহ তা'আলার কালাম সর্বাধিক সত্য এবং তাঁর কথা সৃষ্টির কথার চেয়ে অধিক সুন্দরঃ

তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন, তা বাস্তব ও সত্য। আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর কথাকে সত্যায়ন করা এবং তার বিরোধীতা না করা। তিনি কুরআন মাজীদে যেসব শব্দ নাযিল করেছেন, তা সর্বোত্তম, সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট। তাঁর জন্য যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী শোভনীয়, তা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং সুস্পষ্ট ও পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করেছেন। আমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সেসব নাম ও গুণাবলীর স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তা কবুল করে নেওয়া।

রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেনঃ

ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলার রসূলগণ সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিত। তারা ঐসব লোকদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনেই কথা বলে।

....

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলামের এই কথাটি তার পূর্বোক্ত উক্তিঃ তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, এর সাথে সংযুক্ত। صِدق (সিদ্ক) সত্য খবর সেই খবরকে বলা হয়, যা বাস্তবের হুবহু অনুরূপ হয়। অর্থাৎ রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ে যেসব খবর দিয়েছেন, তাতে তারা সত্যবাদী।

ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে যে খবর এসেছে, তাতে তারা সত্যায়িত। কেননা তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোনো কথা বলেন না।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর রসূলদের কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে, শাইখুল ইসলাম উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে উহার সনদকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা রসূলদের জন্য যা বলেছেন, তা সত্য। আর রসূলগণ সেই সত্যকে সৃষ্টির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর যেসব সিফাত বর্ণনা করেছেন, তা কবুল করে নেয়া আবশ্যক।

রসূলদের কথা ঐসব লোকদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনেই কথা বলে। যারা আল্লাহর শারীয়াত, দ্বীন, তাঁর নাম ও

গুণাবলী সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলে, তাদের কথা রসূলদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। শুধু তাই নয়; বরং তারা কেবল ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়েই আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে অথবা কেবল উহাই বলে, যা তারা শয়তান থেকে সংগ্রহ করে। যেমন বলে থাকে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার, বিদ'আতী এবং যিন্দীক (অন্তরে কুফরী লুকায়িত রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশকারী), যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী, স্বার্থান্বেষী ও নিকৃষ্ট আলেমরা। আল্লাহ তা'আলা সূরা শু'আরায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِين ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيم ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾

"হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার উপর অবতীর্ণ হয়? তারা প্রত্যেক মিথ্যুক বদকারের উপর অবতীর্ণ হয়। তারা আকাশ থেকে চুরি করে শোনা কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং তাদের বেশির ভাগ লোকই মিথ্যুক" (সূরা শু'আরা ২৬:২২১-২২৩)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় আরো বলেন:

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾

"কাজেই তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত, যারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তারপর লোকদের বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে (সূরা বাকারা ২:৭৯)।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেহেতু তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, তাঁর কালাম যেহেতু সর্বাধিক সত্য, তাঁর কথা যেহেতু সৃষ্টির কথার চেয়ে অধিক উত্তম, রসূলগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, সেসব সংবাদের প্রত্যেকটিতেই যেহেতু তারা সত্যবাদী এবং রসূলদের ও আল্লাহর মাঝে যেই واسطة (মাধ্যম) রয়েছে এবং যে মাধ্যমে রসূলদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে অহী আসে, তা যেহেতু একটি সত্য ও নির্ভুল মাধ্যম, সেটি যেহেতু সম্মানিত ফেরেশতাদের মাধ্যম, তাই আল্লাহ যা বলেছেন এবং তাঁর রসূলগণ

আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, তার উপর নির্ভর করা ও তা বিশ্বাস করা আবশ্যক। বিশেষ করে আল্লাহর আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করতে হবে এবং যা নিজের সত্তা হতে সরিয়ে রেখেছেন ও দূর করে দিয়েছেন, তা সরিয়ে ফেলতে হবে। সেই সাথে বিদ'আতী লোকেরা রূপক অর্থের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহর যেসব আসমা ওয়াস সিফাতকে অস্বীকার করেছে, তাদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। রসূলগণ আল্লাহর আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে যেই সংবাদ নিয়ে এসেছেন, বিদ'আতীরা তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সেগুলোকে অস্বীকার করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করেছে কিংবা এমন লোকদের অন্ধ অনুসরণ করেছে, যারা গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আদর্শ ও অনুসরণীয় হওয়ার অযোগ্য।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

وَلِهَذَا قَالَ الله تعالى ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ؛ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "কাফের-মুশরিকরা তোমার রব সম্পর্কে যেসব কথা তৈরি করেছে তা থেকে তোমার রব পবিত্র, তিনি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম আল্লাহর রসূলদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই" (সূরা সাফফাত:১৮০-১৮২)।

সুতরাং নাবী-রসূলদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যেসব অশোভনীয় কথা বলেছে, তা থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে রসূলদের উপরও তিনি সালাম পেশ করেছেন। কারণ তারা আল্লাহর যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল।

....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলামের কথা: لهذا (এই কারণেই....) -এতে তিনি তাঁর পূর্বের কথার কারণ বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি সেখানে বলেছেন আল্লাহর কালাম এবং রসূলদের কথা সর্বাধিক সত্য ও সর্বোত্তম।

سبحان সুবহান: سبحان শব্দটি غفران শব্দের ন্যায় একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বাবে তাফ-ঈলের মাসদার التسبيح থেকে এটিকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সকল দোষ-ত্রুটি হতে আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

ربك তোমার রব: যিনি রহমত ও নেয়ামাত দ্বারা তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন এবং যিনি সৃষ্টির একমাত্র মালিক ও প্রভু, তিনিই হলেন রব।

رب العزة রাব্বুল ইয্‌যাত: রাব্বুল ইয্‌যাত অর্থ হচ্ছে ক্ষমতাবান, মর্যাদাবান এবং প্রতাপশালী। এখানে মাওসুফকে (রবকে) সিফাতের দিকে ইযাফত (সম্বোধিত) করা হয়েছে। মূল বাক্যটি এ রকম ছিল: الرب العزيز প্রবল ক্ষমতাধর প্রভু।

يَصِفُونَ তারা আল্লাহর সাথে যেসব ওয়াস্‌ফ (দোষ) যুক্ত করে: অর্থাৎ নাবী-রসূলদের বিরোধীরা আল্লাহর সাথে এমনসব দোষ-ত্রুটি যুক্ত করে, যা তাঁর বড়ত্বের জন্য অশোভনীয়।

وَسَلامٌ সালাম: কেউ কেউ বলেছেন سلام (সালাম) শব্দটি السلام থেকে নেওয়া হয়েছে, যা ইসলামের সম্ভাষণ অর্থে ব্যবহৃত। আবার কেউ বলেছেন سلام শব্দটি সালামত তথা السلامة من النقص والعيب থেকে নেওয়া হয়েছে, যা অপছন্দনীয় বস্তু ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

على المرسلين রসূলগণের উপর: তারাই রসূল, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছেন। তারা তাদের রবের রিসালাত

সৃষ্টির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। المرسلون **শব্দটি** مرسل এর বহুবচন। নাবী ও রসূলের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

الْعَالَمِينَ সৃষ্টিজগৎ: عالم এর বহুবচন হচ্ছে الْعَالَمِينَ। আল্লাহ ছাড়া বাকী সবই সৃষ্টিজগতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উপরের আয়াত তিনটির সংক্ষিপ্ত অর্থ: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ তাঁর উক্তি: فسبح بنفسه..الخ দ্বারা আয়াতের সংক্ষিপ্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:

(১) গোমরাহ ও অজ্ঞ লোকেরা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য অশোভনীয় যেসব দোষ-ক্রটি যুক্ত করে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

(২) উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা রসূলদের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে তারা যা নিয়ে এসেছে এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তারা যে সংবাদ দিয়েছে, তা কবুল করে নেওয়া আবশ্যক।

(৩) রসূলদের উপর সালাম ও সলাত (দরুদ) পেশ করা এবং তাদেরকে সম্মান করা ইসলামী শারীয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

(৪) রসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তার বিরোধী প্রত্যেক বিষয় প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। বিশেষ করে আল্লাহর আসমা ওয়াস সিফাতের ব্যাপারে রসূলগণ যে সংবাদ দিয়েছেন, তার বিরোধী হয় এমন প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করা জরুরী।

(৫) আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা এবং তাঁর নেয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামাত সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ নেয়ামাত।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী ও বড়ত্বের বৈশিষ্ট্য এবং নিজেকে যে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন তার বর্ণনা

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ বলেনঃ

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَات فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনি নিজেকে যে সুন্দর নামে নামকরণ করেছেন, তাতে তিনি নাফী এবং ইছবাতকে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজের সত্তার জন্য সিফাতে কামালিয়া সাব্যস্ত করেছেন এবং নিজেকে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন। সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর আসমা ওয়াস্ সিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা থেকে সরে যায় না। কেননা সেটিই হচ্ছে সীরাতুল মুস্তাকীম।

....

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার জন্য আসমা ও সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে কুরআনের মধ্যে যেই মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ এখানে উহাই বর্ণনা করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথা আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে মুমিনদেরও উক্ত মূলনীতির উপর চলা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল নাম ও গুণের ক্ষেত্রে নাফী ও ইছবাতকে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিনি নিজের জন্য আসমা এবং সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, অন্যদিকে নিজের পবিত্র সত্তা হতে সকল দোষ-ত্রুটিকে নাফী করেছেন।

এ ক্ষেত্রে নাফী অর্থ হচ্ছে, যেসব দোষ-ত্রুটি আল্লাহ তা'আলার কামালিয়াতের পরিপন্থী, তাঁর সত্তা হতে সেগুলো সরিয়ে ফেলা ও দূর করে

দেয়া। যেমন তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সমকক্ষ, শরীক, তন্দ্রা-নিদ্রা, মৃত্যু এবং ক্লান্তি ইত্যাদির ধারণা হওয়াকে নাফী করেছেন।

আর ইছবাত হচ্ছে, সিফাতে কামালিয়া তথা সুউচ্চ গুণাবলী এবং বড়ত্বের বৈশিষ্টগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন সূরা হাশরের ২৩-২৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র) سَلَام (পরিপূর্ণ শান্তিদাতা) مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمن (রক্ষক), عَزِيز (মহাপরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী) এবং مُتَكَبِّر (অতী মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা), তাঁর জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম। আর তিনিই عَزِيز (মহাপরাক্রমশালী) ও حَكِيم (প্রজ্ঞাবান)" (সূরা হাশর ৫৯:২৩-২৪)।

আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর বিষয়ে এমনি আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যার বেশ কিছু নমুনা সম্মানিত শাইখ সামনে উল্লেখ করবেন।

فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ "সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর আসমা ওয়াস্ সিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে যেই সংবাদ নিয়ে এসেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা থেকে সরে যায় না":

তারা তা থেকে সরে অন্যদিকে ঝুকে পড়ে না এবং তারা তা থেকে

বিচ্যুতও হয় না; বরং রসূলদের অনুসরণ করে এবং তাদের নীতির উপরই চলে। আল্লাহ তা'আলার জন্য অতি উত্তম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করা এবং সমস্ত মন্দ ও অশোভনীয় বৈশিষ্ট্য থেকে তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করাও রসূলদের আনীত দ্বীনের মধ্যে গণ্য। রসূলগণ উপরোক্ত মহান মূলনীতিটি অর্থাৎ সিফাতে কামালীয়াগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং অশোভনীয় স্বভাব থেকে আল্লাহকে পবিত্র করার মূলনীতিটি সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু রসূলদের শত্রুরা সেই মূলনীতি থেকে সরে পড়েছে।

فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ কেননা সেটিই হচ্ছে সীরাতে মুস্তাকীম:

আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী-রসূলদের পথ থেকে সরে না যাওয়ার কারণ হলো এ ক্ষেত্রে নাবী-রসূলদের পথই হচ্ছে সীরাতুল মুস্তাকীম।

সীরাতুল মুস্তাকীম বলা হয় ঐ সোজা পথকে, যাতে কোন ভিন্নতা ও দলাদলি নেই। সূরা ফাতিহায় এই সীরাতুল মুস্তাকীমের কথাই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও" (সূরা ফাতিহা ১:৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ করো। অন্যান্য পথে গমন করো না। কারণ সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেখে (সূরা আন'আম ৬:১৫৩)।

আমরা সলাতের প্রত্যেক রাক'আতে আল্লাহর কাছে এ দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে এই সরল ও সোজা পথে পরিচালিত করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি হচ্ছে রসূলগণ আক্বীদা ও অন্যান্য বিষয়ে যা নিয়ে এসেছেন তাই আল্লাহর সঠিক পথ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

“ঐ সব লোকের পথ, যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ”।

....

ব্যাখ্যা: আক্বীদা এবং অন্যান্য বিষয়ে নাবী-রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা যে পথে চলেছে, তাই হচ্ছে সীরাতুল মুস্তাকীম। এটিই হচ্ছে সেই সব লোকের পথ, যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাদেরকে সর্বপ্রকার নেয়ামত পূর্ণরূপে দান করেছেন, যা তাদেরকে চিরকাল সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যে রাখবে। এই নিয়ামাতপ্রাপ্ত লোকেরাই ঐ সব লোক, যাদের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাঁর কাছে দু‘আ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এই চার প্রকার লোকেরাই আল্লাহর সর্বপ্রকার ও পূর্ণ নেয়ামাত পেয়ে ধন্য হবে। তারা হলো:

এক. النبيون নাবীগণ: النبي এর বহুবচন হচ্ছে النبيون। তারা হলো ঐসব মহাপুরুষ, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নবুওয়াত ও রেসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। নাবী ও রসূলের সংজ্ঞা এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

দুই. الصديقون সত্যবাদীগণ: الصديق এর বহুবচন الصديقون। যে ব্যক্তি সত্য বলায় এবং সত্যকে সত্যায়ন করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী, তাকে সিদ্দীক বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য পূর্ণ মুখলিস (নিবেদিত ও নিষ্ঠাবান)

হওয়ার সাথে সাথে যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর পূর্ণ অনুসরণ করে, সেই সিদ্দীক।

তিন. وَالشُّهَدَاءِ শহীদগণ: شهيد এর বহুবচন الشُّهَدَاءِ। আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে ব্যক্তি নিহত হয়, তাকে শহীদ বলা হয়। শহীদ শব্দটি شهادة থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়া, উপস্থিত হওয়া। শহীদকে শহীদ বলার কারণ হলো, তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এবং রহমতের ফেরেশতাগণ তার সাথে উপস্থিত থাকেন।

চার. الصَّالِحِينَ সৎকর্মশীলগণ: صالح এর বহুবচন الصالحون। সালেহ (সৎকর্মশীল) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে আল্লাহর হকসমূহ এবং আল্লাহর সৃষ্টির হকসমূহ আদায় করে।

صراط শব্দটিকে কখনো আল্লাহর দিকে ইযাফত (সম্বন্ধিত) করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ** "এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর (সূরা আনআম ৬:১৫৩)। সীরাতকে আল্লাহর দিকে ইযাফত করার কারণ হলো, আল্লাহই এই পথকে মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং উহাকে তাদের জন্য ঠিক করেছেন। আর মানুষ যেহেতু সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলে, তাই সীরাতকে মানুষের দিকেও ইযাফত করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ "আমাদেরকে ঐসব লোকের পথ দেখাও, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো"(সূরা ফাতিহা ১:৭)। যারা এ পথে চলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের ফাযীলত ও সম্মানের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আরো জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা হলো ঐ সব লোক, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকগণ (সূরা নিসা ৪:৬৯)। এই পথের পথিক যখন জানতে পারবে যে, তাতে রয়েছে নাবী, সিদ্দীক, শহীদ

এবং সৎকর্মপরায়ণ, তখন তার অন্তর থেকে সমসাময়িক লোকদের থেকে একাকীত্বের অনুভূতি দূর হয়ে যাবে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন কিছু নমুনা ও দলীল উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য আসমা ও সিফাত সাব্যস্ত করে। বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামে তিনি সেই দলীলগুলো বর্ণনা করেছেন।

الاستدلال على أسماء الله وصفاته من القرأن الكريم

কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করার প্রমাণ ভিত্তিক পদ্ধতি

الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى

১। একই সাথে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সিফাত সাব্যস্ত করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি নাকোচ করা এবং তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা

[আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সূরা ইখলাসের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

قَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ حَيْثُ يَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

না বোধক ও হ্যাঁ বাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে যে সমস্ত সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার মধ্যে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান সূরা ইখলাসে বর্ণিত গুণাবলী অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বলোঃ তিনি আল্লাহ্ একক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই" (সূরা ইখলাস ১১২: ১-৪)।

....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখুল ইসলাম পূর্বোক্ত বাক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সেই বাক্যটি হচ্ছে, **وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَات** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনি নিজেকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন, তাতে তিনি নাফী এবং ইছবাতকে একত্রিত করেছেন। আর এখানে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার উপর দলীল পেশ করা শুরু করেছেন। সূরা ইখলাসের অনেক ফাযীলত থাকার কারণে তিনি সর্বপ্রথম এই সূরাকেই উল্লেখ করেছেন। এই সূরাকে সূরা ইখলাস হিসাবে নামকরণ করার কারণ হলো এটিকে আল্লাহর সিফাতের জন্য খালেস (বাছাই ও নির্দিষ্ট) করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করে, সূরা ইখলাস তাকে শির্ক থেকে মুক্ত করে। তাই ইখলাস অর্থ মুক্ত করা।

الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান:

সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। কারণ কুরআনে যেসব ইলমের সমাহার ঘটেছে, তা মূলতঃ তিন প্রকার।

(১) তাওহীদের জ্ঞান
(২) অতীতের জাতিসমূহের ঘটনাবলী ও ভবিষ্যতের খবরাদি এবং
(৩) হালাল-হারামসহ বিভিন্ন হুকুম-আহকাম।

সূরা ইখলাসের মধ্যে শুধু আল্লাহ তা'আলার সিফাতের বর্ণনা রয়েছে। তাই এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। তার দলীল হলো যেমন সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

“এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে (قل هو الله أحد) তথা সূরা ইখলাস বার বার পাঠ করতে শুনল। সকাল হলে সে রসূল ﷺ এর কাছে এসে বিষয়টি জানালো। লোকটি শুধু সূরা ইখলাস পাঠকে খুব অল্প মনে করছিল। রসূল ﷺতখন বললেন: ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই ইহা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান”।[৯]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন: সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়ার হাদীসগুলো প্রায় মুতাওয়াতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সূরা ইখলাসে মহান আল্লাহ বলেন: قل অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। কেননা এটি যদি মুহাম্মাদের বা অন্যের কালাম হতো তাহলে আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ ﷺ কে সম্বোধন করে قل শব্দটি প্রয়োগ করতেন না।

هُوَ اللهُ أَحَدٌ আল্লাহ একক: অর্থাৎ আল্লাহ এক, তাঁর কোন সমকক্ষ, সহযোগী, সদৃশ এবং শরীক নেই।

اللهُ الصَّمَدُ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী: অর্থাৎ আল্লাহ এমন মর্যাদাবান নেতা যিনি স্বীয় নেতৃত্বে, মর্যাদায় এবং মহত্বে পরিপূর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলার এই ‘সমাদ’ নামের মধ্যে সমস্ত সিফাতে কামালীয়া তথা পূর্ণতার গুণাবলী বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেছেন, সমাদ বলা হয় এমন সত্তাকে যার প্রতি সমস্ত মাখলুখের প্রয়োজন হয় এবং তারা সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনে তাঁর দিকেই ধাবিত হয় ও তাঁকেই উদ্দেশ্য করে।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি: অর্থাৎ তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতাও নেই। এতে ইহুদী, নাসারা এবং আরবের ঐসব মুশরিকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করত। (ইহুদীরা উযাইরকে এবং খৃষ্টানরা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে। আর আরবের মুশরিকরা বলত: ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান। আল্লাহ তা‘আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।)

---

৯. সহীহ বুখারী ৫০১৩, আবূ দাউদ ১৪৬১।।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ **আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই:** অর্থাৎ তাঁর সমান, সদৃশ ও সমকক্ষ নেই।

মোটকথা, সূরা ইখলাস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, উহা আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ক্ষেত্রে নাফী ও ইছবাতকে একত্রিত করেছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী: اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ "আল্লাহ্ একক। তিনি অমুখাপেক্ষী"- এতে রয়েছে ইছবাত। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই"এতে রয়েছে নাফী।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে আয়াতুল কুরসির মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াতে নিজেকে যেই সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: "তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন। তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর তিনি সমুন্নত, মহান"। (সূরা বাকারা ২: ২৫৫)

যে ব্যক্তি রাতে ইহা পাঠ করবে, সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য সকাল পর্যন্ত একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকবে।

....

ব্যাখ্যা: وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابه আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের সর্বাধিক ফাযীলাতপূর্ণ আয়াতে নিজেকে সুমহান গুণে গুণান্বিত করেছেন:

অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যে নাফী ও ইছবাতের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অতিক্রান্ত হয়েছে। কুরআনের সর্বাধিক ফাযীলতপূর্ণ আয়াত তথা আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত সত্তাকে যেসব সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাও নাফী ও ইছবাতের মাধ্যমেই করেছেন। অর্থাৎ তাতে যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য সুউচ্চ ও সমুন্নত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁর পবিত্র সত্তা হতে সকল প্রকার মানবীয় দোষ-ত্রুটি দূরিভূত করেছেন।

الأية -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে চিহ্ন, নিদর্শন ইত্যাদি। কুরআনের একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত এমন বাক্যকে আয়াত বলা হয়, যাকে একটি فاصلة (বিরামচিহ্ন) এর মাধ্যমে পূর্বাপর বাক্য থেকে আলাদা করা হয়। তবে এখানে যে আয়াতটির কথা চলছে, তাকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। কারণ এতে কুরসীর উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতুল কুরসী কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াত হওয়ার বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম ﵀ উবাই ইবনে কা'ব ﵀ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أُبَيٍّ بن كعب ــ رضي الله عنه ــ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ: "أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟ " قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ : آيَةُ الْكُرْسِيِّ، فقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ

একদা নাবী ﷺ উবাই ইবনে কা'ব ﵁ কে জিজ্ঞেস করলেন: কুরআনে সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি? জবাবে উবাই ইবনে কা'ব ﵁ বললেন: আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত। উবাই কয়েকবার কথাটি পুনরাবৃত্তি করার পর বললেন: উহা হলো আয়াতুল

কুরসী। রসূল ﷺ তখন তাঁর জন্য দু'আ করে বললেনঃ হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য এ ইলম সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক হোক![১০]

মর্যাদার দিক দিয়ে আয়াতুল কুরসী কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হওয়ার কারণ হলো উহাতে এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নাম ও সুমহান গুণাবলীকে সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহর সত্তাকে এমনসব মন্দ বৈশিষ্ট থেকে পবিত্র করেছে, যা তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে শোভনীয় নয়।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেইঃ

অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তিনি ব্যতীত যেসব মাবুদের ইবাদাত করা হয়, তা একদম বাতিল। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম অতি সুন্দর নাম **الحي**। (চিরজীবন্ত)। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা এমন চিরবিদ্যমান সত্তা, যার জন্য রয়েছে পূর্ণতম জীবন। আল্লাহ তা'আলার হায়াত যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তাই তাঁর হায়াত কখনো শেষ হবে না।

আল্লাহর আরেকটি নাম **الْقَيُّومُ**। (সবকিছুর ধারক)। যিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী তিনিই হচ্ছেন আল কাইয়্যুম। সুতরাং কোন মাখলুকের প্রতিই আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ সমস্ত মাখলুকই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী।

বর্ণিত হয়েছে যে, **الْحَيُّ الْقَيُّومُ। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারকঃ** হচ্ছে ইসমে আযম, যা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবুল করেন এবং এর উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। **الْحَيُّ الْقَيُّومُ**। ইসমে আযম হওয়ার কারণ হলো 'আলহাই' নামটি আল্লাহর সিফাতে যাতীয়া (সত্তা) এর উপর প্রমাণ বহন করে। তথা এটি আল্লাহর ঐ সব সিফাতের অন্তর্ভূক্ত যা, কখনোই আল্লাহর

---

১০. সহীহঃ মুসনাদে আহমাদ ২১২৭৮, সহীহ মুসলিম ৮১০, আবূ দাউদ ১৪৬০।

পবিত্র সত্তা হতে আলাদা হয় না। আর ‘আলকাইয়্যুম’ নামটি আল্লাহর সিফাতে ফেলিয়া অর্থাৎ তাঁর কর্ম সম্পর্কীয় সিফাত থাকার প্রমাণ করে। সুতরাং আল্লাহর সকল সিফাতের মূলভীত্তি হচ্ছে এই দুইটি সম্মানিত ও মহান নাম।

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না: তিনিই যেহেতু সকল সৃষ্টির সার্বক্ষণিক ধারক ও বাহক, তাই তন্দ্রা ও নিদ্রা তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। হালকা ঘুমকে ‘সিনাহ’ বলা হয়। এটি শুধু চোখের মধ্যেই হয়। আর ঘুম তন্দ্রা থেকে অধিক গভীর ও শক্তিশালী হয়। ঘুম মৃত্যুর ছোট ভাই। এই প্রকার ঘুম অন্তরে হয়।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই: অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তাদের সকলের স্রষ্টা একমাত্র তিনি, এগুলোর মালিকানাও একমাত্র তাঁর এবং সকলেই তার অনুগত। সুতরাং তিনি উর্ধ্ব জগৎ এবং নিম্ন জগতের সবকিছুরই মালিক।

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট সুপারিশ করার মত কেউ নেই।

الشفاعة শব্দটি الشفع (যুক্ত করা) থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি الوتر (বেজোড়)এর বিপরীত। শাফাআ‘তকারী যেহেতু স্বীয় প্রার্থনার সাথে অন্যের জন্য প্রার্থনা করাকেও যুক্ত করে নেয়, তাই সুপারিশকারীকে الشافع (সুপারিশকারী) বলা হয়। তাই যার জন্য সুপারিশ করা হয়, সেই লোক প্রথমে বেজোড় (একা) থাকার পর সুপারিশকারী তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিয়ে জোড়ে পরিণত করে।

আর পারিভাষিক অর্থে শাফাআ‘ত অর্থ হচ্ছে **سؤال الخير للغير** অন্যের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করা। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি তাঁর রবের কাছে অন্যান্য মুমিনের জন্য এই দু‘আ করবে যে, তিনি যেন তাদের গুনাহ ও

অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন। তবে শাফাআ'তের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর মালিকানাধীন।

إِلاَّ بِإِذْنِهِ আল্লাহর অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত শাফাআ'ত হবে না। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার কারণেই অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর নিকট কিয়ামাতের দিন অন্য কারো জন্য সুপারিশ নিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে পরিবেষ্টন করে আছে। অতীত ও ভবিষ্যতের কোন জিনিসই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়।

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন:

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর ইলম থেকে কিছুই জানতে পারে না। তবে তারা শুধু সেটুকুই জানতে পারে, যা তিনি রসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়েছেন।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ তার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে:

আল্লাহর কুরসী সত্য, আর তাতে আল্লাহর মর্যাদা ও মহানত্বের পরিপূর্ণতা সাব্যস্ত হয়। আর এ কারণে সকল সৃষ্টিই তুচ্ছ।

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়:

আসমান-যমীনসহ উর্ধ্বজগৎ ও নিম্ন জগতের সবকিছু সংরক্ষণ করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন ও ভারী অনুভব হয় না। কেননা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত।

وَهُوَ الْعَلِيُّ আর তিনি সর্বোচ্চঃ

অর্থাৎ সকল দিক থেকেই আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টির উপরে হওয়া সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত। আল্লাহর যাত সুউচ্চ। অর্থাৎ তিনি সকল সৃষ্টির উপরে।

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى আরশে সমুন্নত (সূরা ত্বহা ২০:৫)। তিনি আরশেরও উপরে। আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্ব সর্বোচ্চ। সুতরাং তাঁর জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ সিফাতসমূহ এবং সুমহান গুণাবলী। আল্লাহ তা'আলার শক্তি এবং ক্ষমতাও সর্বোচ্চ। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, সকল সৃষ্টির পরিচালক এবং কোন কিছুই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়।

الْعَظِيمُ। (সুমহান) হচ্ছেন এমন সত্তা, যার মধ্যে বড়ত্বের সকল সিফাতই বিদ্যমান। সুতরাং নাবী, ফেরেশতা এবং মুমিন বান্দাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সম্মান।

সুতরাং আয়াতুল কুরসীর মধ্যে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার এতগুলো গুণ বিদ্যমান, তাই এটি কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াত হওয়ার দাবী রাখে এবং এটি তার পাঠকারীকে সকল প্রকার অকল্যাণ ও শয়তান থেকে হেফাজতকারী হিসাবে পরিগণিত হওয়ারও হকদার।

আয়াতুল কুরসী থেকে এই দলীল পাওয়া গেল, আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং নিজেকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি আয়াতুল কুরসীতে শির্কের নেতিবাচক বক্তব্য এবং তাওহীদের ইতিবাচক বক্তব্য একত্রিত করেছেন। আয়াতুল কুরসী আল্লাহর জন্য একদিকে যেমন সুমহান, সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করেছে, অন্যদিকে তাঁর পবিত্র সত্তা হতে সকল দোষ-ত্রুটি এবং অশোভনীয় বৈশিষ্টগুলোকে দূর করে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**। "তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই" এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদাত

অস্বীকার করা হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদাতকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: الْحَيُّ الْقَيُّوم "তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক" এতে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য রয়েছে হায়াত (পূর্ণ জীবন), অবিনশ্বরতা এবং সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ও ধারণ করার গুণাবলী।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না"। এতে আল্লাহ তা'আলা থেকে তন্দ্রা ও নিদ্রাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই"। এতে উর্ধ্ব জগতের এবং নিম্ন জগতের পূর্ণ মালিকানা কেবল আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?"। আল্লাহর জন্য যেহেতু রয়েছে পূর্ণ বড়ত্ব, মর্যাদা এবং তিনি যেহেতু তাঁর সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অমূখাপেক্ষী, তাই বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট শাফাআ'ত অস্বীকার করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: ﴿يَعْلَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ "তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন"। এতে আল্লাহর জন্য প্রত্যেক বস্তু, ঘটনা এবং বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত ইলম সাব্যস্ত করা হয়েছে। চাই তা অতীতের বিষয় হোক কিংবা ভবিষ্যতের।

আল্লাহর বাণী: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء "তাঁর জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন" সমস্ত মাখলুক যে

আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং কোন সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর যে কোন প্রয়োজন নেই এখানে তা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** "তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে"। এখানে আল্লাহর জন্য কুরসী এবং পূর্ণ বড়ত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেই সাথে আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার তুলনায় সৃষ্টি খুবই ছোট ও নগণ্য।

আল্লাহর বাণী: **وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا** "আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়"। এতে আল্লাহ তা'আলা থেকে অক্ষমতা, অপারগতা এবং ক্লান্তি অস্বীকার করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ**"আর তিনি সুউচ্চ, সমুন্নত ও মহান"। এতে আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল মাখলুকের উপরে থাকা, সমুন্নত হওয়া এবং বড়ত্বের গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেনঃ

ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح

আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর বড় বড় সিফাতের আলোচনা হয়েছে বলেই যে ব্যক্তি রাতে ইহা পাঠ করবে, সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট শয়তান আসতেই পারবে না।

এই বক্তব্যের দ্বারা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ ঐ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা ইমাম বুখারী ﵀ আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে এই কথা রয়েছে,

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: 255]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ

যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নিবে তথা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন তুমি আয়াতুল কুরসী তথা ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.... পাঠ করো। কেননা তুমি যদি উহা পাঠ করো, তাহলে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত তোমার নিকট শয়তান আসতেই পারবে না।[১১]

জিন ও ইনসানের মধ্য হতে প্রত্যেক বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারীকে শয়তান বলা হয়। شطن থেকে شيطان এর উৎপত্তি হয়েছে। شطَن অর্থ بعُد (দূর হয়েছে)। শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে চলে গেছে বলেই তাকে শয়তান বলা হয়। অথবা شيطان এর উৎপত্তি হয়েছে شاط يشيط হতে। যখন কোন জিনিস খুব কঠিন ও শক্ত হয়, তখনই কেবল তাকে উদ্দেশ্য করে এ রকম কথা বলা হয়।

১১ . সহীহ বুখারী ২৩১১, সহীহ ইবনে খুযাইমা ২৪২৪, তিরমিযী ২৮৮০, মুসনাদে আহমাদ।

الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته

২। আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টির উপরে থাকা ও নিকটবর্তী হওয়া এবং সকল সৃষ্টির পূর্বে ও সকল সৃষ্টির শেষে বিদ্যমান থাকা।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনিই الأَوَّلُ প্রথম, তিনিই الآخِرُ সর্বশেষ, তিনিই الظَّاهِرُ সবকিছুর উপরে, তিনিই الْبَاطِنُ মাখলুকের অতি নিকটে) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তিনিই الأَوَّلُ (প্রথম), তিনিই الآخِرُ (সর্বশেষ), তিনিই الظَّاهِرُ (সবকিছুর উপরে), তিনিই الْبَاطِنُ (মাখলুকের অতি **নিকটে), আর তিনি সর্ব বিষয়ে عَلِيم (মহাজ্ঞাণী)" (সূরা হাদীদ ৫৭: ৩)।**

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার বাণী: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ"- সহীহ মুসলিমে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি তাঁর দু'আয় বলেছেন:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ»

"হে আল্লাহ! তুমিই أَوَّل (সর্বপ্রথম)। তোমার পূর্বে কেউ ছিলনা। তুমিই آخِر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমিই ظَاهِر

(সকল সৃষ্টির উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই بَاطِن (মাখলুকের অতি নিকটে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই"।[১২]

নাবী ﷺ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর এ চারটি নামের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। এ বরকত সম্পন্ন নামগুলোর মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই পরিবেষ্টন করে আছেন।

আল্লাহ তা'আলার নাম: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ "তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ" দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত যামানাকে পরিবেষ্টন করে আছেন। অর্থাৎ তিনি যামানা ও কালসীমার উর্ধ্বে। সবকিছুর আগে তিনি একাই ছিলেন এবং সবকিছু শেষ হওয়ার পরও তিনি থাকবেন।

আর আল্লাহ তা'আলার নাম: وَالظَّاهِرُوَالْبَاطِنُ "তিনি সকল সৃষ্টির উপরে এবং তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী" দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন সকল যামানাকে বেষ্টন করে আছেন তেমনি সকল স্থানকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন: আল্লাহ তা'আলার এই চারটি নাম পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক। চারটি নামের মধ্যে الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ এই দু'টি নাম আল্লাহ তা'আলার অবিনশ্বরতা ও চিরস্থায়িত্বের জন্য। আর الظَّاهِرُوَالْبَاطِنُ এই দু'টি নাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে হওয়া ও তাদের নিকটে হওয়া বুঝায়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রথম থেকেই যেসব বস্তু রয়েছে, তার প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। অর্থাৎ যেসব বস্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব থেকেই আল্লাহ আছেন। আর আল্লাহ ব্যতীত যত বস্তু আছে, তার প্রত্যেকটি শেষ

---

১২. সহীহ মুসলিম ২৭১৩।

হওয়ার পরেও আল্লাহ তা'আলা থাকবেন। সুতরাং আল্লাহই প্রথম এই কথার অর্থ হচ্ছে সবকিছুর পূর্বে আল্লাহ বিদ্যমান থাকা আর আল্লাহই শেষ এই কথা অর্থ হচ্ছে সবকিছুর পর আল্লাহর অবশিষ্ট থাকা।

আর আল্লাহ তা'আলা **الظاهر** (প্রকাশমান) হওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর উপরে। **الظهور** থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য **الظاهر** নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। যুহুর শব্দটির ভাষাগত দাবী হচ্ছে উপরে হওয়া। বস্তুর উপরের অংশকেই যাহের বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বাতেন হওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি নিম্নজগতের (পৃথিবী ও তার মধ্যকার) প্রত্যেক সৃষ্টিকে এমনভাবে বেষ্টন করে আছেন যে, তিনি মাখলুকের আপন নফসের চেয়েও অধিক নিকটে। এটি হচ্ছে সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আর তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে আছে। উর্ধ্ব জগতের এবং নিম্নজগতের কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সবকিছুই তিনি অবহিত। আসমান ও যমীনে একটি সরিষার দানা পরিমাণ জিনিসও তাঁর ইলম থেকে অনুপস্থিত নয়।

উপরের আয়াত থেকে আল্লাহর জন্য এমন চারটি সম্মানিত নাম সাব্যস্ত হলো, যার দাবী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন। তিনি অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ তথা সকল যামানা ও তার মধ্যে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার সবকিছুকেই জ্ঞানের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন। সেই সাথে সকল স্থান ও তাতে ছোট-বড় যত প্রকার মাখলুক রয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেনঃ

وقوله سبحانه ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ وقوله ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

আল্লাহু বলেনঃ "তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না" (সূরা ফুরকান ২৫:৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ তিনি প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ" (আন'আম ৬: ১৮, সূরা সাবা ৩৪:১)।

....

ব্যাখ্যা: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ "তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না" (সূরা ফুরকান ২৫:৫৮)। অর্থাৎ তোমার সকল বিষয় সেই চিরজীবন্ত সত্তার নিকট সোপর্দ করে দাও, যার কখনোই মৃত্যু হবে না।

التوكل (তাওয়াক্কুল)এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে **التفويض** তথা অন্যের নিকট কোন বস্তু সোপর্দ করা। আরবরা বলে থাকে, **وكلت أمري إلى فلان أي فوضته** অর্থাৎ আমার বিষয়টি অমুকের নিকট সোপর্দ করলাম।

আর পরিভাষায় উপকারী বস্তু অর্জন করার জন্য এবং ক্ষতিকর জিনিস দূর করার জন্য অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করাকে **توكل** বলা হয়। অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা ইবাদতের অন্যতম একটি প্রকার। সুতরাং বান্দার সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা অপরিহার্য।

কল্যাণ অর্জনের জন্য কিংবা অকল্যাণ দূর করার জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়; বরং পরিশ্রম ও চেষ্টা করার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করার পূর্ণ মিল রয়েছে। তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আল্লাহর হায়াতকে খাস করার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিনি চিরজীবন্ত, কল্যাণ লাভের জন্য কেবল তাঁর উপরই ভরসা করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ চিরজীবন্ত নয় কিংবা অন্য কারো হায়াত চিরস্থায়ী নয়। মাখলুকের হায়াত যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়, তাই যে ব্যক্তি মাখলুকের উপর ভরসা করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মোট কথা, এই আয়াতে আল্লাহু তা'আলার জন্য হায়াতে কামেলা (পূর্ণাঙ্গ জীবন) সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং একই সাথে তাঁর পবিত্র সত্তার মৃত্যু হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার বেলায় নাফী ও ইছবাতকে একত্র করা হয়েছে।

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيْرُ আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ: আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম الحكيم এর দু'টি অর্থ রয়েছে।

হাকীমের এক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের মধ্যে সৃষ্টিগত ও শারীয়াতগত উভয় প্রকার আদেশের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে ফায়সালাকারী।

আর হাকীমের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে مُحكِم অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ প্রজ্ঞাবান এবং সকল বস্তুকে যথাযথ স্থানে মজবুতভাবে স্থাপনকারী। সে হিসাবে এটি الحكمة থেকে গৃহীত। প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করাকে হিকমত বলা হয়। সুতরাং আল্লাহু তা'আলাই তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালাকারী। তিনি যা সৃষ্টি করেন এবং তাঁর সৃষ্টিকে তিনি যেই আদেশ করেন, তাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একটি হিকমাত (রহস্য ও উদ্দেশ্য)। আল্লাহ তা'আলা কোন সৃষ্টিকেই অযথা সৃষ্টি

করেননি। মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর, তিনি কেবল তাই ইসলামী শারীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার الخبير নামটি الخبرة থেকে গৃহীত। الخبرة অর্থ হলো বস্তুসমূহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে থাকা। বলা হয় خبرت الشيئ إذا عرفته على حقيقته আমি জিনিসটি সম্পর্কে অবগত আছি। ইহা আপনি ঠিক ঐ সময় বলে থাকেন, যখন আপনি উহাকে তার আসল অবস্থাসহ জানতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন الخبير অর্থাৎ তিনি এমন সত্তা, যিনি স্বীয় ইলম ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকল বস্তুর অপ্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা ঠিক সেভাবেই অবগত আছেন, যেভাবে তিনি সেগুলোর প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহু তা'আলার সম্মানিত নামসমূহ থেকে দু'টি নাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হচ্ছে الحكيم (প্রজ্ঞাবান) অপরটি হচ্ছে الخبير (সর্বজ্ঞ)। একই সাথে এ নাম দু'টি আল্লাহর সিফাতসমূহ থেকে দু'টি সিফাতও সাব্যস্ত করছে। তা হচ্ছে হিকমাত ও খিবরাত তথা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও চাক্ষুস জ্ঞান।

إحاطة علمه بجميع مخلوقاته

৩। আল্লাহ তা'আলার ইলম সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা তা হতে বের হয়) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾

"তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা অবতীর্ন হয় ও যা কিছু আকাশে উঠে (সূরা সাবা ৩৪:২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জলে ও স্থলের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের

অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা আন'আম ৬:৫৯)।

....

ব্যাখ্যা: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ﴾ **'যমীনে যা প্রবেশ করে':** তার অন্যতম হচ্ছে বৃষ্টির পানি, শস্যের দানাসমূহ, গুপ্ত ধনসমূহ, মৃত ব্যক্তিদের লাশ ইত্যাদি।

আর وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا **'যমীন হতে যা বের হয়':** তার মধ্যে রয়েছে, উদ্ভিদ, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء **'আসমান থেকে যা নাযিল হয়':** তার মধ্যে রয়েছে বৃষ্টি, ফেরেশতা, আল্লাহর হুকুম আহকাম এবং অন্যান্য বিষয়।

আর وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا **'যা কিছু আকাশে উঠে':** বনী আদমের আমল ও আল্লাহর ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলার ইলম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সব কিছুকেই তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ **"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে:** অর্থাৎ অদৃশ্যের ভান্ডারসমূহ অথবা গায়েব সম্পর্কে ইলম অর্জনের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর নিকটেই। **لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ** তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উহা জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব থেকে কিছু জানার দাবী করল, সে কুফরী করল।

সহীহ বুখারী মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসে গায়েবের চাবিসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রসূল ﷺ বলেন:

مفاتحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إِلا اللَّهُ ثم قرأى هذه الأية ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا

تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ)

“গায়েবের চাবি হচ্ছে পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না, সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, সে কোন যমীনে মৃত্যু বরণ করবে” (সূরা লুকমান ৩১:৩৪)।[১৩]

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ স্থলভাগে যা আছে তিনি তা জানেন। অর্থাৎ পৃথিবীর বসতী এলাকায় এবং খালী জায়গায় যে সমস্ত বাসিন্দা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য যেসব রয়েছে, তা তিনি অবগত আছেন। এমনি **والبحر** জলভাগে যেসব প্রাণী, মূল্যবান মনি-মুক্তা এবং অনুরূপ মাখলুক রয়েছে, তাও তিনি জানেন।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ তাঁর অবগতি ব্যতীত একটি পাতাও ঝরে না: স্থলভাগ, জলভাগ এবং অন্যান্য স্থানের বৃক্ষসমূহের কোন পাতাই **إِلاَّ يَعْلَمُهَا** আল্লাহর অবগতি ছাড়া ঝরে পড়ে না। এমনি বৃক্ষের পাতাসমূহ কখন ও কোথায় পড়ে, তাও তিনি জানেন।

وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত ননঃ অর্থাৎ যমীনের অন্ধকারচ্ছন্ন স্থানসমূহে কিংবা মাটির নীচের শস্যদানা বা ক্ষুদ্রতম দানা পরিমাণ বস্তু সম্পর্কে তিনি অবগত।

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুইঃ অর্থাৎ সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই তিনি অবগত। এটি خاص -এর পর عام স্বরূপ। অর্থাৎ প্রথমে কিছু খাস বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, শুষ্ক ও আদ্র সকল বস্তু সম্পর্কেই তিনি জানেন।

---

১৩. সহীহ বুখারী ৪৬২৭, সহীহ মুসলিম ৯-১০, ইবনে মাজাহ ৬৪।

إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে: এগুলো থেকে যাই হোক না কেন, তার সবই লাওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে সাব্যস্ত করা হয়েছে গায়েবের ইলম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই। আল্লাহ তা'আলার ইলম প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এতে তাকদীর এবং লাওহে মাহফুযে তা লিখার কথাও প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে তার কথার (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

{وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ} {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} وقوله: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾

“আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না (সূরা ফাতির ৩৫: ১১)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

যাতে তোমরা জানতে পারো, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে” (সূরা তালাক ৬৫:১২)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

“আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা, শক্তিধর ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী” (সূরা যারিয়াত ৫১: ৫৭-৫৮)।

....

ব্যাখ্যাঃ ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ **“আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে নাঃ** অর্থাৎ আল্লাহর অবগতি ব্যতীত কোন নারী বা অন্য কোন প্রাণীর গর্ভধারণ এবং প্রসব হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন জিনিসই আল্লাহর ইলম ও তদবীরের বাইরে নয়। কোন দিন কোন নারী বা অন্য কোন প্রাণীর গর্ভে সন্তান ও

বাচ্চা আসবে, কোন দিন সে তা প্রসব করবে এবং ছেলে সন্তান প্রসব করবে? না মেয়ে সন্তান? আল্লাহু তাও জানেন।

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ **যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান:** এখানে لام এর সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পূর্বোক্ত বাণী: خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ এর সাথে। অর্থাৎ তিনি সাত আসমান ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারো।

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا **এবং যাতে আরো জানতে পারো যে, আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে:** অর্থাৎ যাতে তোমরা এই কথা জানতে পারো যে, আল্লাহর ইলম সবকিছুকে ঘিরে আছে। সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর ইলমের বাইরে নয়। সেটি যাই হোক না কেন।

علمًا শব্দটি **تمييز** হিসাবে অথবা **مفعول مطلق** হিসাবে মানসুব হয়েছে। কেননা **أحاط** অর্থ **علم** যার অর্থ তিনি অবগত হয়েছেন।

উপরের দু'টি আয়াত থেকে আল্লাহর এমন ইলম প্রমাণিত হচ্ছে, সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। সেই সাথে সকল বস্তুর উপর আল্লাহর ক্ষমতাও প্রমাণিত হলো।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ **'আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা':** আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রিযিক দাতা নেই। তিনি সকল সৃষ্টিকেই রিযিক দেন এবং তাদের কল্যাণে সবকিছুই সরবরাহ করেন। তিনি বিনা হিসাবে সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করো না।

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ **প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ শক্তির অধিকারী। তাঁর শক্তিতে কোন প্রকার দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আর **المتين** অর্থ হচ্ছে তিনি সর্বোচ্চ শক্তি ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং তাঁর কাজে কোন কষ্ট, ক্লান্তি এবং

দুর্বলতা অনুভব হয় না। আল্লাহ তা'আলার المتين নামটি المتانة ক্রিয়ামূল থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে কঠিন ও শক্তিমান হওয়া।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে আল্লাহর রায্যাক নামটি প্রমাণিত হলো। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সিফাত তথা পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা প্রমাণিত হলো যাতে কোন প্রকার দুর্বলতা ও ক্লান্তি আসতে পারে না। একই সাথে এই আয়াতগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা আবশ্যক। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى

৪। আল্লাহু তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যস্ত করণ

وقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} وقوله: {إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা" (সূরা শুরা ৪২: ১১)। আল্লাহ আরো বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সর্বোত্তম উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও দেখেন"। (সূরা নিসা ৪: ৫৮)

....

ব্যাখ্যা: **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়"**। এ আয়াতের প্রথম অংশ হচ্ছে:

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾

"আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের নিজ থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীব-জন্তুর জোড়া বানিয়েছেন "(সূরা শুরা ৪২: ১১)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যিনি সকল মানুষকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ অন্যান্য জীবজন্তুর জোড়া বানিয়েছেন, তার মত আর কিছুই নেই। কেননা তিনি

সেই একক অমুখাপেক্ষী সত্তা, যার কোন নযীর (সদৃশ) নেই। তিনি السميع (সর্বশ্রোতা), যিনি সকল ভাষার সকল আওয়াজই শুনেন। তিনি البصير (সর্বদ্রষ্টা), তিনি সবকিছুই দেখেন। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়।

ইমাম শাওকানী ﷺ তাঁর তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে এই আয়াতটি বুঝতে সক্ষম হবে এবং যথাযথভাবে তা নিয়ে গবেষণা করবে, আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে মতভেদকারীদের মতভেদ করা সত্ত্বেও সে উজ্জল ও সুস্পষ্ট পথে চলতে পারবে।

সে যদি আল্লাহর বাণী: وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ **"তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"**:

নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে। কেননা আল্লাহর অনুরূপ কোন জিনিস হওয়াকে পরিহার করার পর আল্লাহর জন্য উপরোক্ত দু'টি নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করার দ্বারা আল্লাহর আসমা ও সিফাতের প্রতি বিশ্বাস মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করে, অন্তর থেকে সকল ব্যধি সরিয়ে দেয় এবং হৃদয়কে শীতল করে তুলে।

সুতরাং হে সত্যের সন্ধানী! তুমি এই উজ্জল প্রমাণ এবং মজবুত দলীলের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করো। এর মাধ্যমেই তুমি অনেক বিদ'আতকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারবে, গোমরাহীর ইমামদের ভিত্তিকে ধ্বংস করতে পারবে এবং যুক্তিবাদীদের নাকে মাটি লাগাতে পারবে। বিশেষ করে যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীকে তার সাথে যুক্ত করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

তিনি লোকদের সামনের ও পেছনের সব অবস্থা জানেন। তারা তাদের জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না (সূরা ত্বহা ২০:১১০)।

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا **নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দান করেন:** এটি সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াতের শেষাংশ। আয়াতের পূর্বের অংশ হচ্ছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় আদল বা ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো"।

نعم শব্দটি প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত শব্দসমূহের অন্যতম। এর শেষে যুক্ত **ما** সম্পর্কে একাধিক কথা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি হচ্ছে **نكرة موصوفة**। সম্ভবত বাক্যটি এ রকম ছিল, **نعم شيئا يعظكم به** একটি উত্তম বিষয় দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন।

কেউ কেউ বলেছেন এখানে **ما** মাওসুল হিসাবে এসেছে। আসল বাক্যটি এ রকম ছিল, **نعم الشيئ الذي يعظكم به** অর্থাৎ যেই বিষয়টি দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তা কতই না উত্তম! **يعظكم** (উপদেশ দিচ্ছেন) অর্থ হলো তিনি তোমাদেরকে আমানত আদায় করার এবং মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করার আদেশ দিচ্ছেন।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا **আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা:**

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু বল আল্লাহ তা'আলা তা শুনেন এবং যা কিছু করো, তা তিনি দেখেন। উপরের আয়াত দু'টি থেকে আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রমাণিত হলো। আয়াত দু'টির প্রথমটিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মাখলুকের অনুরূপ নন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। উহাতে আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ক্ষেত্রে নাফী ও ইছবাতকে একত্র করা হয়েছে। অর্থাৎ একই সাথে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে ত্রুটি ও দোষযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিহার করা হয়েছে এবং তাঁর যাতে পাকের জন্য অতি উত্তম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى

৫। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ইচ্ছা বিশেষণ সাব্যস্ত করা

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে বললে না কেন) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

وقوله: {وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ} {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} وقوله: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন মাশা-আল্লাহ (আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে) বললে না কেন? আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই" (সূরা কাহাফ ১৮: ৩৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন"। (সূরা বাকারা ২:২৫৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

"তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশুই হালাল করা হয়েছে। তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু

ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন"। (সূরা মায়িদা ৫:১)

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর বাণী: **وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ** "তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে" **لَوْلاَ** শব্দটি এখানে **هلا** অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করার সময় **مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** বললে না কেন? অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে তোমার নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করতে। আল্লাহর জন্য পূর্ণ ক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়ে এই কথা বললে না কেন যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।

কোন কোন সালাফ বলেছেন, যার কাছে কোন জিনিস ভাল লাগে, সে যেন বলে **مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন": অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা যদি ইচ্ছা করতেন, তারা যুদ্ধ না করুক, তাহলে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কেননা আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু হওয়া অসম্ভব। আল্লাহর হুকুম প্রতিহত করার মত কেউ নেই এবং তাঁর ফায়সালা ঠেকানোরও কেউ নেই।

أُحِلَّتْ لَكُم তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে: এখানে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে এই কথা বলা হয়েছে।

بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশু: চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু বলতে এখানে উট, গরু, ছাগল এবং ভেড়া উদ্দেশ্য।

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া: এই বাক্যটি **بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ** থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ যেগুলোর আলোচনা সামনে আসছে, সেগুলোর গোশত খাওয়া তোমাদের জন্য

হালাল নয়। ঐ হারাম পশুগুলো উক্ত আয়াতের সামান্য পরেই অর্থাৎ সূরা মায়িদার ৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব, রক্ত, শূকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত প্রাণী এবং কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা অথবা কোন হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন প্রাণী, তবে তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে যবেহ করেছ সেটি ছাড়া। আর যা কোন বেদীমূলে (পূজার ঘরে, অলী-আওলীয়ার নামে, কবর ও মাজারের উদ্দেশ্যে) যবেহ করা হয়েছে তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও শুভ-অশুভ নির্ধারনের তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়। এগুলো ফাসেকী তথা আনুগত্য বহির্ভুত কাজ"।

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ কিন্তু ইহ্রাম বাধাঁ অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না: এই বাক্যটি بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র বিষয়। অর্থাৎ গৃহপালিত চতুষ্পদ সব জন্তুই তোমাদের জন্য হালাল। তবে এগুলো থেকে যেগুলো বন্য, সেগুলো শিকার করে ভক্ষণ করাও হালাল। কিন্তু যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন এগুলো শিকার করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর বাণী: **وَأَنتُمْ حُرُمٌ** হাল (অবস্থা জ্ঞাপক) হিসাবে নসব বা যবরের স্থানে রয়েছে। যারা হাজ্জ কিংবা উমরাহ অথবা উভয়টির ইহরাম বেঁধেছে, তাদেরকে حرم বলা হয়। ইহা محرم এর বহুবচন।

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ **নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেনঃ** অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেন। তাঁর ইচ্ছায় ও কর্মে আপত্তি উত্থাপন করার কেউ নেই। উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহর সিফাত হিসাবে ইচ্ছা, শক্তি এবং আদেশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সিফাত। আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এগুলো তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা জরুরী।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾

"আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে (সূরা আনআম ৬:১২৫)।

....

ব্যাখ্যাঃ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেনঃ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ঈমান ও তাওহীদ কবুলের তাওফীক দেন এবং তার অন্তরকে সত্য কবুলের জন্য উপযুক্ত করেন, তার অন্তরকে উহার জন্য প্রশস্ত করে দেন।[১৪] مَنْ শব্দটি فعل مضارع কে জযমদাতা এবং ইসমে শর্ত। يُرِدْ ফেলে (ক্রিয়া) মুযারেটি (ভবিষ্যত কালীন ক্রিয়া) শর্ত হিসাবে জযম যুক্ত।

আর يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ **"তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন"**। বাক্যটি শর্তের জবাব হিসাবে مجزوم (জযম যুক্ত)। الشرح অর্থ হচ্ছে

---

১৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান ও হেদায়াতকে ভালবাসে এবং সেদিকে স্বীয় ইচ্ছাকে ধাবিত করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ঈমানের পথ সহজ করে দেন ও তাকে সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলতে সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও আনুগত্যের কাজকে পছন্দ করে না, কুরআন-হাদীসের কথা যার কাছে ভাল লাগে না এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনার প্রতিও যে কর্ণপাত করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎপথে চলার তাওফীক দেন না এবং তাকে সাহায্যও করেন না।

الشق (বিদীর্ণ করা, চেরা, ফাটানো ইত্যাদি)। এর মূল অর্থ হচ্ছে التوسعة (প্রশস্ত করা)। বলা হয়ে থাকে شرحت الأمر তথা বিষয়টিকে প্রশস্ত করলাম। এই কথা আপনি ঠিক ঐ সময় বলেন, যখন আপনি তা প্রশস্ত করে বর্ণনা করেন এবং খোলাখুলি বয়ান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ঈমান ও তাওহীদ কবুলের তাওফীক দেন এবং তার অন্তরকে সত্য কবুলের জন্য উপযুক্ত করেন, তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা সত্য দ্বীন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেন। এর ফলে সে উন্মুক্ত হৃদয়ে ইসলাম কবুল করে নেয়।

وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা সত্য কবুল করা হতে ফিরিয়ে রাখতে চান, **يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا** তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন। ফলে তা সত্য কবুল করার জন্য উন্মুক্ত হয় না। **حَرَجًا** অর্থাৎ একদম সংকীর্ণ করে দেন, যার ফলে অন্তরে ঈমান ও হেদায়াত প্রবেশের কোন রাস্তাই থাকে না। ضَيِّقًا শব্দের অর্থকে জোরালো করার জন্য حرجا শব্দটি আনয়ন করা হয়েছে।

كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে: يصعد শব্দটি মূলত يتصعد ছিল। তা-কে সোয়াদ দ্বারা পরিবর্তন করে সোয়াদের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ যার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে, তার জন্য হেদায়াত কবুল করে নেয়ার বিষয়টি ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে কোন অসম্ভব কাজ সম্পাদন করার জন্য বার বার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে তা সম্পাদন করতে পারছে না। যেমন কেউ আকাশে উঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। যেই কাফেরের উপর ঈমান কবুল করে নেয়া খুব ভারী অনুভব হয়, তাকে ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে আকাশে উঠার মত সাধ্যাতীত কাজ সম্পাদন করতে চায়। উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য ইরাদাহ সাব্যস্ত হলো। কাউকে হেদায়াত করা আবার কাউকে গোমরাহ করা উভয়টিই আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

ইরাদাহ এর প্রকারভেদ:

আল্লাহ তা'আলার إرادة ইরাদাহ (ইচ্ছা) দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: **إرادة كونية قدرية** ইরাদায়ে কাওনীয়া কাদারীয়া বা ক্ষমতাগত ইচ্ছা। অর্থাৎ ভাল-মন্দ এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্ধারিত হয়েছে। এই প্রকার ইরাদাহ এবং المشيئة একই জিনিস। উভয়টি পরস্পর সমার্থবোধক। এই প্রকার ইরাদাহ্র উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾

"আমি যখন কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দেই, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾

"আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়সালা করেন তখন তা প্রতিহত হয় না (সূরা রা'দ ১৩:১১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾

"আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন"।

দ্বিতীয় প্রকার: ইরাদাহ হচ্ছে **إراداة دينية شرعية** ইরাদায়ে দ্বীনিয়া শারঈয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শারীয়াতগত ইচ্ছা। এই প্রকার ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি তাঁর বান্দাদের উপর শারীয়াতের সকল হুকুম-আহকাম বিধিবদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী:

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন (সূরা নিসা ৪: ২৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে (সূরা মায়িদা ৫:৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে"। (সূরা আহযাব ৩৩:৩৩)

ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে পার্থক্যঃ

(১) ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছার মাধ্যমে যা হয়, আল্লাহ কখনো তাকে ভালবাসেন ও তাতে সন্তুষ্ট থাকেন আবার কখনো তা তিনি ভালবাসেন না এবং উহার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না।

আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে যা সংঘটিত হয়, তাকে তিনি অবশ্যই ভালবাসেন এবং উহার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন। সুতরাং সকল প্রকার পাপকাজ এবং অকল্যাণও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শামিল। সে হিসাবে সৃষ্টি ও বিধানগত দিক থেকে তিনি পাপাচার সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পাপ কাজকে ভালবাসেন না এবং উহার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না। তিনি তাতে লিপ্ত হওয়ার আদেশও করেননি; বরং তা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

(২) ইরাদায়ে কাওনীয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইবলীস এবং সকল প্রকার

পাপাচার ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে মুমিন বান্দাগণ নফ্‌সে আম্মারা ও শয়তানের সাথে সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকে। শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকায় নিপতিত হয়ে মানুষ পাপকাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও আল্লাহর কাছে তারা তাওবা করে এবং ক্ষমা চায়। এমনি আরো ভালো উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন।

ঐদিকে শারঈ ইচ্ছার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা মূলতঃই উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও শারীয়াতগত এই উভয় দিক থেকেই ইচ্ছা করেছেন যে, বান্দারা তাঁর আনুগত্য করুক। কেননা তিনি আনুগত্যের কাজকে ভালবাসেন এবং উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

(৩) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা অবশ্যই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, সাথে সাথে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়"। (সূরা ইয়াসীন ৩৩:৮২-৮৩)

আর শারঈ ইচ্ছার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা সকল ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা সংঘটিত হয়, আবার কখনো হয় না।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

অনুগত একনিষ্ঠ মুমিন মুখলিস বান্দার মধ্যে ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়াহ উভয়টিই একত্রে বাস্তবায়ন হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ও নির্ধারণের দিক থেকে সৎকাজ সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহর যেই বান্দা আল্লাহর এই হুকুম কবুল করে নিয়েছে, তার মধ্যে আল্লাহর দু'টি ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে।

আর অপরাধীর অপরাধের মধ্যে শুধু ইরাদায়ে কাওনীয়াই বাস্তবায়ন হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের পথ বর্জন করে, তার দ্বারা অপরাধটি হয় শুধু এই হিসাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত অপরাধের স্রষ্টা; তাতে আদৌ আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টি থাকে না।

আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয়:

যারা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত উভয় প্রকার ইরাদাহ সাব্যস্ত করেনি এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেনি, তারা পথভ্রষ্ঠ হয়েছে। যেমন জাবরীয়া এবং কাদরীয়া (মুতাযেলা) সম্প্রদায়ের লোকেরা। জাবরীয়ারা শুধু আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া সাব্যস্ত করেছে। কাদরীয়ারা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে শারঈয়া সাব্যস্ত করেছে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উভয় প্রকার ইরাদাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও করেছে।

إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله

৬। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অলীদেরকে ঠিক সেভাবেই ভালবাসেন, যেভাবে তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়।

وقوله: {وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} {فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، وقوله: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}. وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} وقوله: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ}

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

“আর তোমরা ইহসান (অনুগ্রহ) করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন”। (সূরা বাকারা ২:১৯৫) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“সুবিচার করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন” (সূরা হুজুরাত ৪৯: ৯)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

“কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন”। (সূরা তাওবা ৯:৭) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

“নিশ্চয়ই যারা তাওবা করে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন”। (সূরা বাকারা ২:২২২) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ ﴾

“বলো! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন (সূরা আল-ইমরান ৩:৩১)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾

“আল্লাহ এমন বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর তারাও আল্লাহকে ভালবাসবেন (সূরা মায়িদা ৫:৫৪)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾

“আল্লাহ সেসব লোকদের ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল” (সূরা সাফ ৬১:৪)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

“তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু”। (সূরা বুরুজ ৮৫: ১৪)

....

ব্যাখ্যাঃ যেসব আয়াত আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম সিফাত إرادة (ইচ্ছা) সাব্যস্ত করেছে, তা উল্লেখ করার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এখানে ঐসব আয়াত উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহু তা‘আলার আরেকটি সিফাত المحبة (ভালবাসা) সাব্যস্ত করে। যারা বলে

আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালবাসা একই সমান এবং তারা এই উভয় সিফাতের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করে না, এই অধ্যায়ে শাইখুল ইসলাম তাদেরও প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলে থাকে, আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালবাসা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং উভয়ের প্রত্যেকটির জন্য অন্যটি আবশ্যক। সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই ভালবাসেন। পূর্বে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন জিনিসেরও ইচ্ছা করেন, যা তিনি ভালবাসেন না এবং উহাকে পছন্দও করেন না। যেমন কাফিরের কুফরী এবং সমস্ত পাপাচার। এগুলোকে তিনি স্বীয় ইচ্ছায় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তা বান্দার দ্বারা সংঘটিত হওয়া তিনি পছন্দ করেন না। আর তিনি এমন বিষয়েরও ইচ্ছা করেন, যা তিনি ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। যেমন ঈমান আনয়ন করা এবং সকল প্রকার আনুগত্যের কাজকে তিনি ভালবাসেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحْسِنُوٓاْ অর্থাৎ তোমরা ইহসান করো। এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ। তিনি তার বান্দাদেরকে ইহসান করার আদেশ করেছেন। পূর্ণরূপে এবং সর্বোত্তমভাবে কর্ম সম্পাদন করাকে ইহসান বলা হয়। ইহসান হচ্ছে আনুগত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদেরকে ভালবাসেন: এটি হচ্ছে ইহসানের আদেশ করার কারণ। আল্লাহ তা'আলা ইহসান করার আদেশ করেছেন। কেননা তিনি ইহসান করাকে এবং যারা ইহসান করে, তাদেরকে ভালবাসেন। বান্দারা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহসান কারীদেরকে ভালবাসেন, তখন তারা আদেশ পালনের জন্য উৎসাহ পাবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ তোমরা ন্যায় বিচার করো। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইক্বসাত করার আদেশ দিয়েছেন। ইক্বসাত হচ্ছে লেনদেন ও বিচার-ফায়সালা করার সময় নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য না করে সকলের প্রতি ইনসাফ করার নাম।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقسطِين **নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন:** এটি হচ্ছে ইনসাফের আদেশ করার কারণ। তিনি ইনসাফ করাকে ভালবাসেন বলেই বান্দাদেরকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার দাবী হচ্ছে তিনি তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ **কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো:** অর্থাৎ মুশরিকরা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে চলবে এবং চুক্তির বরখেলাফ করবে না, তোমরাও ততক্ষণ তাদের সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে চলবে। এই সময়ের মধ্যে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ **নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন:** এটি অঙ্গীকার ও চুক্তি ঠিক রাখার আদেশ করার কারণ। তিনি ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষা করার আদেশ করেছেন। কেননা এটি ঐ সমস্ত মুত্তাকীদের আমলের অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, চুক্তি রক্ষা করা এবং তা ঠিক রাখা মুত্তাকীদের কাজ। ছাওয়াবের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার সাথে সাথে পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম التقوى।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ **নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন:** تواب এর বহুবচন হচ্ছে التوابين। التوبة ক্রিয়ামূল থেকে এটি صيغة المبالغة তথা আধিক্য বাচক শব্দ। তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। শারীয়াতের পরিভাষায় পাপাচার থেকে ফিরে আসা এবং উহা বর্জন করাকে التوبة বলা হয়। তাওবা শব্দটি বান্দার পক্ষ হতে ব্যবহৃত হলে এই অর্থ হবে।

আর যখন উহা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন التواب আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন

বান্দা تواب (অধিক তাওবাকারী) এবং আল্লাহ তা'আলা التواب তথা অধিক হারে বান্দার তাওবা কবুলকারী।

বান্দার তাওবা হচ্ছে তার মালিক ও রবের দিকে ফিরে আসা। আল্লাহর তাওবা দুই প্রকার:

(১) বান্দাকে তাওবা করার তাওফীক দেয়া।

(২) বান্দার তাওবা কবুল করা।

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন: متطهر এর বহুবচন المتطهرين। এটি الطهارة ক্রিয়ামূল থেকে إسم فاعل। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাকে তাহারাত বলা হয়। এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি দুই প্রকার লোককে ভালবাসেন। তারা হচ্ছেন তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّه

বলো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন:

এই আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়ার শানে নুযুল হচ্ছে, যেমন ইবনে কাছীর رحمه الله এবং অন্যরা বলেছেন, একদল লোক দাবী করলো যে, তারা আল্লাহকে ভালবাসে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করলেন। কেননা এই আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালাকারী, যে আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু সে মুহাম্মাদী তরীকার উপর নয়। বরং সে তার দাবীতে মিথ্যুক।

يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন: মুহাম্মাদী তরীকার অনুসরণ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে যে পরিমাণ ভালবাসতে চাচ্ছ, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ

আল্লাহর ভালবাসা তোমরা অর্জন করতে পারবে। তোমাদের জন্য আল্লাহর ভালবাসা আল্লাহর প্রতি তোমাদের ভালবাসার চেয়ে অনেক বেশী।

আল্লাহর বাণীঃ

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

তাহলে আল্লাহ আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবেঃ

এটি পূর্বোক্ত বাক্যের মধ্যে যেই শর্ত রয়েছে, তার জবাব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে সরে পড়বে, তাহলে সে সরে যাক। তার বদলে আল্লাহ তা'আলা এমনসব লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে তার মহান কুদরতের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন, যেসব লোক তার দ্বীনের সাহায্য করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং তাঁর শারীয়াত কায়েম করা হতে বিমুখ হবে, তিনি তাদের বদলে তাদের চেয়ে উত্তম লোক সৃষ্টি করবেন। তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট ও মর্যাদা হবে সুউচ্চ। তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ভালবাসবেন। তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আবু বকর ﵁ এবং তাঁর বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেসব সাহাবী ও তাবেয়ী রিদ্দার যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অতঃপর তাদের পরে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যারা আগমন করবে, তাদের মধ্য হতে যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারাও আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করে ধন্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ **আল্লাহ সেইসব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে লড়াই করেঃ**

এখানে আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়তার সাথে সংবাদ দিয়েছেন, যারা এই বৈশিষ্টের অধিকারী, তিনি তাদেরকে ভালবাসেন। যারা জান ও মাল দিয়ে কালেমায়ে তাওহীদকে বিজয়ী করার জন্য তাঁর রাস্তায় জিহাদ করে, তাদেরকে তিনি ভালবাসেন। صفاً অর্থাৎ তারা যুদ্ধের সময় নিজেদেরকে কাতারবন্দী করে নেয় এবং নিজেদের স্থান থেকে সরে যায় না।

كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ তারা যেন সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় এক মজবুত প্রাচীর: তারা সীসা ঢালা এমন প্রাচীরের ন্যায় পরস্পর কাতারবন্দী থাকে, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলিত থাকে। তাতে কোন প্রকার ছিদ্র এবং ক্রটি থাকে না।

وهو الغفور তিনি ক্ষমাশীল: আল্লাহ তা'আলা অত্যাধিক ক্ষমাশীল। الغفر শব্দের অর্থ হচ্ছে الستر অর্থাৎ ঢেকে রাখা। গুনাহ করার পর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দেন অর্থাৎ তার গুনাসমূহ ঢেকে রাখেন এবং তার অপরাধসমূহ মাফ করে দেন। আল্লাহর الودود নামটি الود থেকে নেওয়া হয়েছে। নির্ভেজাল ও পরিশুদ্ধ ভালবাসাকে وِدٌّ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন ওয়াদুদ। এর অর্থ হচ্ছে, যারা তাঁর আনুগত্য করে, তিনি তাদেরকে খুব বেশী ভালবাসেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দু'টি সম্মানিত নাম الغفور এবং الودود-কে একসাথে উল্লেখ করার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার গুনাহ মাফ করেই ক্ষ্যান্ত হন না; বরং তিনি প্রথমে বান্দাকে ক্ষমা করেন অতঃপর তাকে ভালবাসেন।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালবাসা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোন কোন ব্যক্তিকে, কোন কোন আমলকে এবং কিছু কিছু স্বভাব-চরিত্রকে ভালবাসেন। তিনি কোন জিনিসকে ভালবাসেন আবার তাঁর হিকমতের দাবী অনুযায়ী কোন বিষয়কে ভালবাসেন না। তিনি ইখলাসের সাথে আমলকারী, মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, মুত্তাকী, তাঁর রসূলের আনুগত্যকারী, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, তাওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী এবং অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে ভালবাসেন। উপরের আয়াতগুলোতে উভয় পক্ষ হতেই ভালবাসা সংঘটিত হয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বান্দার পক্ষ হতে ভালবাসা হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হতেও হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّه

বলো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

এখানে ঐ সব লোকের প্রতিবাদ রয়েছে, যারা উভয় পক্ষ হতেই ভালবাসা সংঘটিত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। যেমন জাহমীয়া ও মুতাযেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা বলেছে, আল্লাহ ভালবাসেন না। বান্দার পক্ষ হতেও আল্লাহর জন্য ভালবাসা হয় না। আল্লাহর জন্য বান্দাদের ভালবাসার ব্যাখ্যা তারা এইভাবে করেছে যে, বান্দারা আল্লাহকে ভালবাসে, এর মানে হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালবাসেন, এর মানে হচ্ছে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তাদেরকে ছাওয়াব প্রদান করেন। এমনি আরো অনেক অপব্যাখ্যাই তারা করে থাকে। এই تأويل (অপব্যাখ্যা) সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতভাবেই তাঁর বান্দাদেরকে ভালবাসেন। তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে যেরকম ভালবাসা শোভনীয় হয়, তিনি সেভাবেই ভালবাসেন। আল্লাহর ভালবাসা তাঁর অন্যসব সিফাতের (বিশেষণের) মতই। আল্লাহর ভালবাসা মাখলুকের পরস্পরের ভালবাসার মত নয়।

إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى

৭। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণ সাব্যস্ত

وقوله: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا} {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} {وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} {فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু করছি" (সূরা ফাতিহা ১:১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ "হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো"। (সূরা মুমিন ৪০:৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا "এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান"। (সূরা আহযাব ৩৩:৪৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ "আর আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে"। (সূরা আরাফ ৭:১৫৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ "তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন (সূরা আনআম ৬:৫৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: وَهُوَ الْغَفُورُالرَّحِيمُ "আর তিনি ক্ষমাকারী ও দয়ালু (সূরা ইউনুস ১২:১০৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ "অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল"। (সূরা ইউসুফ ১২:৬৪)

....

ব্যাখ্যাঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এর ব্যাখ্যা পূর্বে কিতাবের শুরুতেই অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে আবার উল্লেখ করার কারণ হলো তাতে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সিফাত রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন পরের আয়াত গুলোতেও আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, আল্লাহ তা'আলার الرحمن নামটি এমন একটি সিফাতের প্রমাণ করে, যা তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সদা প্রতিষ্ঠিত। আর الرحيم তাঁর নামটি এমন সিফাতের প্রমাণ করে, যার সম্পর্ক হয় রহমত প্রাপ্তদের সাথে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا** **"এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান"**। কুরআনের কোথাও رحمن بهم বলা হয়নি। এতে বুঝা যায়, প্রথমটি আল্লাহ তা'আলার وصف (স্থায়ী বিশেষণ)এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি তাঁর فعل বা ক্রিয়ার জন্য। রহমান নামটি প্রমাণ করছে যে, রহমত আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্‌ফ তথা স্থায়ী বিশেষণ। আর রহীম নামটি প্রমাণ করছে যে, তিনি স্বীয় রহমত দ্বারা সৃষ্টির উপর দয়া করেন।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। এখানে ঐ সব ফেরেশতাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা দয়াময় আল্লাহর আরশ বহন করে আছেন এবং যারা আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করছেন। তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেন হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তোমার রহমত ও ইলম প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। **رَّحْمَةً وَعِلْمًا** শব্দদ্বয় ফায়েল হতে পরিবর্তিত হয়ে تمييز হিসাবে মানসুব হয়েছে। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা ও প্রশস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুনিয়াতে প্রত্যেক মুমিন ও কাফের আল্লাহর রহমত উপভোগ করছে। আর আখেরাতে শুধু মুমিনগণই আল্লাহর রহমত পাবেন।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান: এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি মুমিনদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত দয়ালু। দুনিয়াতে তাদের উপর আল্লাহর রহমত এভাবে হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে সেই সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, যা অন্যরা পায়নি এবং তাদেরকে এমন পথ দেখিয়েছেন, যা থেকে অন্যরা গোমরাহ হয়েছে। আর আখেরাতে তাদের উপর এভাবে রহমত করবেন যে, তিনি তাদেরকে ভয়াবহ বিপদের দিন নিরাপদ রাখবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অত্র আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলিম-কাফির তথা প্রত্যেক সৃষ্টিই আল্লাহর রহমত উপভোগ করছে। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহর রহমত শুধু মুমিনদের প্রতিই সীমিত হবে। সে দিন আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন: অর্থাৎ তিনি তাঁর পবিত্র সত্তার উপর রহমত করাকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এটি তাঁর পক্ষ হতে দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ। এটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত লিখা, তাঁর উপর অন্য কেউ লিখে দেয়নি।

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়: আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি ক্ষমা ও দয়ার বিশেষণে বিশেষিত। ঐ ব্যক্তির জন্যই কেবল তাঁর ক্ষমা ও রহমত, যে তাঁর নিকট তাওবা করে এবং তাঁর উপরই ভরসা করে। যে কোন গুনাহ থেকেই তাওবা হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। যেমন শির্ক বা অন্যসব গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা শির্ককারীর তাওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর উপর রহম করেন।

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাযতকারী: আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর নাবী ইয়াকুব عليه السلام এর কথা বর্ণনা করেছেন। যখন তাঁর ছেলেরা তাঁর নিকট তাদের ভাই ইউসুফ عليه السلام কে পাঠানোর আবেদন করল এবং ইউসুফ عليه السلام কে হেফাযত করার অঙ্গীকার করলো, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার হেফাযতই তোমাদের হেফাযতের চেয়ে অধিক উত্তম। ইয়াকুব عليه السلام স্বীয় পুত্রের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম الحفيظ (হেফাযতকারী)। হেফাযত বিশেষণের মাধ্যমেই তিনি তাঁর সকল বান্দাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের আমলসমূহকে সংরক্ষণ করেন।

আর তিনি মুমিন বান্দাদেরকে ঐসব বিষয় থেকে বিশেষভাবে হেফাযত করেন, যা তাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে পারে। সেই সাথে তিনি তাদেরকে ঐ বিষয় হতেও হেফাযত করেন, যা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের সিফাত (বিশেষণ) সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য সিফাতের ন্যায় আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই উহা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। তাতে জাহমীয়া, মুতাযেলা এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য বিদ'আতী সম্প্রদায়ের যে সব লোক সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তাশবীহ (তুলনা) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণকে অস্বীকার করে, এখানে তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মুতাযেলা ও জাহমীয়ারা বলে, দয়া করা মাখলুকের বৈশিষ্ট্য। তারা এই আয়াতগুলোকে রূপকার্থে ব্যাখ্যা করেছে। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য এই বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দয়া মানুষের দয়ার মত নয় যে, তাতে তাশবীহ বা সাদৃশ্য আবশ্যক হবে। যেমনটি তারা ধারণা করে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থাৎ তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা” (সূরা শুরা ৪২:১১)।

কোন বস্তুর নাম এক হলেই তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এক হওয়া জরুরী নয়। সৃষ্টিকর্তার জন্য রয়েছে এমন সব সিফাত, যা তাঁর জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট এবং মাখলুকের রয়েছে এমন সব সিফাত, যা তার জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট। আল্লাহই ভালো জানেন।

ذكر رضى الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرأن الكريم وأنه متصف بذلك

৮। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, ক্রোধান্বিত হন, ঘৃণা করেন এবং তিনি অপছন্দ করেন। সুতরাং তিনি এ সব বিশেষণে বিশেষিত

وقوله: { رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} وقوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴾ وقوله: {فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ} وقوله: {وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ} وقوله: {كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা মায়িদা ৫:১১৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, তথায় সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার উপর লা'নত করেছেন (সূরা নিসা ৪:৯৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴾

"এই শাস্তির কারণ হলো, তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর

অসন্তুষ্টির কারণ এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে পছন্দ করেনি (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾

"অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম (সূরা যুখরুফ ৪৩: ৫৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ ﴾

" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করেছেন। তাই তিনি তাদের শিথিল করে দিলেন (সূরা তাওবা ৯:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

"আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা নিজেরাই করো না"। (সূরা সাফ ৬১:৩)

ব্যাখ্যাঃ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ **আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা মায়িদা ৫:১১৯):** অর্থাৎ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য তারা যেই আমল করেছে, তাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেই নিয়ামাত দান করেছেন, তাতে তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বোচ্চ নিয়ামাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾

"আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বাধিক বড়" (সূরা তাওবা ৯:৭২)।

আল্লাহর প্রতি মুমিনদের সন্তুষ্টির ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেই

স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবে। এমনকি তাদের প্রত্যেকেই ধারণা করবে, তাকে যা দেয়া হয়েছে, অন্য কাউকে তা দেয়া হয়নি।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا **যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবেঃ** মুমিনকে হত্যাকারীর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, এই কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ভুলবশতঃ কোন মুমিনকে হত্যা করা হলে উক্ত শাস্তির সম্মুখীন হবে না।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি কোন মানুষকে নিরপরাধ জেনেও এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে, যার আঘাতে সাধারণত মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার ধারণাই করা হয়।

فَجَزَاؤُهُ **তার শাস্তিঃ** অর্থাৎ আখেরাতে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। জাহান্নাম হচ্ছে পরকালের আগুনের শাস্তির একটি স্তরের নাম।

خَالِدًا فِيهَا **তথায় সে চিরকাল থাকবেঃ** অর্থাৎ সে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। এখানে চিরকাল বলতে দীর্ঘ সময় অবস্থান উদ্দেশ্য।

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ **আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেনঃ** এই বাক্যটিকে এমন আরেকটি বাক্যের উপর আতফ করা হয়েছে, যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকেই বুঝা যায়। মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে যে, جعل جزاءه جهنم وغضب عليه অর্থাৎ তার শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং তার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন।

لعنه **তার উপর লা'নত করেছেনঃ** অর্থাৎ তাকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং বিতাড়িত করাকে লা'নত বলা হয়।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ **এই শাস্তির কারণ হলোঃ** অর্থাৎ এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে কঠোরভাবে কাফেরদের জান কবয করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদের রূহ কবয করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর আঘাত করবে।

اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ **তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ:** তার কারণ তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। তারা এমনসব পাপাচার এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে লিপ্ত ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ **"তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে পছন্দ করেনি:** তারা যেই ঈমান ও সৎ আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, তাকে অপছন্দ করেছে।

فَلَمَّا آسَفُونَا **তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো:** অর্থাৎ রাগান্বিত করলো।

انتَقَمْنَا مِنْهُمْ **তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম:** অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিলাম। কঠিন শাস্তি দেয়াকে এখানে ইনতিকাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ **কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করেছেন:** অর্থাৎ তোমাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধের জন্য তাদের বের হওয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

فَثَبَّطَهُمْ **তিনি তাদেরকে শিথিল করে দিয়েছেন:** অর্থাৎ তোমার সাথে বের হওয়া থেকে তাদেরকে আটকিয়ে দিয়েছেন। এ আটকিয়ে দেয়া ছিল আল্লাহর ফায়সালা ও নির্ধারণগত। যদিও শারীয়াতগত দিক থেকে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বাহ্যিকভাবে তাদেরকে এ জন্য সক্ষমও করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক হিকমাতের কারণে বের হওয়ার তাওফীক দেননি, যা কেবল তিনিই অবগত আছেন। আর তা তিনি পরের আয়াতেই উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে,

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

"যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না (সূরা তাওবা ৯:৪৭)।

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে: অর্থাৎ ঘৃণার দিক দিয়ে উহা অত্যন্ত ভয়াবহ। المقت অর্থ হচ্ছে البغض তথা ঘৃণা করা। مقتا শব্দটি تمييز হিসাবে মানসুব হয়েছে।

أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা নিজেরাই করো না: অর্থাৎ তোমরা নিজেদের নফস্ থেকে ভাল কাজের অঙ্গীকার প্রদান করে থাকো, কিন্তু তোমরা সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করো না।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এক প্রকার লোক জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলতো যে, আমাদের ইচ্ছা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিতেন, তাহলে আমরা উহা সম্পাদন করতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী ﷺ কে সংবাদ দিলেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ঐ সমস্ত পাপিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যারা ঈমানের পথ প্রত্যাখ্যান করেছে ও ঈমান আনয়ন করতে অস্বীকার করেছে। অতঃপর যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হলো, তখন মুমিনদের কেউ কেউ জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো এবং উহা তাদের কাছে খুব কঠিন মনে হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরাই করো না? (সূরা সাফ ৬১:২)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, অভিশাপ করা, প্রতিশোধ নেয়া, অপছন্দ করা, ঘৃণা করা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সিফাত (বিশেষণ)। এই সবগুলোই সিফাতে ফেলিয়া তথা কর্মগত বিশেষণ। এই বিশেষণগুলো আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এগুলোকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আহলে সুন্নাতের লোকেরা সেভাবেই তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সাব্যস্ত করেন।

ذكر مجيئ الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباه على ما يليق بجلاله

৯। কিয়ামাতের দিন বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই নেমে আসবেন, যেভাবে নামা তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়।

وقوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ} وقوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} {كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلًا}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ



"তারা কেবল সেই সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে, যখন মেঘমালার ছায়াসহ স্বয়ং আল্লাহ তাদের সামনে আগমন করবেন, বিপুল পরিমাণ ফেরেশতাগণও তাদের সামনে আসবেন। তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে (সূরা বাকারা ২:২১০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾

"তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন। অথবা তোমার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে (সূরা আনআম ৬:১৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۞ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

“কখনই নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে (সূরা ফাজর ৮৯:২১)। আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا﴾

“সেদিন আকাশ ফুড়ে একটি মেঘমালার উদয় হবে এবং ফেরেশতাদেরকে দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে” (সূরা ফুরকান ২৫: ২৫)।

....

ব্যাখ্যা: هَلْ يَنظُرُونَ তারা কেবল সেই সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে,: শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী যেসব কাফের ইসলামে প্রবেশ করেনি, এখানে তাদের জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। ينظرون অর্থ অপেক্ষা করছে। نظر এবং انتظر শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ যখন আল্লাহ তা‘আলা আসবেন: কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আগমন করবেন। তারা শুধু সেই দিনের অপেক্ষায় বসে আছে, যেদিন আল্লাহ্ বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে আমল অনুযায়ী বদলা দিবেন।

فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ মেঘমালার ছায়াসহ: ظلل শব্দটি ظلة -এর বহুবচন। যা আপনাকে ছায়া দেয়, তাকেই যুল্লাহ বলা হয়। আর হালকা-পাতলা সাধা মেঘমালাকে বলা হয় গামাম। মেঘমালাকে غمام হিসাবে নাম রাখার কারণ হলো, মেঘমালা তার নীচের প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তিকে ঢেকে ফেলে। মূলতঃ غم يغم অর্থ হচ্ছে ستر يستر অর্থাৎ ঢেকে রাখা।

والْمَلآئِكَة ফেরেশতাগণ: কিয়ামাতের দিন ফেরেশতাগণ মেঘমালার সাথে আগমন করবেন।

وَقُضِيَ الْأَمْرُ তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে: অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি নিস্পত্তি হয়ে যাবে।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবেঃ অর্থাৎ তাদের রূহ কবয করার জন্য ফেরেশতাগণ আগমন করবে। এখানে মৃত্যুর ফেরেশতা উদ্দেশ্য।

أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেনঃ অর্থাৎ তোমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য স্বয়ং চলে আসবেন।

أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ অথবা তোমার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবেঃ এখানে নিদর্শন বলতে আখেরী যামানায় পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় উদ্দেশ্য। আখেরী যামানায় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে। এটি কিয়ামাতের অন্যতম একটি বড় আলামত। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তখন কারো তাওবা কবুল হবে না।

كلا কখনই নয়ঃ এটি এমন একটি অব্যয়, যা তার পূর্বে উল্লেখিত বিষয় হতে ধমক দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার না করা ঠিক নয় এবং মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করার উৎসাহ না দেয়া ঠিক নয়। সেই সাথে মীরাসের ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলা এবং মালকে প্রচুর ভালবাসাও ঠিক নয়।

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবেঃ অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে এবং উহাকে পরপর খুব জোরে ধাক্কা দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর উপরস্থ সকল নির্মিত বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বালুকণায় পরিণত হবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেনঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেই বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করার জন্য নেমে আসবেন।

وَالْمَلَكُ ফেরেশতারাঃ এখানে ফেরেশতা বলতে সকল ফেরেশতা উদ্দেশ্য।

صَفًّا صَفًّا **সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেঃ** হাল হিসাবে মানসুব হয়েছে। অর্থাৎ তারা কাতারের পর কাতারবন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা সকল জিন-ইনসানকে ঘিরে ফেলবে। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ একেক কাতারে দাঁড়িয়ে পৃথিবী এবং উহার সকল দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। কিয়ামাতের দিন সাত আসমানের ফেরেশতাদের মোট সাতটি কাতার হবে।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ **সেদিন আকাশ ফুড়ে একটি মেঘমালার উদয় হবেঃ** অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে যাবে। আকাশ ফেটে নূরের এমন একটি বিরাট মেঘমালার উদয় হবে, যা দৃষ্টিসমূহকে ধাঁধিয়ে ফেলবে।

وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا **ফেরেশাতাদের দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবেঃ** ফেরেশতাদেরকে সেদিন দলে দলে পৃথিবীতে নামানো হবে। তারা নেমে এসে হাশরের ময়দানে সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য নেমে আসবেন।

উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করছে যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাসহ (নিজেই) আগমন করবেন। যেভাবে আগমন করা তাঁর মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য শোভনীয়, বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করার জন্য তিনি সেভাবেই নেমে আসবেন। আল্লাহ তা'আলার নেমে আসা তাঁর কর্মগত সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতভাবেই ইহাকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যক। আল্লাহর আগমন করাকে তাঁর আদেশ ও রহমত আসার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়। যেমন করে থাকে আল্লাহর সিফাতকে অবিশ্বাসকারী সম্প্রদায়। তারা বলে থাকে وَجَاءَ رَبُّكَ তোমার রব আসবেন অর্থ হচ্ছে তোমার রবের আদেশ আসবে। এই ব্যাখ্যা আল্লাহর আয়াতকে পরিবর্তন করার শামিল।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার দিকে যেই আগমন ও আসার সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা দুই প্রকার। একটি হচ্ছে مطلق

(সাধারণ ও কোন কিছু ছাড়াই) আগমন করা। আরেকটি হচ্ছে مقيد (কয়েদযুক্ত তথা কোন কিছু নিয়ে) আগমন করা। আল্লাহর আগমন দ্বারা যদি তাঁর রহমত, আযাব এবং অনুরূপ অন্য কিছু আসা উদ্দেশ্য হয়, তখন সেই আগমনকে কয়েদযুক্ত করা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে, **حتى جاء الله بالرحمة والخير** পরিশেষে আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ আগমন করল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾

“আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যামূলক করেছি (সূরা আরাফ ৭:৫২)

আর আল্লাহর দিকে যেই মুতলাক (সাধারণ) আগমণের সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা দ্বারা সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার আগমন উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ﴾

“তারা কেবল সেই সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে, যখন মেঘমালার ছায়াসহ স্বয়ং আল্লাহ তাদের সামনে আগমন করবেন? (সূরা বাকারা ২:২১০)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

“তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে” (সূরা ফাজর ৮৯:২২)।

إثبات الوجه لله سبحانه

১০। আল্লাহ্ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করণ:

وقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"একমাত্র তোমার সেই রবের চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিয়ান ও মহানুভব (সূরা আর রহমান ৫৫: ২৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّاوَجْهَهُ

"তাঁর চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে" (সূরা কাসাস ২৮:৮৮)।

ব্যাখ্যা: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ একমাত্র তোমার পালনকর্তার চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে। এ আয়াতের পূর্বে রয়েছে,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হবে"(সূরা আর রহমান ৫৫: ২৬)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে,

যমীনের সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে এবং সকল বস্তুই ধ্বংস হবে। মহান প্রভুর চেহারা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ তা'আলার কখনো মৃত্যু হবে না। তিনি সেই চিরজীবন্ত সত্তা, যার কখনোই মৃত্যু হবে না।

ذُو الْجَلَالِ যিনি মহিমময়: অর্থাৎ বড়ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।

وَالإِكْرَامِ মহানুভবঃ অনুগ্রহ ও সম্মানের অধিকারী। অর্থাৎ তিনি নাবী-রসূল এবং তাঁর সৎ বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেনঃ الإكرام অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা এমন প্রত্যেক জিনিসের উর্ধ্বে, যা তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ সব জিনিসই ধ্বংস হবেঃ আসমান ও যমীনে যা আছে, তার প্রত্যেকটিই ধ্বংস হবে এবং মৃত্যু বরণ করবে।

إِلَّا وَجْهَهُ কেবল তাঁর চেহারাই অবশিষ্ট থাকবেঃ وجهه শব্দটি মুস্তাসনা হিসাবে মানসুব হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। সমস্ত মাখলুক মৃত্যু বরণ করার পরও তাঁর মৃত্যু হবে না।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার চেহারা থাকার কথা প্রমাণিত হলো। আল্লাহর চেহারা আল্লাহর সত্তাগত সিফাত।

প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে। যে রকম চেহারা আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় তাঁর চেহারা ঠিক সে রকমই। তা কোন মাখলূকের চেহারার মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই (সূরা শুরা ৪২:১১)

আমরা আল্লাহর সিফাতকে বাতিলকারী সম্প্রদায়ের লোকদের মত কথা বলি না। তারা বলে আল্লাহর চেহারা দ্বারা আসল অর্থ উদ্দেশও নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সত্তা কিংবা ছাওয়াব, অথবা দিক অথবা অন্যান্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাগুলো একাধিক কারণে বাতিল।

(ক) হাদীসে আল্লাহর চেহারাকে আল্লাহর সত্তার উপর আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহর সত্তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর

তাঁর চেহারা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর যাত (সত্তা) এবং তাঁর চেহারা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস।

রসূল ﷺ তাঁর দু'আয় বলেছেন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"আমি মহান আল্লাহর সত্তা, তাঁর সম্মানিত চেহারা এবং তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতার ওয়াসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি"।[১৫]

আতফের অন্যতম দাবী হচ্ছে, তা পরস্পর ভিন্ন জিনিস বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

(খ) উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর চেহারাকে তাঁর সত্তার দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَجْهُ رَبِّكَ "তোমার পালনকর্তার চেহারা"। আর চেহারাকে বিশেষিত করা হয়েছে ذُوالْجَلَالِ والإكرام মহিয়ান ও দয়াবান, এই দু'টি বিশেষণের মাধ্যমে। وجه (চেহারা) দ্বারা যদি যাত বা সত্তা উদ্দেশ্য হত, তাহলে উক্ত আয়াতের মধ্যে الوجه শব্দটি সিলা হিসাবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ তা رب এর সিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হত; الوجه -এর সিফাত হতো না। তখন এভাবে বলা হতো, وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ। তা না বলে যখন ذُوالْجَلَالِ والإكرام বলা হয়েছে, তাতে বুঝা গেল যে, উহা চেহারার সিফাত হয়েছে, সত্তার সিফাত হয়নি। ঐদিকে আবার الوجه (চেহারা) আল্লাহর সত্তার সিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) কোন জাতির ভাষাতেই এটি পাওয়া যায় না যে, কোন জিনিসের চেহারা বলতে যাত (সত্তা) কিংবা ছাওয়াব বুঝায়। আরবী ভাষায় الوجه বলতে প্রত্যেক বস্তুর অগ্রভাগ ও সামনের অংশ বুঝায়। কেননা কোন বস্তুর দিকে অগ্রসর হলে সর্বপ্রথম অগ্রভাগই সামনে পড়ে। যেসব বস্তুর দিকে

---

১৫ . সহীহ: সুনানে আবু দাউদ ৪৬৬।

চেহারাকে ইযাফত বা সম্বন্ধ করা হবে সেসব বস্তু অনুযায়ীই চেহারার অর্থ হবে। وجه শব্দটিকে যদি কোনা সময়ের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তাহলে ইহার অর্থ হবে প্রথম সময়। যেমন বলা হয়, وجه النهار তথা দিবসের প্রথমাংশ। কোন প্রাণীর দিকে ইযাফত করলে উহার অর্থ হবে সেই প্রাণীর অঙ্গ বিশেষ। যেমন বলা হয়, وجه الفرس তথা ঘোড়ার চেহারা। আর যদি কোন পাহাড় বা দেয়ালের দিকে ইযাফত করা হয়, তাহলে উহার অর্থ হবে পাহাড় বা দেয়ালের চূড়া। যেমন বলা হয়, وجه الجبل তথা পাহাড়ের উপরের অংশ, وجه الجدار দেয়ালের সামনের অংশ ইত্যাদি। আর যখন চেহারাকে আল্লাহর দিকে ইযাফত করা হবে, তখন ইহার অর্থ হবে তাঁর অন্যতম সিফাত, যা কোন মাখলুকের সিফাতের অনুরূপ নয়।

إثبات اليدين لله تعالى في القرأن الكريم

১১। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলার দু'টি হাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وقوله: {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وقوله {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾

"যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাঁর সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫) আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আর ইহুদীরা বলে: আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাঁধা হয়ে গেছে। এ কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে; বরং তাঁর উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন" (সূরা মায়িদা ৫:৬৪)।

ব্যাখ্যা: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ " সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫) আয়াতে ইবলীসকে সম্বোধন করে ধমক দেয়া হয়েছে। অভিশপ্ত ইবলীস যখন আদম ﷺ কে সাজদা করা হতে বিরত রইল তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় রহমত থেকে বিতাড়িত করলেন এবং বললেন:

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ "যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি: অর্থাৎ আমি

যাকে কোন কিছুর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নিজের দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তাকে সাজদা করা হতে কোন জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে রাখল? এ থেকে আদম ﷺ এর জন্য সম্মান ও মর্যাদা সাব্যস্ত হয়।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ **আর ইহুদীরা বলেঃ** ইহুদীদের কথা, ﴿ هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ "আমরা তোমার নিকট ফিরে আসলাম বা তাওবা করলাম" থেকে ইয়াহুদ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তখন তাদের জন্য এটি একটি সম্মানজনক নাম ছিল। তাদের শারীয়াত মানসুখ হয়ে যাওয়ার পর যদিও তাতে এখন সম্মানের কোন অর্থ নেই, তথাপিও এই নামটি তাদের জন্য লাযেম হয়ে আছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন ইয়াকুব ﷺ এর অন্যতম পুত্র ইয়াহুদা বিন ইয়াকুবের দিকে নিসবত (সম্বন্ধ) করেই তাদেরকে ইহুদী বলা হয়েছে।

يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ **আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছেঃ** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এখানে ইহুদীদের সম্পর্কে বলছেন, তারা আল্লাহকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন তারা আরো বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন ফকীর এবং তারা হলো ধনী। আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে, তাদের এই কথা দ্বারা মূলতঃ তারা এটি উদ্দেশ্য করেনি যে, আল্লাহর হাতে বেড়ী লাগিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ **তাদের হাতই বাঁধা হয়ে গেছেঃ** আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ কথার মাধ্যমে তাদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তারা যেই মিথ্যা রচনা করেছে, তার মোকাবেলায় উপরোক্ত কথা বলা হয়েছে। আসলে তাদের এরূপই হয়েছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর কৃপণতা এবং মারাত্মক হিংসা। আপনি ইহুদীদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক কৃপণ হিসাবে দেখতে পাবেন।

وَلُعِنُوا بِمَا قَالُو ا **তাদের এই কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছেঃ** এ বাক্যকে পূর্বের বাক্যের সাথে আতফ (যুক্ত)

করা হয়েছে। এখানে با হরফে জারটি سببية কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই কথার কারণে তারাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদে আরো বলেছেন:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ **বরং তাঁর উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত:** অর্থাৎ দান করার ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন। দানের মাধ্যমে তাঁর দুই হাত সদা প্রসারিত।

يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ **তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন:** এটি স্বতন্ত্র বাক্য। এ বাক্যটি আল্লাহর পূর্ণ বদান্যতার বিষয়টি জোরালোভাবে বর্ণনা করেছে। তাঁর ইচ্ছা অনুপাতেই তিনি ব্যয় করেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন ব্যয়ের হাত সম্প্রসারিত করেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, তখন উহা সংকোচিত করেন। সুতরাং তাঁর হিকমতের দাবী অনুসারে তিনিই সম্প্রসারণকারী এবং তিনিই সংকোচনকারী।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে কারীমা হতে মহান আল্লাহর দু'টি হাত থাকার কথা প্রমাণিত হলো। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় তাঁর দু'টি হাত রয়েছে। এই হাত দু'টি কোন মাখলুকের দুই হাতের মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

অর্থাৎ তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই (সূরা শুরা ৪২: ১১)।

যারা আল্লাহর প্রকৃত দুই হাতকে অস্বীকার করে, এখানে তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেই সাথে যারা ধারণা করে, হাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত অথবা নিয়ামত উদ্দেশ্য তাদেরও প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা হাত দ্বারা যদি কুদরতী হাত উদ্দেশ্য হতো, যেমন বাতিলপন্থীরা ধারণা করে থাকে, তাহলে আল্লাহর উভয় কুদরতী হাত দ্বারা আদমকে খাসভাবে সৃষ্টি করার মধ্যে কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকার কথা বাতিল বলে প্রমাণিত হতো। অর্থাৎ আদমের জন্য কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত

হতো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুককে এমনকি ইবলীসকেও স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আদমকেও যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারাই সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾

"যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি"

এর মধ্যে আদমের জন্য ইবলীসের উপর কী ফাযীলত থাকতে পারে? হাত দ্বারা যদি কুদরত উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইবলীসের জন্যও এই কথা বলার সুযোগ থাকতো যে, আমাকেও তো তোমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছো।

আরো বলা যেতে পারে যে, হাত দ্বারা যদি কুদরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার কুদরত মাত্র দু'টি হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ মুসলিমদের ঐক্যমতে এ কথা বাতিল বলে প্রমাণিত। কেননা আয়াতের মধ্যে আল্লাহর দুই হাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সেই সাথে আরো বলা যেতে পারে যে, হাত দ্বারা যদি নিয়ামত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাত্র দু'টি নিয়ামত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এটি সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা আল্লাহর নিয়ামাত অসংখ্য, মাত্র দু'টি নয়।

إثبات العينين لله تعالى

১২। আল্লাহ তা'আলার দু'টি চোখ সাব্যস্ত করণ

وقوله: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} {وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ} {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}

আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾

"হে নাবী! তোমার রবের ফায়সালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো (সূরা আত-তূর ৫২:৪৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ﴾

"আর নূহকে আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম, যা আমার চোখের সামনেই চলছিলো। এ ছিলো সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ, যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো" (সূরা কামার ৫৪:১৩-১৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾

"আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও"। (সূরা ত্বহা ২০: ৩৯)

....

ব্যাখ্যা: الصبر **শব্দের** আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া ও আটকিয়ে রাখা। দুঃখ-বেদনায় পড়ে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে নফসকে আটকিয়ে রাখা, জবান দিয়ে অভিযোগ করা ও বিরক্তি প্রকাশ করা হতে জবানকে আটকিয়ে রাখা এবং হাত দিয়ে গালে চপেটাঘাত করা ও পরিহিত জামা বুকের দিক থেকে ছিড়ে ফেলা থেকে হাতকে আটকিয়ে রাখাকে শারীয়াতের পরিভাষায় সবর বলা হয়।

لِحُكْمِ رَبِّكَ তোমার রবের ফায়সালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত সবর করো। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ফায়সালা ও শারীয়াতের ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো: অর্থাৎ আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার হেফাযতের অধীনেই আছো। সুতরাং কাফেররা তোমাকে কষ্ট দিবে, এই পরোয়া করো না। কষ্ট দেয়ার জন্য তারা কখনোই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।

وَحَمَلْنَاهُ আরোহন করিয়ে দিলাম: নূহ আলাইহিস সালামকে।

عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত: অর্থাৎ লম্বা ও প্রশস্ত কাঠ দিয়ে তৈরী নৌকার মধ্যে তাকে উঠালাম। সেই কাষ্ঠগুলোতে অনেকগুলো পেরেক মেরে দেয়া হয়েছিল। دسر (পেরেক) শব্দটি دسار এর বহুবচন।

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا আমার চোখের সামনে দিয়েই চলছিল: অর্থাৎ আমার দৃষ্টি পড়ার স্থান দিয়ে এবং আমার হেফাযতেই চলছিল।

جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ এ ছিল সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো: অর্থাৎ আমি নূহ عليه السلام ও তাঁর অনুসারীদেরকে নাজাত দিয়ে তাঁর জাতির অবিশ্বাসী লোকদের সাথে যেই আচরণ করেছিলাম এবং মহাপ্লাবনের পানিতে ডুবিয়ে মেরে যেই শাস্তি তাদেরকে দিয়েছিলাম তা

মূলতঃ নূহ ﵇ এর সাথে কুফুরী করার কারণে ও তাঁর আদেশ অমান্য করার কারণেই।

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম: এখানে মুসা ﵇ কে সম্বোধন করে এই কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমার উপর আমার ভালবাসা স্থাপন করলাম এবং তোমাকে ভালবাসলাম। সেই সাথে আমার সৃষ্টির কাছেও তোমাকে প্রিয় করে দিলাম।

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও: অর্থাৎ আমার দৃষ্টির সামনেই যাতে তুমি প্রতিপালিত হও এবং ফিরআউনের ঘরে তোমাকে যেন খাওয়ানো হয়, আমি তোমার জন্য সেই ব্যবস্থা করলাম। সেই সাথে সর্বদা আমি তোমাকে দেখছি, তোমার প্রতি আমার দৃষ্টি রাখছি এবং তোমাকে হেফাজত করছি।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য যেমন দু'টি চোখ শোভনীয়, তাঁর জন্য ঠিক সেরকমই দু'টি চোখ রয়েছে। কুরআনুল কারীমে العين (চোখ) শব্দটি আল্লাহর প্রতি একবচন ও বহুবচন এই উভয়ভাবেই مضاف (সম্বোধিত) হয়েছে। হাদীসেও এটিকে আল্লাহর প্রতি দ্বি-বচন হিসাবে সম্বোধিত হয়েছে। দাজ্জালের হাদীসে নাবী ﷺ বলেন:

(أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ)

"নিশ্চয়ই তোমাদের রব অন্ধ নন"।[১৬]

এ কথা বলে নাবী ﷺ তাঁর চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এখানে সুস্পষ্ট যে, এই হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য একচোখ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। যার চোখ মাত্র একটি সে তো প্রকাশ্য কানা। আল্লাহ তা'আলা এই দোষের অনেক উর্ধ্বে।

---

১৬. সহীহ: সহীহ বুখারী ৪৪০২, আবূ দাউদ ৪৩২০, তিরমিযী ২২৪১।

আরবদের ভাষায় مضاف إليه এর অবস্থা অনুপাতে مضاف কখনো একবচন, কখনো দ্বি-বচন আবার কখনো বহুবচন হয়। একবচনের اسم বা বিশেষ্যকে যদি একবচনের ضمير এর (সর্বনামের) দিকে ইযাফত (সম্বন্ধ) করা হয়, তাহলে সেই ইসমকেও একবচন ব্যবহার করতে হয়। যেমন: هذا قلمك এটি তোমার কলম। আর যদি বহুবচনের শব্দের দিকে ইযাফত করা হয়, চাই সে বহুবচন ইসমে যাহের হোক কিংবা সর্বনাম হোক, তাহলে শাব্দিক মিল রাখার জন্য সেই مضاف বা সম্বোধিত পদকে বহুবচন ব্যবহার করাই উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا আমাদের চোখসমূহের সামনেই নৌকাটি চলছিল। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾

"এরা কি দেখে না, আমাদের নিজের হাতসমূহের তৈরী জিনিসের মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু?" (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭১)।

আর যখন আরবরা তাদের ভাষায় দ্বি-বচনের শব্দকে অপর কোন দ্বি-বচনের শব্দের দিকে ইযাফত করে, তখন তারা বাক্যকে অধিকতর ফাসীহ (সুস্পষ্ট) করার জন্য দ্বি-বচনকেও (মুযাফকেও) বহুবচন ব্যবহার করে থাকে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾

" তোমাদের দু'জনের মন সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে" (সূরা তাহরীম ৬৬:৪)।

নাবী ﷺ এর দুইজন স্ত্রীর অন্তর মাত্র দু'টি। দ্বি-বচনের শব্দকে দ্বি-বচনের দিকে ইযাফত করার কারণে দ্বি-বচন মুযাফকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আমরা তোমাকে চোখ দিয়ে দেখছি এবং হাত দিয়ে ধরে রাখছি, এ কথা কোন শ্রোতারই বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ থেকে পৃথিবীর কোন মানুষই এ কথা থেকে বুঝে না যে, একটি চেহারায় অনেকগুলো (দুই এর অধিক) চোখ থাকে।

إثبات السمع والبصر لله تعالى

১৩। আল্লাহ্ তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করণ

وقوله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} وقوله: {لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} وقوله: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} وقوله: {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

"যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা" (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:০১)। আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের প্রতিবাদ করে বলেন:

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾

"নিসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান (সূরা আল-ইমরান ৩:১৮১)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

"তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় এবং গোপন পরামর্শ শুনিনা? হ্যাঁ, শুনি। আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে" (যুখরুফ ৪৩:৮০)। আল্লাহ তা'আলা মূসা عليه السلام ও তাঁর ভাই হারূন عليه السلام কে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

"আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও দেখি (সূরা তোহা ২০: ৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾

"সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?" (সূরা আলাক ৯৬:১৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি উঠো এবং সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা ও নড়া-চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" (সূরা শুআরা ২৬:২১৮-২২০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

"হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাকো। আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন (সূরা সূরা তাওবা ৯: ১০৫)

....

ব্যাখ্যা: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي **"আল্লাহ তার কথা শুনেছেন:** খাওলা বিনতে ছা'লাবার কথা বলা হয়েছে।

تُجَادِلُكَ **তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে:** হে নাবী! সে তোমার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে বারবার কথা বলছিল। খাওলার স্বামীর নাম ছিল আওস

বিন সামেত। আর এটি ছিল ঐ সময়ের ঘটনা, যখন সে তার স্ত্রীর সাথে যিহার (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম, নিজের স্ত্রীকে তাদের কারো সাথে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়) করেছিল।

وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّه **সে আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে:** এ বাক্যটিকে تجادلك এর সাথে আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রসূল ﷺ যখন আওসের স্ত্রী খাওলাকে বললেন, (قد حرمت عليه) তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো, তখন খাওলা বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! তিনি তো তালাক শব্দ উচ্চারণ করেননি। অতঃপর খাওলা বলতে লাগল, আমি আল্লাহর কাছেই আমার অভাব-অনটনের অভিযোগ করছি এবং আমার নিঃসঙ্গের কথা তাঁকেই জানাচ্ছি। জেনে রাখুন: আমার রয়েছে আওসের পক্ষ হতে কয়েকটি শিশু সন্তান। আমি যদি সন্তানগুলোকে তার নিকট সোপর্দ করি, তাহলে তারা ধ্বংস হবে এবং আমার কাছে নিয়ে আসলেও ক্ষুধায় মরবে। এই বলে সে আকাশের দিকে মাথা উঠাচ্ছিল এবং বলছিল: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভিযোগ করছি।

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا **আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন:** অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথার পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করেন।

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ **নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা:** তিনি সব আওয়াজ শ্রবণ করেন এবং সব মাখলুকের প্রতিই রয়েছে তাঁর দৃষ্টি। এই মহিলাটি তোমার সাথে যেই বাদানুবাদ করছে এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করছে, তাও আল্লাহর শ্রুত আওয়াজ সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ **নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐসব লোকদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান:** এরা হচ্ছে ইহুদীদের একটি দল। আল্লাহ তা'আলা যখন এই আয়াত নাযিল করলেন:

﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

"তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত?" (সূরা বাকারা ২:২৪৫)।

তখন ইহুদীরা উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। দুর্বল ও দরিদ্র লোকদের সাথে ছলনা করার জন্যই তারা উক্ত কথা বলেছিল। আসলে তারা বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ ফকীর আর তারা ধনী। কেননা তারা আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিল। দ্বীন ইসলামের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যই তারা এই ধরণের কথা বলেছিল।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় শুনি না? তারা তাদের মনের মধ্যে যেই বিষয় গোপন করে অথবা নির্জন স্থানে একত্রিত হয়ে পরস্পর যেই আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন।

وَنَجْوَاهُمْ গোপন পরামর্শ: অর্থাৎ তিনি তাদের গোপন পরামর্শও জেনে ফেলেন। তারা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেই গোপন পরামর্শ করে আল্লাহ তা'আলা তাও জানেন। মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে গোপনে যেই আলাপ করে এবং অন্যদের থেকে তা ছাপিয়ে রাখে, তাকেই নাজওয়া বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: হ্যাঁ, আমি সেই গোপন আলাপ সম্পর্কে জানতে পারি এবং তা শুনে ফেলি।

وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থাকে ও লিপিবদ্ধ করে: অর্থাৎ সম্মানিত লেখকগণ তাদের নিকট অবস্থান করে তাদের থেকে যেসব কথা ও কাজ প্রকাশিত হয়, তার সবই লিখে ফেলেন।

إِنَّنِي مَعَكُمَا আমি তোমাদের সাথে আছি: আল্লাহ তা'আলা যখন মুসা عليه السلام ও হারুন عليه السلام কে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, **إِنَّنِي مَعَكُمَا** আমি তোমাদের সাথে আছি। এই

কথার অর্থ হচ্ছে তোমাদেরকে হেফাযত করার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছি।

أَسْمَعُ وَأَرَى আমি শুনি এবং দেখি: অর্থাৎ আমি তোমাদের উভয়ের কথা শুনছি এবং তোমাদের শত্রুর কথাও শুনছি। সে সাথে তোমরা দু'জন যে স্থানে অবস্থান করছো তা আমি দেখছি এবং তোমাদের শত্রু যে স্থানে আছে, সে স্থানও দেখছি। তোমরা দুইজন যা করছো এবং সে যা করছে, তাও দেখছি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **لا تَخَافَا** তোমরা ভয় করো না।

أَلَمْ يَعْلَم সে কি জানে না? এখানে আবু জাহেলের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা বলা হয়েছে। সে যখন রসূল ﷺ কে কাবার চত্বরে সলাত পড়তে নিষেধ করেছিল।

بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন এবং তার কথা শুনছেন? আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাকে তার কাজের পূর্ণ সাজা দিবেন। এই প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে ভয় দেখানো হয়েছে এবং ধমক দেয়া হয়েছে।

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ তিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি উঠো: অর্থাৎ যখন তুমি একাকী সলাতের জন্য উঠো ও সলাত পড়ো তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখেন।

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা এবং নড়া-চড়ার প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখেন: অর্থাৎ তুমি যখন জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করার সময় রুকুতে থাকো কিংবা সাজদায় থাকো অথবা দাঁড়ানো থাকো, তখনো আল্লাহ তোমাকে দেখেন।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ তুমি যা বলো, তিনি অবশ্যই উহা শুনেন এবং তা জানতে পারেন।

وَقُلِ اعْمَلُوا হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাকো: আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি এইসব মুনাফেকদেরকে বলে দাও যে, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করতে থাকো এবং তোমরা তোমাদের বাতিল পথেই চলতে থাকো। কিন্তু তোমরা এই কথা মনে করো না যে, তোমাদের আমলসমূহ গোপন থাকবে।

فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনগণ! তোমাদের কাজ দেখবেন: অর্থাৎ মানুষের সামনে তোমাদের আমলসমূহ প্রকাশিত হবে এবং দুনিয়াতেই তা দেখা যাবে।

মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এমন এক সত্তার দিকে,

إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

'যিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি তোমাদের বলে দেবেন।' অতঃপর তিনি সেই আমলগুলোর বদলা দিবেন।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ মিলে যে, তাতে আল্লাহ তা'আলাকে শ্রবণ করা ও দেখা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ শ্রবণ করেন ও দেখেন। তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে শ্রবণ করা ও দেখা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই দেখেন ও শুনেন। তবে তিনি সৃষ্টির সিফাতসমূহ থেকে এবং সৃষ্টির সাদৃশ্য হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

উপরের আয়াতগুলো আল্লাহর জন্য শ্রবণ করা এবং দেখা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একদম সুস্পষ্ট। তাতে فعل ماضي তথা অতীত কালের জন্য তৈরী শব্দ قد سمع (অবশ্যই শুনেছেন)এর মাধ্যমে, فعل مضارع তথা বর্তমান-ভবিষ্যতের জন্য গঠিত শব্দ يسمع (শুনছেন)এর মাধ্যমে এবং اسم فاعل তথা কতৃবাচক বিশেষ্যের জন্য গঠিত শব্দ سميع (শ্রবণকারী)এর

মাধ্যমে আল্লাহর জন্য শ্রবণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। মোট কথা سمع, يسمع, سميع এই তিনটি শব্দ আল্লাহর জন্য শ্রবণ করা বিশেষণ অত্যন্ত জোরালোভাবেই সাব্যস্ত করেছে। যে বস্তু বা প্রাণী শুনতে পায় না আরবদের ভাষায় তাকে শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা বলা সঠিক নয়। যে প্রাণী বা বস্তু শুনতে পায় এবং দেখতে পায়, শুধু তার ক্ষেত্রেই বলা হয় যে, يسمع ويبصر। এটিই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি। আরবীতে এ কথা বলা হয় না যে, الجبل سميع بصير পাহাড় শুনে ও দেখে। যে শুনে এবং দেখে তাকে ছাড়া অন্য কারো জন্য এই কথা বলা অসম্ভব।

إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به

১৪। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র বিশেষণ সাব্যস্ত করণ

وقوله: {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} وقوله: {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} وقوله: {وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} وقوله: {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا}

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾

"তিনি মহাশক্তিশালী (সূরা রা'দ ১৩:১৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

"তারা (বনী ইসরাঈলের ইহুদী কাফিররা ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্র করলো। জবাবে আল্লাহও তাঁর গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম" (সূরা আল-ইমরান ৩:৫৪)। আল্লাহ তা'আলা সালেহ عليه السلام এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

"তারা বড় ধরণের একটি ষড়যন্ত্র করলো এবং আমিও বিরাট একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না" (সূরা নামল ২৭:৫০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾

“এরা একটি ষড়যন্ত্র করছে এবং তাদের মুকাবেলায় আমিও একটি কৌশল করছি ” (সূরা তারিক ৮৬:১৫-১৬)।

....

ব্যাখ্যা: وَهُوَ তিনি: অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা।

شَدِيدُ الْمِحَالِ মহাশক্তিশালী (সূরা রা’দ ১৩:১৩)। **المحل** শব্দের আভিধানিক অর্থ কঠোরতা। অর্থাৎ কঠোর ষড়যন্ত্র।

ভাষাবিদ ইমাম যাজ্জায বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় ماحلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد অর্থাৎ তুমি তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শনে অবতীর্ণ হলে। এই কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন তুমি তার সাথে শক্তি ও কঠোরতা প্রদর্শনে অবতীর্ণ হও। যাতে করে সুস্পষ্ট হয়, কে অধিক কঠোর।

ইবনুল আরাবী ﷀ বলেন, المحال অর্থ ষড়যন্ত্র করা। আল্লাহ তা‘আলা অত্যন্ত কঠোর ষড়যন্ত্রকারী এবং মহাকৌশল অবলম্বনকারী। আল্লাহর পক্ষ হতে ষড়যন্ত্র করার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাকে এমনভাবে শাস্তি দেয়া, যাতে সে বুঝতে না পারে।

وَمَكَرُوا তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করলো: অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল। এখানে তাদের ঐসব লোক উদ্দেশ্য, যাদের নিকট থেকে ঈসা ﵇ কুফুরী অনুভব করেছিলেন। তারা ছিল বনী ইসরাঈলের কাফের সম্প্রদায়। তারা ইসা ﵇ কে হত্যা করতে এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইল। **المكر** (ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা) বলা হয় এমন কাজ করাকে, যার উদ্দেশ্য হয় সেই কাজের বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত।

وَمَكَرَ اللَّهُ আল্লাহ তা‘আলাও ষড়যন্ত্র করলেন: এই কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে প্রথমে অবকাশ দিয়ে পরবর্তীতে পাকড়াও করলেন এবং তাদেরকে ষড়যন্ত্রের শাস্তি দিলেন। ঈসা ﵇ এর সাদৃশ্য ও

আকৃতি অন্য এক ব্যক্তিকে প্রদান করলেন এবং ঈসাকে উপরে আল্লাহর দিকে উঠিয়ে নিলেন।

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ **আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম ষড়যন্ত্রকারী:** অর্থাৎ তিনি শাস্তি ও কষ্টের যোগ্য ব্যক্তিকে কষ্ট ও শাস্তি প্রদান করতে সর্বাধিক শক্তিশালী ও সক্ষম। তিনি এমনভাবে তা করতে সক্ষম যে, ষড়যন্ত্রকারীরা তা বুঝতেই পারেনা।

وَمَكَرُوا مَكْرًا **তারা বড় ধরণের একটি ষড়যন্ত্র করলো:** এখানে সালেহ ﷺ এর সম্প্রদায়ের কাফিরদের ষড়যন্ত্রের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর নাবী সালেহ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সালেহ ﷺ এর ওয়ারিস এবং আত্মীয়দের ভয়ে তারা এই ষড়যন্ত্র গোপনে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। যাতে তারা হত্যাকারীদের পরিচয় জানতে পেরে প্রতিশোধ নিতে না পারে।

وَمَكَرْنَا مَكْرًا "আমিও বিরাট একটি কৌশল অবলম্বন করলাম"। অর্থাৎ তাদের এই কর্মের প্রতিফল দিলাম ও তাদেরকে ধ্বংস করলাম এবং আমার নাবী সালেহকে নাজাত দিলাম। অথচ তারা আমার এ কৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতেই পারেনি।

إِنَّهُمْ **তারা:** এখানে মক্কার কুরাইশ কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

يَكِيدُونَ كَيْدًا **একটি ষড়যন্ত্র করছে:** মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে যেই সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তারা প্রতিহত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। [শুধু তাই নয়; তারা স্বয়ং রসূল ﷺ কে রাতের অন্ধকারে হত্যা করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাথে কৌশল করেছেন এবং তাদের সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর রসূলকে তাদের চোখের সামনে দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়েছেন। তারা তাঁকে দেখতেই পারেনি।]

وَأَكِيدُ كَيْدًا তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমিও একটি কৌশল করছি: অর্থাৎ তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করি এবং তাদের ষড়যন্ত্রের সাজা দেই। অতঃপর তাদেরকে আকস্মিকভাবে ধরে ফেলি। আমার পাকড়াও সম্পর্কে তারা মোটেই টের পায় না।

উপরের আয়াতগুলো হতে প্রমাণিত হলো, আল্লাহ তা'আলার المكر والكيد ষড়যন্ত্র ও কৌশল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রকৃতভাবেই ষড়যন্ত্র ও কৌশল সাব্যস্ত করা হয়েছে। গোপনে কারো কাছে কোনো জিনিস পৌঁছিয়ে দেয়াকে المكر বলা হয়। الكيد এবং المخادعة শব্দদ্বয় ষড়যন্ত্র ও কৌশল অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

ষড়যন্ত্র ও কৌশল দুই প্রকার। একটি হচ্ছে অন্যায় ষড়যন্ত্র। আরেকটি হচ্ছে ভাল ও ন্যায় ষড়যন্ত্র।

যার সাথে ষড়যন্ত্র করা অনুচিত এবং যে ব্যক্তি অসদাচরণের উপযুক্ত নয়, তার সাথে ষড়যন্ত্র করাকে অন্যায় ও অসৎ ষড়যন্ত্র বলা হয়।

আর ষড়যন্ত্রের শাস্তি স্বরূপ যে ব্যক্তি অসদাচরণ পাওয়ার হকদার তার সাথে ষড়যন্ত্র করা ন্যায়সঙ্গত।

প্রথম প্রকার ষড়যন্ত্র হচ্ছে ঘৃণ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার ষড়যন্ত্র হলো প্রশংসাযোগ্য।

আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিশেষ হিকমাতের কারণে যেই প্রকার ষড়যন্ত্র প্রশংসনীয়, শুধু তাই করেন। তিনি যালেম ও পাপিষ্ঠদেরকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারে না।

যালেমরা আল্লাহর বান্দাদের সাথে যেরূপ আচরণ করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা যালেমদেরকে সেভাবে পাকড়াও করেন না; বরং আল্লাহর পাকড়াও হয় ভিন্ন ধরণের এবং অত্যন্ত কঠোর।

যারা অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্র করে, তাদের শাস্তি স্বরূপই কেবল আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের পবিত্র সত্তার জন্য ষড়যন্ত্র, কৌশল এবং ধোঁকা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে তাদের অপকর্মের মোকাবেলায় আল্লাহও তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করেন ও ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শাস্তি দেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ইহা জানা কথা যে, মন্দ, যুলুম এবং অন্যায়ের বিনিময়ে শাস্তি দেয়া সকল মানুষের নিকটেই প্রশংসনীয়। সুতরাং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজের শাস্তি দেয়া কেন প্রশংসনীয় হবে না?

একটি সতর্কতা

ষড়যন্ত্র করা, কৌশল অবলম্বন করা এবং ধোঁকা দেয়া এই বিষয়গুলোর নিসবত (সম্বন্ধ) যখন আল্লাহর দিকে করা হবে, তখন বুঝতে হবে এগুলো আল্লাহ তা'আলার কর্ম বা কর্মগত সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর নামগুলোর তুলনায় তাঁর কর্মের পরিধি অনেক বিশাল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সত্তার জন্য এমনসব أفعال (কর্ম) সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলো থেকে তাঁর নিজের জন্য কোন নাম নির্ণয় করেন নি।

উদাহরণ স্বরূপ **أراد الله** (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) **شاء الله** (আল্লাহ চেয়েছেন), এ দু'টি ক্রিয়ার কথা বলা যেতে পারে। এ দু'টি ক্রিয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম বের করে এভাবে বলা যাবে না যে, المريد (ইচ্ছাকারী) এবং الشائي (ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকারী)। مكر (ষড়যন্ত্র করা), كيد (কৌশল করা) الخداع (ধোঁকা দেয়া) الاستهزاء (ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা) ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা।

এগুলো থেকে আল্লাহর জন্য যথাক্রমে ماكر (ষড়যন্ত্রকারী), كائد (চক্রান্তকারী), مخادع (প্রতারণাকারী) এবং مستهزئ (বিদ্রূপকারী) নাম

নির্ধারণ করা এবং সেগুলো আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

কেননা এ নামগুলো যেই অর্থ বহন করে তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী প্রশংসনীয় এবং অন্য শ্রেণী নিন্দনীয়। এ দুই শ্রেণী হতে কেবল আল্লাহর জন্য প্রশংসনীয়টাই সাব্যস্ত হবে। যেমনটি ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে এবং বিনা পার্থক্যে এ কর্মগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হলে এবং এগুলো থেকে তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য নাম গ্রহণ করা হলে এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কামালিয়াত (পূর্ণতা) সাব্যস্ত হবে না।

وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة

১৫। আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা, রহমত, মর্যাদা ও ক্ষমতা

وقوله تعالى: {إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وقوله: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} وقوله عن إبليس: {فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾

“তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা যদি কারো মন্দ ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাকারী ও ক্ষমতাবান”। (সূরা নিসা ৪:১৪৯) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“তাদের উচিৎ ক্ষমা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াকারী”। (সূরা নূর ২৪: ২২) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

এরা (মুনাফেকরা) বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে মর্যাদাবান লোকেরা অপদস্ত লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না (সূরা মুনাফিকুন ৬৩:৮)। আল্লাহ তা‘আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেনঃ

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

“সে (ইবলীস) বললো, তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই (সূরা সোয়াদ ৩৮:৮২-৮৩)।

ব্যাখ্যা: **إِن تُبْدُوا خَيْرًا** তোমরা যদি প্রকাশ্যে সৎকাজ করে যাও: অর্থাৎ তোমাদের সৎকর্মগুলোকে মানুষের জন্য প্রকাশ করো।

أَوْ تُخْفُوهُ অথবা গোপনে সৎকাজ করে যাও: অর্থাৎ যদি গোপনে সৎকাজ করতে থাকো।

أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ অথবা যদি কারো মন্দ ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো: অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করল কিংবা অন্য কোনভাবে কষ্ট দিল, তা যদি তোমরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে জেনে রাখো,

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা বড়ই ক্ষমা গুণের অধিকারী অথচ তিনি শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন: তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে মাফ করে দেন। অথচ তারা নিজ হাতে যে অন্যায় কাজ করে, তার কারণে তিনি শাস্তি দিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। সুতরাং হে মুসলিমগণ! তোমরাও আল্লাহ তা‘আলার গুণে গুণান্বিত হও। কেননা তিনি শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন। সুতরাং তোমাদেরও তাই করা উচিৎ।

وَلْيَعْفُوا তাদের উচিৎ ক্ষমা করা: অর্থাৎ আয়াতের প্রথম দিকে সম্মান ও ফাযীলাতের অধিকারী যেসব মুমিনের আলোচনা করা হয়েছে, তাদের উচিৎ মানুষের অপরাধ ঢেকে রাখা এবং ক্ষমা করে দেয়া।

وَلْيَصْفَحُوا **তাদের উচিৎ দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা:** সম্মান ও ফাযীলাতের অধিকারীদের উচিৎ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধে লিপ্তদের এড়িয়ে চলা এবং তাদের থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা।[১৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন: أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ **তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন?** তোমরা কি চাওনা যে, তোমাদের ক্ষমার কারণে এবং যারা তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তাদের থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নেয়ার কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসেন?

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং প্রচুর দয়াবান।

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ **সম্মান-মর্যাদা ও শক্তি তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জন্য:** এখানে ঐসব মুনাফেকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা মনে করেছিল মুমিনদের উপর কেবল তাদেরই রয়েছে শক্তি ও সম্মান-মর্যাদা। العزة শব্দের অর্থ শক্তি ও বিজয়। শক্তি ও বিজয় কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তাঁর রসূল ও তাঁর সৎ বান্দাদের মধ্য হতে যাদেরকে দান করেছেন, কেবল তাদের জন্যই। তারা ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন যে, সে বলেছে: فَبِعِزَّتِكَ **তোমার ইজ্জতের কসম:** অর্থাৎ ইবলীস আল্লাহ তা'আলার ইয্যতের শপথ করে বলেছে।

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ **আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই:** সে বনী আদমের সামনে প্রবৃত্তির কাম্য বস্তুগুলোকে সুসজ্জিত করে দিয়ে এবং

১৭. মূলতঃ এখানে এমন দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ গোপন রাখা ও ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, যা গোপন রাখলে ও ক্ষমা করে দিলে তেমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে অপরাধ যদি মারাত্মক হয় এবং যা গোপন রাখলে ও শাস্তি না দিলে সমাজে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে সমাজ থেকে অন্যায় কাজের মূলোৎপাটন করার জন্য তাতে অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (আল্লাহই অধিক জানেন)

তাদের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে গোমরাহ না করে ছাড়বো না। এর ফলে তারা সকলেই গোমরাহ হয়ে যাবে। অতঃপর ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, কাফের ও পাপিষ্ঠদের মধ্য হতে যারা তার অনুসারী তার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র শুধু তাদের মধ্যেই সফল হবে, তখন তার কথার মধ্যে স্বতন্ত্র বক্তব্য প্রয়োগ করল। অর্থাৎ আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে গোমরাহীর আওতামুক্ত করে বললেন: إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ তবে একমাত্র তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে আল্লাহ তা‘আলার জন্য মাফ করা, ক্ষমা করা, রহম করা, ক্ষমতা বিশেষণ রয়েছে। আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য যেভাবে শোভনীয় ঠিক সেভাবেই এই বিশেষণগুলো সাব্যস্ত করতে হবে।

إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه

১৬। আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম সাব্যস্ত করা এবং কেউ তাঁর সদৃশ হওয়া অস্বীকার করা।

وقوله: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} وقوله: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"তোমার রবের নাম বরকত সম্পন্ন, যিনি বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী"। (সূরা আর্ রাহমান ৫৫:৭৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

"কাজেই তুমি তার ইবাদাত করো এবং তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো। তোমার জানা মতে তাঁর সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি? (সূরা মারইয়াম ১৯:৬৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই"। (সূরা ইখলাস ১১২:৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করো না" (সূরা বাকারা ২:২২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার মতই তাদেরকে ভালবাসে। অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকেই ভালোবাসে" (সূরা বাকারা ২:১৬৫)।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন: **تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ** "তোমার রবের নাম বরকত সম্পন্ন। البركة শব্দের আভিধানিক অর্থ বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। আর কারো জন্য বরকতের দু'আ করাকে تبريك বলা হয়। সেই হিসাবে تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ অর্থ হলো, তোমার রবের মর্যাদা মহান ও সমুন্নত হয়েছে। تبارك শব্দটি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না।

যে আয়াতগুলোতে আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যার সাথে ذُو الْجَلَالِ والإكرام এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

فَاعْبُدْهُ কাজেই তুমি তার ইবাদাত করো: অর্থাৎ এককভাবে তাঁর ইবাদাত করো। তাঁর ইবাদতের সাথে অন্য কারো ইবাদাত করো না। العبادة শব্দের আভিধানিক অর্থ নত ও বিনয়ী হওয়া।

আর শারীয়াতের পরিভাষায় العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة অর্থাৎ মানুষের এমন সব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের নাম ইবাদাত, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন।

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ **তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো:** অর্থাৎ তাঁর ইবাদতের উপর সুদৃঢ় থাকো, সবসময় উহা সম্পাদন করতে থাকো এবং এবাদতের পথে যেসব কষ্ট আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করো।

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا **তোমার জানা মতে তাঁর সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি?** এটি হচ্ছে ইস্তেফহামে ইনকারী (অস্বীকার প্রশ্নবোধক প্রশ্নের) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এমন কোন সদৃশ ও সমক্ষক নেই, যে তাঁর এবাদতে শরীক হতে পারে।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد **এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই:** আরবদের ভাষায় সমতুল্য বস্তুকে الكفء বলা হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ, সদৃশ এবং শরীক নেই।

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا **অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করো না:** الند শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুরূপ, সদৃশ ও সমতুল্য। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য এমনসব সমকক্ষ ও সমতুল্য নির্ধারণ করো না, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শরীক করবে এবং ভালবাসা ও সম্মানের ক্ষেত্রে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলার সমান করে ফেলবে।

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ **তোমরা জেনে-বুঝে:** বিশেষ করে যখন তোমরা জানতে পারলে যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং অন্যান্য সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার এমন কোন সমকক্ষ নেই, যে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীক হতে পারে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا **মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে:** এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্বের অনেকগুলো দলীল উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারা ১৬৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির অনবরত আবর্তনে, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, আল্লাহ যা উপর থেকে বর্ষণ করেন, অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করার মধ্যে, পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার মধ্যে, আর বায়ুর প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে বিবেকবানদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে"।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে একত্বের এ নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করার পর সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহর বিরাট শক্তি, মহান ক্ষমতা এবং একাই সকল মাখলুক সৃষ্টি করার এ উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান থাকার পরও মানুষের মধ্যে এমন লোকও দেখা যাচ্ছে, যারা অক্ষম-অপারগ মূর্তিগুলোকে তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করে এবং সেগুলোর ইবাদাত করে।

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ আল্লাহকে ভালবাসার মতই তারা তাদেরকে ভালবাসে: অর্থাৎ ই কাফিররা এ মূর্তিগুলোর ইবাদাত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা এগুলোকে অত্যন্ত ভালবাসে। মূর্তিগুলোর প্রতি ভালবাসায় তারা এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা এগুলোকে আল্লাহর ভালবাসার মতই ভালবাসতে শুরু করেছে। তারা ভালবাসার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সমান করে ফেলেছে। অথচ সৃষ্টি করা, রিযিক দান করা এবং সৃষ্টির কার্যাদি পরিচালনা করার মধ্যে তারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক নির্ধারণ করেনি। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নাম, তাঁর বড়ত্ব ও সম্মান সাব্যস্ত করা হয়েছে। একই সাথে আল্লাহর সমতুল্য, সমকক্ষ এবং শরীক থাকার কথাও অস্বীকার করা হয়েছে। যেসব বিষয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা শোভনীয় নয়, সেগুলো গৌণ এবং সংক্ষিপ্ত আকারে অস্বীকার করার পদ্ধতিই কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে।

نفي الشريك عن الله تعالى

১৭। আল্লাহ্ তা'আলার কোন অংশীদার বা শরীক নেই

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾

"আর বলো, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। তাঁর যথাযথ বড়ত্ব বর্ণনা করো" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১১১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। একচ্ছত্র সাম্রাজ্য তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান" (সূরা তাগাবুন ৬৪:১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

"যিনি (আল্লাহ) তারঁ বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, তিনি বড়ই বরকত সম্পন্ন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হন। তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নি, যার রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই এবং যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন" (সূরা ফুরকান ২৫:১-২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন মাবুদও নেই। আল্লাহর সাথে যদি আর কোন মাবুদ থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র। প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই তিনি জানেন। এরা আল্লাহর জন্য যে শরীক নির্ধারণ করে, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে" (সূরা মুমিনুন ২৩:৯১-৯২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না" (সূরা নাহাল ১৬:৭৪)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾

"তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক কেবল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গুনাহ্, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোন দলীল-প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো না" (সূরা আরাফ ৭:৩৩)।

ব্যাখ্যাঃ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যঃ প্রশংসাকে হামদ বলা হয়। الحمد এর মধ্যে যেই أل রয়েছে উহা ইস্তেগরাকের জন্য। অর্থাৎ এ কথা বুঝনোর জন্য যে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননিঃ অর্থাৎ তাঁর কোন সন্তান নেই। যেমন ধারণা করে থাকে ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের কতিপয় মুশরিক।

وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ তাঁর বাদশাহীতে কোন শরীক নেইঃ অর্থাৎ তাঁর রাজত্বে ও প্রভুত্বে অংশীদার নেই। যেমন ধারণা করে থাকে অগ্নিপূজক এবং তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়। তারা একাধিক মাবুদে বিশ্বাসী।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ তিনি তাঁর বাদশাহী পরিচালনায় এমন অক্ষম নন যে, তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়ঃ অর্থাৎ তিনি এমন দুর্বল নন, যাতে তার কোন সাহায্যকারী কিংবা কোন মন্ত্রী অথবা কোন

পরামর্শদাতার দরকার হয়। সুতরাং তিনি কারো সাথে বন্ধুত্ব রচনা করেন নি এবং কারো সাহায্যও গ্রহণ করেন নি।

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব: যালেমরা যা বলে, তা থেকে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ম ঘোষণা করো।

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে: আল্লাহর আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তারা সকলেই সব দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহর তাসবীহ্ বা পবিত্রতা বর্ণনা করছে।

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁর জন্য: এ দু'টিতে অন্য কারো কোন অংশ নেই। তাঁর বান্দারা পৃথিবীর রাজত্বের যেই অংশ লাভ করে থাকে, তা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেন বলেই লাভ করে থাকে। তা মূলতঃ আল্লাহর রাজত্বেরই অংশবিশেষ।

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান: কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না।

تبارك শব্দটি فعل ماضي (অতীতকালের অর্থবোধক ক্রিয়া)। **এটি** البركة থেকে গৃহীত। কল্যাণের প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, সুদৃঢ় ও স্থায়ী হওয়াকে البركة (বরকত) বলা হয়। تبارك **শব্দটি** শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শুধু অতীত কালের শব্দ দ্বারাই ব্যবহৃত হয়।

الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ তিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন: এখানে কুরআনকে ফুরকান হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

عَلَى عَبْدِهِ বান্দার উপর: এখানে বান্দা বলতে মুহাম্মাদ ﷺ উদ্দেশ্য। আল্লাহর বান্দা হওয়া একটি প্রশংসনীয় বিশেষণ। কেননা আল্লাহ তা'আলা

তাঁর বান্দাকে নিজের দিকে ইযাফত (সম্বধিত) করেছেন। এটি হচ্ছে তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করার সাথে সাথে সম্মান ও মর্যাদার সম্বন্ধ।

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য: তিনি সমস্ত জিন ও মানুষের জন্য। এটি হচ্ছে নাবী ﷺ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

نذيرا শব্দটি الإنذار ক্রিয়ামূল থেকে منذر অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ভয়ের কারণগুলো সম্পর্কে জানিয়ে দেয়াকে إنذار বলা হয়। ليكون (যাতে তিনি হতে পারেন), এ বাক্যটি মুহাম্মাদ ﷺ উপর ফুরকান অবতীর্ণ করার কারণ। অর্থাৎ যাতে করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্বজনীন রিসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করতে পারেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সত্তাকে চারটি গুণের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন।

প্রথম গুণ: **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ তিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক:** তিনি একাই আসমান-যমীনের সকল বিষয়ের মালিক এবং এতদুভোয়ের সবকিছু পরিচালনাকারী।

দ্বিতীয় গুণ: **وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا তিনি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি:** যেমন ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের মুশরেকরা ধারণা করতো। আল্লাহ যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ অমূখাপেক্ষী এবং সমস্ত মাখলুক তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। কারো প্রতি তাঁর প্রয়োজন নেই বলেই তিনি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি।

তৃতীয় গুণ: **وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই:** এতে মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক এবং তাদের অনুরূপ আরো অনেক মুশরেক সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

চতুর্থ গুণ: **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন:** যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোই তিনি সৃষ্টি করেছেন। বান্দাদের কর্মগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বান্দাদের কর্মগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। বান্দারা তা

সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করে। অতঃপর তার জন্য একটি তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য বয়স নির্ধারণ করেছেন এবং তার রিযিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে সৌভাগ্যবান হবে? না হতভাগ্য হবে? তাও তিনি অবগত আছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবেই প্রস্তুত করেছেন।

ইমাম ইবনে কাছীর ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর নিজের সত্তাকে সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁর কোন শরীক নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। অতঃপর তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সব বস্তুই তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর প্রতিপালনাধীন। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর প্রভু, সবকিছুর মালিক এবং সকলের মাবুদ। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর ক্ষমতাধীন, তাঁরই পরিচালনাধীন, তাঁরই বশীভূত এবং তাঁরই তাকদীরের অধীনস্ত।

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন মাবুদও নেই:

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে সন্তান থেকে পবিত্র করেছেন। তাঁর রাজত্বে, পরিচলানায় এবং তাঁর এবাদতে কোন শরীক হওয়াকেও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহর সন্তান থাকার ধারণাকে এবং শরীক নির্ধারণ করার বিষয়কে জোরালোভাবে অস্বীকার করার জন্য উপরোক্ত আয়াতের দুই জায়গায় من হরফে জার ব্যবহার করা হয়েছে।

إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ আল্লাহর সাথে যদি অন্য কোন মাবুদ থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো:

আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে আল্লাহর কোন সন্তান নেই এবং তাঁর ইবাদতে কোন শরীক নেই। এটি হচ্ছে তার পক্ষে একটি বিরাট দলীল। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, একাধিক মাবুদ রয়েছে, তাহলে প্রত্যেক

মাবুদই নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো এবং দলাদলি ও ভাগাভাগির কারণে সৃষ্টিজগতের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট হয়ে যেতো। বাস্তবে আমরা দেখছি যে, সৃষ্টিজগত পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথেই রয়েছে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবেই চলছে। তাতে একাধিক মাবুদ দেখা যায়নি এবং মাবুদদের দলাদলিও সৃষ্টি হয়নি।

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো: অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যদি আরেকজন মাবুদ থাকতো, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই অন্যের বিরোধীতা করতো। ফলে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতই একজন অন্যজনের উপর জয়লাভ করতো। ফলে যে পরাজিত এবং দুর্বল প্রমাণিত হতো, সে ইলাহ (মাবুদ) হওয়ার যোগ্যতা হারাতো। সুতরাং যখন সমপর্যায়ের একাধিক মাবুদ থাকার বিষয়টি বাতিল সাব্যস্ত হলো, তখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, মাবুদ মাত্র এক। তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পাক-পবিত্র:** অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য যেই শরীক ও সন্তান নির্ধারণ করে থাকে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই তিনি জানেন: অর্থাৎ যেসব বিষয় বান্দাদের অদৃশ্য এবং বান্দারা যা জানে না, কেবল তিনিই তা জানেন। বান্দারা যা দেখে ও জানে, তিনি তাও জানেন। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্যরা যদিও তাদের সামনে দৃশ্যমান বস্তুগুলো সম্পর্কে জানতে পারে, কিন্তু তারা গায়েবের খবর জানে না। সুতরাং এরা আল্লাহর জন্য যে শরীক নির্ধারণ করে, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না: আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর জন্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করতে নিষেধ করেছেন। এক অবস্থাকে অন্য অবস্থার সাথে তুলনা করার নাম ضرب المثل তথা উপমা পেশ করা। আরবের মুশরেকেরা বলতো, আমরা শুধু এক

আল্লাহর ইবাদাত করবো, এর প্রতি আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহর এবং আমাদের মাঝে মাধ্যম স্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই তারা বহু সংখ্যক মূর্তি এবং অন্যান্য বস্তুকে আল্লাহ এবং তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানাতো। আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সাথে তুলনা করেই তারা এই কাজ করতো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আল্লাহর সদৃশ কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহর জন্য উপমা পেশ করা চলে না এবং তাঁর সাথে কোন সৃষ্টির তুলনাও চলে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে ভাল করেই জানেন যে, তাঁর অনুরূপ সত্তা আর কেউ নেই।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যা জানেন, তোমরা তা জানো না। সুতরাং তোমাদের এই কাজ তথা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত এবং উপমা পেশ করা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং বাতিল কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সেই সাথে মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে তুলনা করা এবং সেগুলোর ইবাদাত করার ভয়াবহ ও মন্দ পরিণাম সম্পর্কেও তোমরা অবগত নও।

قُلْ তুমি বলে দাও: এখানে নাবী ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং নাবী ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে মুবাল্লিগ (দাঈ ও প্রচারক)। **إِنَّمَا** এটি সীমিত কারক অব্যয়।

حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ "আমার প্রতিপালক অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন: অর্থাৎ অশ্লীল বিষয়সমূহকে হারাম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

الفواحش শব্দটি فاحشة-এর বহুবচন। যেই পাপাচার অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তাকে ফাহেশা বলা হয়।

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য: অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে যেই অপরাধ করা হয় এবং যা গোপনে করা হয় এই উভয় প্রকার গুনাহ্কেই আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

والإثم (পাপাচার) প্রত্যেক এমন অপরাধকে إثم বলা হয়, যাতে গুনাহ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: শুধু মদ পান করাকে إثم বলা হয়।

وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায় বাড়াবাড়ি: অর্থাৎ সীমাহীন যুলুম করা এবং মানুষের উপর অত্যাচার করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা: অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে তোমরা কোন শরীক সাব্যস্ত করো না।

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا যার কোন প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি: আয়াতের এ অংশ থেকেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله দলীল গ্রহণ করেছেন।

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُون আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো না:

আল্লাহর ব্যাপারে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলা। যেমন আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করা কিংবা অনুরূপ এমন বিষয়ে কথা বলা, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। অনুরূপ আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ হতে অনেক বস্তুকে হালাল করে এবং বহু জিনিসকে হারাম করে আল্লাহর দিকে সম্বধিত করতো এবং বলতো আল্লাহ এগুলো হালাল করেছেন কিংবা এগুলোকে তিনি হারাম করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা হতে প্রমাণ মিলে যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার শরীক হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং একমাত্র তাঁর জন্যই পরিপূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সন্তান ও সদৃশ থাকার দাবী খন্ডন করা হয়েছে। সমস্ত মাখলুকই এ জাতীয় দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অনুরূপ উপরোক্ত আয়াতগুলো শির্ক করাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে। মূর্খতা ও কল্পনার উপর ভিত্তি করেই শির্কের সূচনা হয়েছে। আল্লাহু তা'আলার কোন সদৃশ ও সমকক্ষ নেই। (আল্লাহই অধিক জানেন)

إثبات استواء الله على عرشه

১৮। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত সাব্যস্ত করা:

وقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} في سبعة مواضع: في سورة الأعراف قوله: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة يونس ــ عليه السلام ــ: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة الرعد: {اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة طه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وقال في سورة الفرقان: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ} وقال في سورة الم السجدة: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة الحديد: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}.

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত (সূরা ত্বহা ২০:৫)।

এ কথা কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয়

দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইউনূসের ৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা রা'দের ২ নং আয়াতে বলেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে। তোমরা এটা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা তোহার ৫নং আয়াতে বলেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতে বলেন:

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ ﴾

“অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন তিনি পরম দয়াময়”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা সাজদার ৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“আল্লাহই আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾

“আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন।

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর কিতাবের সাতটি স্থানে আল্লাহ তা‘আলা সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি আরশের উপরে সমুন্নত। প্রত্যেক স্থানেই মাত্র একটি শব্দ তথা استواء (সমুন্নত হওয়া) দ্বারা আরশের উপর সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে استوى على العرش “তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”। ইস্তিওয়া শব্দটি এখানে আসল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। ইস্তিওয়া (সমুন্নত হওয়া) আল্লাহ তা‘আলার একটি কর্মগত সিফাত। এটি তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সুসাব্যস্ত। অন্যান্য সিফাতের মতই আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এ সুউচ্চ সিফাতটি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। আরবদের ভাষায় চারটি শব্দের মাধ্যমে ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা: علا وارتفع وصعد واستقر এ চারটি শব্দের প্রথম তিনটির অর্থ উপরে উঠলেন এবং সমুন্নত হলেন। চতুর্থ শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্থির হলেন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত استواء শব্দের অর্থে সালাফদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তি এ চারটি অর্থের উপরেই। আসলে ঘুরেফিরে অর্থ একটিই। তা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপরে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ “নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অর্থাৎ তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর নেয়ামতরাজি দ্বারা প্রতিপালনকারী। সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তোমরা এককভাবে তাঁরই ইবাদাত করবে।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন: তিনি সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, আসমান-যমীনসমূহের সৃষ্টিকারী এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানে যা আছে, তার সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ তিনি ছয়দিনে এগুলো সৃষ্টি করেছেন: এ দিনগুলো হচ্ছে

রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার। শুক্রবার দিন সকল সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। এতেই আল্লাহ আদম ﷺ কে সৃষ্টি করেছেন।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ **অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন:** অর্থাৎ যেভাবে আরশের উপর সমুন্নত হওয়া তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়, তিনি আরশের উপর সেভাবেই সমুন্নত হয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের এ অংশ থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে বাদশার সিংহাসনকে আরশ বলা হয়। তবে এখানে সবগুলো দলীল দ্বারা সেই সিংহাসন উদ্দেশ্য, যার রয়েছে একাধিক খুঁটি এবং যাকে আল্লাহর ফেরেশতাগণ বহন করে আছেন। সেটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপর তাঁবু বা গম্বুজ স্বরূপ। এক কথায় আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিজগতের ছাদ।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ **আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে:** অর্থাৎ যমীনের অনেক উপরে আসমানকে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যে, তাকে স্পর্শ করা এবং সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়।

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا **তিনি আসমানকে বিনা খুঁটিতে উপরে স্থাপন করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ:** খুঁটি ও স্তম্ভকে عمد বলা হয়। عَمَد শব্দটি عماد -এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এমন কোন খুঁটি ও স্তম্ভের উপর দাঁড় করান নি যে, উহা সেই খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে আসমানসমূহকে খুঁটি ছাড়াই সুউচ্চে স্থাপন করেছেন। আকাশের খুঁটি নেই, এই কথাকে শক্তিশালী করার জন্য عمد এর পর ترونها (তোমরা দেখতে পাচ্ছ) বাক্যটি আনয়ন করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, আসমানের খুঁটি আছে। কিন্তু আমরা তা দেখি না। তবে প্রথম কথাটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন: তৃতীয় আয়াতের এ অংশ থেকেই আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার দলীল নেয়া হয়েছে। বাকী আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও কথা একই। আয়াতগুলোর যেখানে ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ রয়েছে, সেখান থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

সবগুলো আয়াত থেকে যা সাব্যস্ত হচ্ছে, তা হলো আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য যেভাবে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া শোভনীয়, আল্লাহর জন্য সেভাবেই আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করতে হবে। এ আয়াতগুলোতে ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা ইস্তিওয়াকে الاستيلاء (দখল করা, অধিকারী হওয়া) ও القهر (পরাজিত করা) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহর আরশকে ব্যাখ্যা করে আল্লাহ রাজত্বের মাধ্যমে। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে استولى على الملك وقهر غيره "তিনি তাঁর রাজত্বের অধিকারী হলেন এবং অন্যদেরকে পরাজিত করলেন"। একাধিক কারণে এ ব্যাখ্যা বাতিল।

প্রথম: এটি একটি বিদ'আতী ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা সাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের অনুসারী সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট বিরোধী। জাহমীয়া ও মুতাযেলারাই সর্বপ্রথম ইস্তিওয়ার এই ব্যাখ্যা করেছে। সুতরাাং এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত।

দ্বিতীয়: استوى على العرش এর ব্যাখ্যা যদি استولى على الملك হতো, তাহলে আরশ এবং নিম্নজগতের সাত যমীন, যমীনে বিচরণকারী জীব-জন্তু এবং সমস্ত মাখলুকের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকতো না। কেননা তিনি সমস্ত মাখলুকের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী এবং তিনি সবকিছুর মালিক। সুতরাং استوى এর দ্বারা ইস্তিওলা উদ্দেশ্য করা হলে আরশের উল্লেখ করা নিরর্থক হতো। আল্লাহর কালামে নিরর্থক কিছু নেই।

তৃতীয়: আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করার জন্য কুরআন সুন্নাহয় শুধু استوى على العرش (আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন) এ বাক্যটিই উল্লেখিত হয়েছে। একবারও استولى على العرش (আরশের অধিকার গ্রহণ করলেন) বাক্যটি আসেনি। একবারও যদি তা আসত, তাহলে অন্য আয়াতগুলোতে উল্লেখিত استوى শব্দকে استولى এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেত।[১৮]

চতুর্থ: উপরোক্ত আয়াতগুলোর যেখানেই আসমান-যমীন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, তার পর সবখানেই ثم আনয়ন করে বলা হয়েছে: ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (অতঃপর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন), যা বিলম্বের সাথে ধারাবাহিকতার অর্থ প্রদান করে।استواء على العرش দ্বারা যদি استيلاء على العرش والقدرة عليه (আরশের অধিকারী হওয়া এবং উহার উপর ক্ষমতা লাভ করা) উদ্দেশ্য হতো, তাহলে خلق السموات والأرض বলার পর ثم استوى على العرش বলতেন না।

কেননা আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহর আরশ বিদ্যমান ছিল। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে (২৬৫৩) বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিভাবে এটি বলা বৈধ হতে পারে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা আরশের অধিকারী ছিলেন না এবং এর উপর তিনি ক্ষমতাবানও ছিলেন না? এই ধরণের কথা সম্পূর্ণ বাতিল।

---

১৮ .আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর মালিক একমাত্র তিনিই। অনন্তকাল থেকেই সকল বস্তুর উপর তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর মালিকানা বহাল থাকবে। আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ পূর্বে অমুক বস্তুর মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হয়ে গেছেন। এ ধরণের অর্থ গ্রহণ করা হলে, আল্লাহ যে মহান ক্ষমতাবান তাতে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে তুলনা হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)

إثبات علو الله على مخلوقاته

১৯। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের উপর সমুন্নত:

وقوله: {يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} {بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا} {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ}

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

"হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু (নিদ্রা) দান করবো। অতঃপর তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো" (সূরা আল-ইমরান ৩:৫৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

"বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও প্রজ্ঞাবান" (সূরা নিসা ৪:১৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

"পবিত্র বাক্যসমূহ তাঁরই দিকেই উঠে এবং সৎকর্মকে তিনি উন্নীত করেন"। (সূরা ফাতির ৩৫:১০) আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের উক্তি উল্লেখ করে বলেন:

﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴾

"হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারাত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার ইলাহকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়। এভাবে ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সোজা পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে"। (সূরা গাফের ৪০:৩৬-৩৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

"তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? (সূরা মুলক ৬৭:১৬-১৭)।

ব্যাখ্যাঃ يَا عِيسَى হে ঈসা! আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারইয়াম عليه السلام কে সম্বোধন করে বলেছেন।

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ "আমি তোমাকে ওফাত দিবো"। অধিকাংশ আলেমের মতে এখানে ওফাত বলতে নিদ্রা উদ্দেশ্য। কেননা নিদ্রা মৃত্যুর অন্যতম প্রকার। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ৬০ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾

“তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা যুমারের ৪২ নং আয়াতে বলেন:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾

“মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন। আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবয করেন”।

وَرَافِعُكَ إِلَيَّ **তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো:** অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে আসমানে নিজের দিকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়েছেন। আয়াতের এ অংশ থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহর জন্য علو তথা উপরে হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা উঠিয়ে নেওয়া সাধারণতঃ উপরের দিকেই হয়।

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ **বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।** এখানে ঐসব ইহুদীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা দাবী করে যে, তারা ঈসা মাসীহ ইবনে মারইয়ামকে عليه السلام হত্যা করে ফেলেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

“মূলতঃ তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করতে পারেনি; বরং তাদেরকে সন্দেহে ফেলা হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল তারাই সে বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন (সূরা নিসা ৪:১৫৭-১৫৮)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে জীবিত আবস্থায় নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি নিহত হননি। আয়াতের এ অংশই দলীল গ্রহণের স্থান। কেননা এ অংশে আল্লাহর জন্য মাখলুকের উপর হওয়া সাব্যস্ত করা

হয়েছে। আর উঠিয়ে নেওয়া বা উঠানো (নীচ থেকে) উপরের দিকেই হয়।

إِلَيْهِ يَصْعَدُ তাঁর দিকেই উঠে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকেই পবিত্র বাক্যসমূহ উন্নীত হয়; অন্য কারো দিকে নয়।

الْكَلِمُ الطَّيِّبُ পবিত্র বাক্যসমূহ: অর্থাৎ আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং দু'আ উদ্দেশ্য।

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ সৎ আমল উহাকে উপরে উঠায়: অর্থাৎ উত্তম আমল বাক্যসমূহকে উপরে উঠায়। কেননা সৎ আমল ছাড়া পবিত্র বাক্য কবুল হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, কিন্তু ফরয ইবাদাতগুলো সম্পাদন করে না, তার পবিত্র বাক্যসমূহ ফেরত দেয়া হয়।

ইয়াস বিন মুআবিয়া رضي الله عنه বলেন, আমলে সালেহ না থাকলে শুধু উত্তম বাক্য আকাশে উঠে না। হাসান বসরী ও কাতাদাহ رحمهما الله বলেন, আমল ছাড়া শুধু মুখের কথা কবুল হয় না।

মোটকথা উপরের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির উপরে। কেননা উঠা বা উঠানো নীচ থেকে উপরের দিকেই হয়।

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমরাত নির্মাণ করো: ফেরাউন তাঁর মন্ত্রী হামানকে এ কথা বলেছিল। ফেরাউন তাকে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার আদেশ করেছিল। সে বলেছিল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ও মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করো।

لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি অর্থাৎ আসমানের দরজাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি।

فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ মূসা عليه السلام এর ইলাহকে উকি দিয়ে দেখতে পারি।

فَأَطَّلِعَ ফেলে মুযারেটি **فاء السببية** এর পরে আসার কারণে উহ্য أن দ্বারা মানসুব হবে। এ কথার মাধ্যমে সে মুসা عليه السلام কে মিথ্যুক বলেছিল। অর্থাৎ

ফেরাউনের কথার অর্থ হলো, মূসা যখন দাবী করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন অথবা তিনি যখন এই দাবী করলেন যে, আকাশে তার মাবুদ রয়েছেন, তখন ফেরাউন তাঁর কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا এবং বলেছিল আমি মূসা ﷺ কে মিথাবাদী বলেই মনে করি অর্থাৎ সে যেই রেসালাতের দাবী করছে অথবা আকাশে তার ইলাহ (মাবুদ) থাকার যেই দাবী করছে, আমি তার দাবীতে তাকে মিথ্যুক মনে করছি।

এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সৃষ্টির উপর। মুসা ﷺ ফেরাউনকে এই সংবাদই দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আসমানের উপর। ফেরাউন তাঁকে এই কথায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিল। এখান থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, পূর্বের নাবীগণও তাদের উম্মাতদেরকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে।

أَأَمِنتُمْ তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো? আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন, তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো? নিরাপত্তা হচ্ছে ভয়ের বিপরীত।

من في السماء যিনি আসমানে আছেন। অর্থাৎ যিনি আসমানে আছেন, তোমরা কি তাঁর শাস্তি হতে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছো? আসমানে যিনি আছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।

এখানে **في السماء** আসমানে আছেন অর্থ **على السماء** আসমানের উপরে আছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন:

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

"আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডের মধ্যে শুলিবিদ্ধ করবো"।

এখানেও في হারফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডের উপর ক্রুশবিদ্ধ করবো।

উপরোক্ত আয়াতে في হারফে জারটি তখনই على (উপরে) অর্থে ব্যবহৃত হবে, যখন আসমান দ্বারা আল্লাহর নির্মিত আসমান উদ্দেশ্য হবে। আর যদি السماء দ্বারা শুধু উপর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে في হারফে জারটি ظرفية তথা স্থান বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হবে। তখন বাক্যটি এ রকম হবে, أأمنتم من في العلو অর্থাৎ যিনি উপরে আছেন, তোমরা কি তার শাস্তির ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছো?

أن يخسف بكم الأرض তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন। যেমন ধসিয়ে দিয়েছিলেন কারুনকে।

فإذا هي تمور তখন যমীন অকস্মাৎ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে এবং প্রকম্পিত হতে থাকবে।

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন এ ব্যাপরেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? যেমন আল্লাহ তা‘আলা লুত عليه السلام এর জাতি এবং হস্তী বাহিনীর উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তোমাদের উপর মেঘমালা পাঠাবেন। যাতে থাকবে পাথর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাতাস পাঠাবেন। যাতে থাকবে পাথর।

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? অর্থাৎ যখন তোমরা আযাব দেখতে পাবে, তখন জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? কিন্তু তখন এই জানা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না।

উপরের দুই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার জন্য সৃষ্টির علو (উপরে হওয়া) সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমানের উপরে। সুতরাং শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله এই আয়াতগুলো আল্লাহ তা‘আলার জন্য উলু (উপর) সাব্যস্ত করার

জন্য উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতগুলো আল্লাহর পবিত্র সত্তা উপরে হওয়ার কথা প্রমাণ করে, যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত অধ্যায়ের আয়াতগুলো সাব্যস্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর।

استواء (আরশের উপর সমুন্নত হওয়া) এবং علو (উপরে হওয়া) এর মধ্যে পার্থক্য:

(১) علو তথা সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর সত্তাগত বিশেষণ। অর্থাৎ এটি কখনো আল্লাহর সত্তা থেকে আলাদা হয় না এবং এটি তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়। অপর দিকে استواء (উপরে উঠা, সমুন্নত হওয়া) আল্লাহর কর্মগত সিফাত, যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর স্থায়ী বিশেষণ। আর আরশের উপর আল্লাহ সমুন্নত হওয়া হচ্ছে তাঁর কর্মগত বিশেষণ। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তখন স্বীয় ইচ্ছা ও ক্ষমতার মাধ্যমে উপরে উঠেন বা বা আরশের উপর সমুন্নত হন। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা সমুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন ثُمَّ استوى "অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন"। আর এই সমুন্নত হওয়া ছিল আসমান-যমীন সৃষ্টির পর।

(২) সৃষ্টির উপর হওয়া এমন একটি বিশেষণ, যা মানুষের বোধশক্তি, স্বভাব-প্রকৃতি ও কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি শুধু কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত; যা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও বোধশক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয়।

إثبات معية الله لخلقه

২০। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের সাথে আছেন।

وقوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} وقوله: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} {وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

"তিনিই আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন" (সূরা হাদীদ ৫৭:৪)। আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন এবং পাঁচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন। তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই, তারা যা করে তিনি কিয়ামাতের দিন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত" (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

"তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষন্ন হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন (সূরা তাওবা ৯:৪০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

"আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি" (সূরা তোহা ২০:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা মুত্তাকী হয়েছে এবং যারা সৎকর্ম করে" (সূরা নাহল ১৬:১২৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"তোমরা সবরের পথ অবলম্বন করো, অবশ্যই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন" (সূরা আনফাল ৮:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

“আল্লাহর হুকুমে কতক ক্ষুদ্র দল অনেক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন” (সূরা বাকারা ২:২৪৯)।

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতের هوالذي থেকে শুরু করে وما يعرج فيها পর্যন্ত ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ **তিনি তোমাদের সাথেই, তোমরা যেখানেই থাক না কেন:** অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছেন, তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তোমরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম দেখছেন। তোমরা স্থলভাগে থাকাবস্থায় যা করো, জলভাগে থাকাকালে যা করো, রাতের অন্ধকারে যা করে থাকো, দিবাভাগে যা করো, গৃহাভ্যন্তরে যা করো এবং নির্জন মরুভূমিতে যা করো, তার সবই তিনি অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানে সবকিছুই সমান। অর্থাৎ তিনি সকল সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে সমানভাবে অবগত আছেন। সবকিছুই তাঁর শ্রবণ ও দৃষ্টির অধীনে। তিনি তোমাদের কথা শ্রবণ করছেন এবং তোমাদের অবস্থান দেখছেন। আয়াতের এ স্থান থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ **তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন:** তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে দৃষ্টি রাখেন। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ **তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না:** পরামর্শ বলতে গোপন পরামর্শ উদ্দেশ্য। মোটকথা তিনজনের কোন পরামর্শ হয় না।

إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ **যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন এবং পাঁচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন:** অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে এভাবে চারে পরিণত করে দেন এবং পাঁচজনের গোপন পরামর্শকে এভাবে ছয়জনের পরামর্শে পরিণত করেন যে, তিনি তাদের সেই গোপন

পরামর্শে অংশ গ্রহণ করেন এবং তা জেনে ফেলেন। তিন এবং পাঁচ সংখ্যাদ্বয়কে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করার কারণ হলো অধিকাংশ গোপন পরামর্শকারীর সংখ্যা তিন অথবা পাঁচজন হয়ে থাকে। অথবা আয়াতটি তিনজনের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং পাঁচজনের অন্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে।

অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা কমবেশী প্রত্যেক সংখ্যার সাথে আছেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ "তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, তিনি তাদের সাথেই আছেন"। অর্থাৎ উল্লেখিত সংখ্যার কম হোক, যেমন একজন বা দুইজন এবং উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে বেশী হোক, যেমন ছয়জন বা সাতজন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই আছেন। তারা গোপনে যেই পরামর্শ করে, আল্লাহ তা'আলা তা অবগত হন। ফলে সেই গোপন পরামর্শের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

তাফসীরকারগণ বলেন, ইহুদী এবং মুনাফেকরা গোপনে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতো। তারা এর মাধ্যমে মুমিনদের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিত যে, তারা এমন বিষয়ে পরামর্শ করছে, মুমিনদের জন্য কষ্টদায়ক। এতে করে মুমিনরা চিন্তায় পড়ে যেত। এ বিষয়টি দীর্ঘ দিন চলতে থাকলে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারা রসূল ﷺ কাছে অভিযোগ করল। তখন তিনি ইহুদী ও মুনাফেকদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন মুসলিমদের বাদ দিয়ে গোপন বৈঠকে মিলিত না হয়। কিন্তু এতে তারা বিরত থাকল না বরং তারা বারবার গোপন পরামর্শ করতেই থাকল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করলেন।

أَيْنَ مَا كَانُوا তারা যেখানেই থাকে না কেন: এর অর্থ হচ্ছে যে স্থানেই তাদের গোপন পরামর্শ হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলমের মাধ্যমে তা পরিবেষ্টন করে নেন।

ثُمَّ يُنَبِّئُهُم অতঃপর তিনি সংবাদ দিবেন।

بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামাতের দিন তাদের আমল সম্পর্কে: তাদেরকে সে অনুযায়ী বদলা দিবেন। এর মাধ্যমে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে এবং ধমক দেয়া হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নয়।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে আছেন। এটি হচ্ছে সাধারণ বা সার্বজনীন সাথে থাকা। এ অর্থে তিনি সকল সৃষ্টির সাথেই রয়েছেন। এ প্রকার সাথে থাকার অত্যাবশ্যকীয় দাবী হচ্ছে, তিনি ক্ষমতার মাধ্যমে এবং ইলমের মাধ্যমে সবকিছুকে ঘিরে আছেন। তিনি সকলের সব অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত আছেন। এ জন্যই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ﵀ বলেছেন, এ আয়াতটি আল্লাহর ইলমের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং ইলমের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا বিষন্ন হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন: হিজরতের পথে নাবী ﷺ এবং আবু বকর ؓ যখন গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সাথী আবু বকর ؓ কে এই কথা বলেছিলেন। মক্কার মুশরিকরা তাদের নিকটে চলে এসেছিল। আবু বকর ؓ তখন নাবী ﷺ উপর কাফেরদের কষ্টের ভয় করছিলেন। তিনি তখন আবু বকর ؓ কে বলেছিলেন, তুমি বিষন্ন হয়ো না। অর্থাৎ তুমি দুঃশ্চিন্তা পরিহার করো।

إن الله معنا আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে রয়েছেন: অর্থাৎ তাঁর সাহায্য, সমর্থন ও শক্তি আমাদের সাথে রয়েছে। সুতরাং যার সাথে আল্লাহ রয়েছেন, সে কখনো পরাজিত হবে না। আর যাকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না, তার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

উপরের আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ সান্নিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এহেন সাথে থাকার দাবী হচ্ছে মুমিনদেরকে সাহায্য, হেফাজত ও শক্তিশালী করা।

আল্লাহ তা'আলা মুসা ﷺ ও হারুন ﷺ কে বলেছেন:

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ **আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি:** সুতরাং ফেরাউনকে ভয় করো না। ভয় করতে নিষেধ করার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: **إنني معكما** "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি"। অর্থাৎ তোমাদের উভয়কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে সাহায্য করার মাধ্যমে আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের উভয়ের এবং ফেরাউনের কথা শুনছি। তোমাদের উভয়ের অবস্থান এবং ফেরাউনের অবস্থান দেখছি। তোমাদের কারো কোন অবস্থা আমার কাছে গোপন নয়।

এ আয়াত থেকেও দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহর অলীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ সান্নিধ্য রয়েছে। এটি হচ্ছে সাহায্য, সমর্থন ও শক্তিশালী করার সান্নিধ্য। সেই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا **নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন:** অর্থাৎ যারা হারাম ও সকল প্রকার গুনাহর কাজ ছেড়ে দেয় এবং ইখলাসের সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে রয়েছেন।

وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ **যারা সৎকর্ম করে (সূরা নাহল ১৬:১২৮):** অর্থাৎ যারা আনুগত্যের কাজগুলো সঠিকভাবে আদায় করে এবং আল্লাহর আদেশগুলো পালন করে, সহযোগিতা ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের সান্নিধ্যেই আছেন। এটি হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার সান্নিধ্য। আয়াতে কারীমা থেকে গ্রন্থকার এটিই সাব্যস্ত করেছেন।

وَاصْبِرُوا **তোমরা সবরের পথ অবলম্বন করো:** আল্লাহ তা'আলা এখানে সবরের আদেশ দিয়েছেন। সবরের আসল অর্থ হচ্ছে নফসকে আটকিয়ে রাখা। তবে এখানে সবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফের ও মুসলিমদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধকালে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ অবশ্যই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন: অতঃপর সবরের এ আদেশ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদের সাথে আছেন। সুতরাং যেসব কাজে সবর করা দরকার, আল্লাহ তা'আলা ঐসব কাজে সবরকারীদের সাথে আছেন।

এ আয়াতে কারীমা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এখানে ঐ সকল সবরকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সান্নিধ্য রয়েছে, যারা আনুগত্যের কাজে সবর করে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

ইমাম শাওকানী ﷺ বলেন, কতই না সুন্দর এ সান্নিধ্য! যাকে এটি দান করা হয়েছে, কোন শক্তি বা ব্যক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। কোন দিক থেকেই তার উপর চড়াও হওয়া যাবে না। যদিও শত্রু বাহিনী হয় অগণিত।

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর হুকুমে কতক ক্ষুদ্র দল অনেক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে: অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালা অনুযায়ী অনেক ছোট দল অনেক বড় দলকে পরাজিত করেছে।

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন: এ অংশ থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সময় সবর করে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি হচ্ছে বিশেষ সান্নিধ্য। যার দাবী হচ্ছে সাহায্য ও শক্তিশালী করা।

উপরের সবগুলো আয়াতের অভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাতে আল্লাহর সান্নিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ সান্নিধ্য দুই প্রকার।

প্রথম: সাধারণ ও ব্যাপক সান্নিধ্য। যেমন বলা হয়েছে প্রথম দুই আয়াতে। এই প্রকার সান্নিধ্যের তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতার মাধ্যমে সকল সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন। সমস্ত মানুষের ভাল-মন্দ সব আমল

সম্পর্কেই তিনি অবগত আছেন এবং তাদেরকে আমল অনুযায়ী বিনিময়ও দিবেন।

দ্বিতীয়: আল্লাহর মুমিন বান্দাদের জন্য রয়েছে এক বিশেষ সান্নিধ্য। এই প্রকার সান্নিধ্যের দাবী হচ্ছে মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করা, শত্রুর মোকাবেলায় তাদেরকে শক্তিশালী করা এবং তাদেরকে হেফাযত করা। সম্মানিত লেখক এই অধ্যায়ে যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্য হতে শেষের পাঁচটি আয়াতে এই প্রকার সান্নিধ্যের কথাই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সান্নিধ্যে থাকা সৃষ্টির উপরে থাকা এবং আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সান্নিধ্যে থাকা এক মাখলুক অন্য মাখলুকের সাথে থাকার মত নয়। কেননা,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ "তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

কেননা সান্নিধ্য সাধারণত কাছে থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। পরস্পর স্পর্শ করা কিংবা পরস্পর সমান হওয়া জরুরী নয়। আরবরা বলে থাকে, (مازلنا نمشى والقمر معنا) আমরা চলছিলাম। চলন্ত অবস্থায় চন্দ্র আমাদের সাথেই ছিল। অথচ চন্দ্র তাদের মাথার অনেক উপরে এবং তাদের মাঝে এবং চন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব অনেক। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে হওয়া এবং তাদের সান্নিধ্যে হওয়ার পরিপন্থী নয়। সামনে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

إثبات الكلام لله تعالى

২১। আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলার বিশেষণ) সাব্যস্ত করণ

وقوله: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ} {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} {مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ} {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} {وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} {وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ} {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ} {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾

“আর আল্লাহর কথার চেয়ে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে? (সূরা নিসা ৪: ৮৭)। আল্লাহ তা‘আলা সূরা নিসার ১২২ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

"আর আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে?" আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদার ১১৬ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! "। আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১১৫ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ﴾

"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ, তাঁর কালেমাসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই, "। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১৬৪ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

"আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়"। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ﴾

" তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ১৪৩ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾

"অতঃপর মূসা ﷺ যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তাঁর সাথে কথা বললেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা মারইয়ামের ৫২ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾

"আমি তাকে তাঁর ডান দিকের তূর পাহাড়ের দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম"। আল্লাহ তা'আলা সূরা শুআরার ১০ নং আয়াতে বলেন:

﴿ وَإِذْنَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

"যখন তোমার রব মূসা ﷺ কে ডেকে বলেছিলেন: যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও"। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ২২ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾

"তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, "আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি " আল্লাহ তা'আলা সূরা কাসাসের ৬৫ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾

স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?" আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾

"আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও"। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ৭৫ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"অথচ তাদের একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো। অতঃপর তা খুব ভালো করে জেনেবুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে

তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করতো"। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতাহ্ এর ১৫ নং আয়াতে বলেন:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ﴾

"এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাও, তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ্ তো আগেই এ কথা বলে দিয়েছেন"। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾

"হে নাবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাও। তাঁর কালেমা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই"। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নামালের ৭৬ নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

"যথার্থই এই কুরআন বনী ইসরাইলের জন্য বেশির ভাগ এমনসব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে, যেগুলোতে তারা মতভেদ করে"।

ব্যাখ্যা: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ **আর আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?** অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই। আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তা হচ্ছে ইস্তেফহামে ইনকারী তথা অস্বীকারের প্রশ্ন। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কেউ থাকাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে।

حديثا কথায়: অর্থাৎ কথায়, সংবাদ প্রদানে, আদেশ করায়, ওয়াদা-অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই।

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا **আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে?** القيل হচ্ছে قال يقول এর মাসদার। এটি القول এর অনুরূপ। এই আয়াতাংশের অর্থও পূর্বের আয়াতের মতই। আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কারো কথা নেই এবং আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদীও আর কেউ নেই।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য قيل ও حديث অর্থাৎ কথা বলা বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এতে আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম (কথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ **আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা:** অর্থাৎ স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন,হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈসা عليه السلام কে এই কথা বলবেন। যেসব নাসারা ঈসা এবং তাঁর মাতা মারইয়ামের ইবাদাত করছে, এই কথার মাধ্যমে তাদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। এটি পূর্বের আয়াতদ্বয়ের মতই। এখানেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কথা বলা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا **"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ:** এখানে কালেমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কালাম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সংবাদের ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং হুকুম-আহকামে ইনসাফকারী। صدقا এবং عدلا এই শব্দ দু'টি তামীয হিসাবে মানসুব হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا **আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়:** এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসা عليه السلام কে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মুসার সাথে কথা বলেছেন এবং সেই কথা মুসাকে শুনিয়েছেন। এ জন্যই মুসা عليه السلام কে কালীমুল্লাহ বলা হয়।

মুসার সাথে আল্লাহর কালাম (কথা বলা) থেকে রূপকার্থের সম্ভাবনা দূর করার জন্য تكليما মাসদারকে তাগিদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি মুসা عليه السلام এর সাথে কথা বলেছেন।

مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ **তাদের কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন:** অর্থাৎ রসূলদের কারো কারো সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। বিনা মধ্যস্থতায় সরাসরি কথা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মূসা এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে কথা বলেছেন। এমনি আদম عليه السلام এর সাথেও কথা বলেছেন। সহীহ ইবনে হিব্বানে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতে আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কতক রসূলের সাথে অতীতে কথা বলেছেন।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا **অতঃপর মূসা عليه السلام যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসার আগমণের জন্য যেই সময় নির্ধারণ করলেন, মূসা عليه السلام ঠিক সেই নির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হলো।

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ **এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিনা মধ্যস্থতায় মুসা عليه السلام কে তাঁর কথা বললেন। সুতরাং এ আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি বিনা মধ্যস্থতায় মূসার সাথে কথা বলেছেন।

وَنَادَيْنَاهُ **আমি তাকে ডাকলাম:** আল্লাহ তা'আলা মূসা عليه السلام কে ডাক দিয়েছেন। উঁচু আওয়াজে ডাক দেয়াকে النداء বলা হয়।

مِن جَانِبِ الطُّورِ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তূর পাহাড়ের দিক থেকে ডাক দিয়েছেন। মাদায়েন শহর এবং মিশরের মাঝখানের একটি পাহাড়ের নাম তুর।

الْأَيْمَنِ ডান দিক: মূসা ﷤ যখন আগুন দেখে তা থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে গেলেন তখন মূসার ডান দিক থেকে ডাক দেয়া হল। এখানে পাহাড়ের ডান দিক উদ্দেশ্য নয়। কেননা পাহাড়ের কোন ডান-বাম হয় না।

وَقَرَّبْنَاهُ তাকে নৈকট্য দান করলাম: আর আমি মুসা ﷤ এর সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্য তাঁকে নৈকট্য দান করলাম।

نَجِيًّا শব্দটি مناجيا অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ চুপিসারে কথার বলার জন্য মূসা ﷤ কে আমার নৈকট্য দান করলাম। মুনাজাত মুনাদার (উঁচু আওয়াজে আহবানের) বিপরীত।

এই আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উঁচু আওয়াজে ডাক দেন, আহবান করেন এবং চুপিসারেও কথা বলেন। ডাক দেয়া এবং মুনাজাত করা (নীচু আওয়াজে কথা বলা) কালামের (কথা বলার) দু'টি প্রকার। ডাক দেয়া সাধারণত উঁচু আওয়াজে হয় আর মুনাজাত নীচু আওয়াজের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও: অর্থাৎ তাদেরকে পাঠ করে শুনাও সেই ঘটনা অথবা স্মরণ করো সেই সময়ের ঘটনা, যখন তোমার রব মুসা ﷤ কে ডেকে বলেছিলেন। আহবান করাকে النداء বলা হয়। **أَنِ ائْتِ এখানে** أن অব্যয়টি أن مفسرة এবং أن مصدرية **উভয়ই হতে পারে।**

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اذهب إلى তুমি **যালেম সম্প্রদায়ের** কাছে যাও: ফেরাউন সম্প্রদায়কে যালেম বলার কারণ এই যে, তারা কুফুরীর যুলুম এবং পাপাচারের যুলুমকে নিজেদের মধ্যে একত্র করেছিল। কুফুরীর মাধ্যমে তারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছিল এবং পাপাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে তারা অন্যদের উপর যুলুম করেছিল। যেমন তারা বনী

ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছিল এবং তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করেছিল।

এই আয়াতে কারীমাতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম (কথা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার সাথে ইচ্ছা কথা বলেন এবং তাকে স্বীয় কথা শুনিয়ে দেন।

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ **তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি:** আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়া عليهما السلام কে এই বলে ডাক দিলেন যে, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি? অর্থাৎ ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করিনি? এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের দুইজনকে ধমক দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে যেই বস্তু হতে সাবধান করা হয়েছিল, তা থেকে তারা বিরত থাকে নি।

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার জন্য ডাক এসেছিল।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ **আর তারা যেন ভুলে না যায় সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন: তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন এই মুশরেকদেরকে ডাক দিবেন এবং বলবেন, তোমরা রসূলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে? যেসব নাবীকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তারা যখন তোমাদের কাছে আমার রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো তাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে?

এই আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন মানুষকে ডাক দিবেন।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ **আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে** অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যেসব মুশরেকের সাথে

তোমাকে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের কেউ যদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার জন্য তোমার কাছে আসতে চায়, তোমার নিরাপত্তা কামনা করে এবং আশ্রয় চায়, তুমি তাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করো।

حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّه যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অর্থাৎ তোমার জবানীতে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং তুমি যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো, তার প্রকৃত অবস্থাও বোধগম্য হয়।

এই আয়াত থেকেও আল্লাহ তা'আলার কালাম (কথা বলা বিশেষণ) রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ আমরা যা তেলাওয়াত করি, তা আল্লাহর কালাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে একটি দল ছিল: এটি হচ্ছে ইহুদীদের দল। **فريق** শব্দটি **اسم جمع**। এই শব্দের কোন একবচন নেই।

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّه তারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো। এখানে কালাম দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। ইহুদীরা তাওরাতের আয়াত শ্রবণ করতো।

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ অতঃপর তারা উহার মধ্যে বিকৃতি সাধন করতো। অর্থাৎ তারা আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা করতো।

مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ তারা তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করতো: অর্থাৎ ভাল করে জেনে-বুঝে তারা তাওরাতের বিপরীত আমল করতো।

وَهُمْ يَعْلَمُونَ তারা ভাল করেই জানতো যে, তারা যেই তাহরীফ বা পরিবর্তন করছে এবং যেই অপব্যাখ্যা করছে, তাতে তারা অপরাধী।

এই আয়াতে কারীমা থেকেও আল্লাহর কালাম আছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাওরাতও আল্লাহর কালামের অন্তর্ভূক্ত। আর ইহুদীরা তাওরাতের মধ্যে তাহরীফ করেছে, উহার মধ্যে পরিবর্তন ও রদবদল করেছে।

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাও: তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে দিয়েছেন।

يُرِيدُونَ এরা: এখানে পিছনে থেকে যাওয়া ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোক উদ্দেশ্য, যারা রসূল ﷺ এর সাথে জিহাদে বের না হয়ে পরিবার-পরিজন ও নিজেদের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। হুদায়বিয়ার বছরও তারা রসূল ﷺ এর সাথে বের না হয়ে নিজেদের গৃহেই বসেছিল।

أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সেই কথাকে পরিবর্তন করতে চায়, যার মাধ্যমে তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, খায়বারের গণীমত কেবল তারাই পাবে।

قُل لَّن تَتَّبِعُونَا বলো, তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, এই বাক্যটি না বাচক হলেও তা নিষেধাজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لاتتبعونا অর্থাৎ আমাদের সাথে তোমরা বের হয়ো না।

كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ আল্লাহ তো আগেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আগেই ওয়াদা করেছিলেন যে, পরের বছর খায়বারের যুদ্ধে যেই গণীমত হাসিল হবে, তা কেবল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই।

উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর জন্য কালাম ও কাওল তথা কথা বলা বিশেষণ সুসাব্যস্ত।[১৯] আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা

---

১৯. কুরআন আল্লাহর কালাম; ইহা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত নয়। কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। উপরে উল্লেখিত দলীলগুলো সে কথারই প্রমাণ করে। সাহাবী, তাবেঈ, সালাফে সালেহীন এবং সম্মানিত ইমামগণের মতও তাই। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে কুরআন আল্লাহর কালাম।

কথা বলেন। আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করা জায়েয নেই। আল্লাহর কালামের উপর আমল করা আবশ্যক এবং তার অনুসরণ করা জরুরী।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ হে নাবী! যা কিছু তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাওঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর উপর অহী স্বরূপ যেই কিতাব নাযিল করেছেন, তা সর্বদা তেলাওয়াত করার আদেশ করেছেন। দ্রুত এবং অতি সংগোপনে জানিয়ে দেয়াকে অহী বলা হয়।[২০] উসূলে তাফসীরের কিতাবগুলোতে অহীর বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

مِن كِتَابِ رَبِّكَ তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকেঃ এই বাক্যটি ঐ বিষয়ের বর্ণনা স্বরূপ, যা তাঁর নিকট অহী করা হয়েছে।

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ তাঁর কালেমা (কথা) পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেইঃ অর্থাৎ তাঁর কথার কোন পরিবর্তনকারী, বিকৃতকারী এবং অপসারণকারী নেই। মোট কথা এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালেমা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ এই কুরআন বনী ইসরাইলের বেশির ভাগ স্বরূপ বর্ণনা করেঃ তাওরাত ও ইঞ্জিলের অধিকারীদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। তারা হচ্ছে ইহুদী ও নাসারা।

أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ বেশির ভাগ যেগুলোতে তারা মতভেদ করেঃ তারা ঈসার ব্যাপারে মতভেদ করেছে। ইহুদীরা ঈসা عليه السلام কে অবৈধ সন্তান বলে অপবাদ দিয়েছে। আর খৃষ্টানরা তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। কুরআন তাঁর বিষয়ে মধ্যম পন্থা নিয়ে এসেছে। সত্য কথা হলো তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর কালেমা, যা তিনি মারইয়াম عليها السلام পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর একটি রূহ। অর্থাৎ আল্লাহর ঐ সমস্ত রূহের অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

---

২০. আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্য যে দ্বীন ও শারীয়াত পাঠিয়েছেন, তাকে শারীয়াতের পরিভাষায় অহী বলা হয়।

এই আয়াতে কারীমা থেকেও প্রমাণ মিলে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। কুরআনের মধ্যে পূর্বের সমস্ত কিতাবের খবর রয়েছে এবং আহলে কিতাবদের ফির্কাসমূহের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কুরআন ইনসাফের সাথে সেসব বিষয়ের ফয়সালাকারী। আর এ সব বিষয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসা অসম্ভব।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله যে আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ যেহেতু প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলা বিশেষণে বিশেষিত, তাই তারা আল্লাহর জন্য উহা সাব্যস্ত করে। কালাম (কথা বলা) আল্লাহ তা'আলার সিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি এর দ্বারা বিশেষিত এবং তাঁর সাথে উহা কায়েম রয়েছে। আরেক দিক থেকে কালাম সিফাতে ফেলিয়া বা কর্মগত সিফাতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ তা আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরত অনুযায়ী সংঘটিত হয়। তিনি যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা এবং যে বিষয়ে ইচ্ছা কথা বলেন। তাঁর কালাম আগেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর। তিনি কামেল তথা সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ। আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাতে কামালিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে কালাম (কথা বলা) বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং রসূল ﷺ এর পবিত্র সুন্নাতে তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করেছেন। এই বিষয়ে বিরোধীদের মাযহাব এবং তার জবাব অচিরেই আসবে ইনশা-আল্লাহ।

تنزيل القرأن من الله تعالى

২২। কুরআন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে

وقوله: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ}

আল্লাহ তা‘আলা সূরা আন‘আমের ৯২ ও ১৫৫ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾

“আর এটি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা হাশরের ২১ নং আয়াতে বলেন:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾

“আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে”। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾

“যখন আমি একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াত দ্বারা বদল করি, আর আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন তিনি কি নাযিল করবেন- তখন এরা বলে, তুমি নিজেই এ কুরআনের রচনাকারী। আসলে এদের অধিকাংশই জানে না। এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস সত্য সহকারে তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করেছে, যাতে মুমিনদের সুদৃঢ় করা যায়। আর এটি মুসলিমদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ। আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়। অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে পরিষ্কার আরবী ভাষা”। (সূরা নাহাল ১৬:১০১-১০৩)

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ যখন আল্লাহ তা‘আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করার দলীলগুলো উল্লেখ করলেন এবং এই কথা সাব্যস্ত করলেন যে, কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা‘আলার কালাম, তখন ঐসব দলীল বর্ণনা শুরু করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।

وَهَٰذَا এটিঃ এখানে কুরআনুল কারীমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে ইসমে ইশারা মুবতাদা। তার খবর হচ্ছে **كتاب**।

أنزلناه আমি অবতীর্ণ করেছি এবং **مبارك** (বরকত সম্পন্ন) এই দু’টি **كتاب** এর সিফাত। এখানে অবতীর্ণ করা সিফাতকে **مبارك** এর আগে উল্লেখ করার কারণ হলো কাফেররা মুহাম্মাদ ﷺ উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করতো। প্রচুর বরকত ওয়ালা বস্তুকে **مبارك** বলা হয়। কুরআনকে বরকত ওয়ালা বলার কারণ হলো তাতে রয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রচুর বরকত ও কল্যাণ।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ “আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছেঃ

এখানে কুরআনের ফাযীলাত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন শুনে এবং কুরআন তিলাওয়াতের সময় অন্তর ভীত হওয়া আবশ্যক। কেননা কুরআন যদি পাহাড়ের উপর নাযিল করা হতো, তাহলে পাহাড় এত কঠিন ও মজবুত হওয়া সত্ত্বেও কুরআন বুঝার পর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হতো এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ফেটে যেত। সুতরাং হে মানব! এটি কিভাবে সম্ভব যে, কুরআন শুনে তোমাদের অন্তর নরম হয় না এবং তা ভীতও হয় না? অথচ তোমরা আল্লাহর আদেশ বুঝতে সক্ষম হয়েছ এবং তাঁর কিতাব অনুধাবন করেছ।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ **যখন আমি একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াত দ্বারা বদল করি:** এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে একটি কুফুরী শুবহার (সন্দেহের) বর্ণনা শুরু করেছেন এবং তার জবাব দিয়েছেন। বদল করার অর্থ হলো কোন জিনিসকে নিজ স্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে তার স্থলে অন্য জিনিস স্থাপন করা। আয়াতকে বদল করার তাৎপর্য হচ্ছে তা উঠিয়ে নিয়ে তার স্থলে অন্য একটি আয়াত রাখা। এর নাম হচ্ছে এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াত মানসুখ বা রহিত করা।

قالوا **এরা বলে:** অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের কাফেররা মানসুখ করার হিকমাত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে বলে, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তুমি মিথ্যা রচনাকারী। আল্লাহর উপর জবান লম্বা করছো। তোমার ধারণা এই যে, আল্লাহ তোমাকে একটি বিষয়ে আদেশ করেছেন। পুনরায় ধারণা করো যে, আল্লাহ তোমাকে প্রথম আদেশের বিপরীত অন্য এক আদেশ দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার এমন জবাব দিয়েছেন, যাতে তাদের অজ্ঞতার প্রমাণ মিলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ **আসলে এদের অধিকাংশই জানে না:** অর্থাৎ মূলতঃ তারা কোন জ্ঞানই রাখে না এবং নসখ বা রহিত হওয়ার হিকমাত সম্পর্কেও তারা অবগত নয়। কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করার মধ্যে কী পরিমাণ উপকারিতা রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে

না। কখনো একটি বিষয় শারীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ একটি স্বার্থ থাকে। অতঃপর সেই সময় পার হওয়ার পর তার বদলে অন্য একটি বিষয় শারীয়াতভূক্ত করার মধ্যেই উপকার লক্ষ্য করা যায়। এই কাফেরদের বিবেক-বুদ্ধির উপর থেকে যদি পর্দা উঠে যেত, তাহলে তারা বুঝতে সক্ষম হতো যে, মানসুখ করাই সঠিক, ইনসাফপূর্ণ এবং সহজ-সরল।

অতঃপর তারা যে ধারণা করেছিল, এই পরিবর্তন মুহাম্মাদ ﷺ এর নিজের পক্ষ হতে এবং এর মাধ্যমে সে মিথ্যা রচনা করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধারণার প্রতিবাদ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো যে, এই কুরআন নাযিল করেছেন রূহুল কুদুস তথা জিবরীল এর মাধ্যমে। কুদুস অর্থ পবিত্র। আসল অর্থ হচ্ছে الروح المطهر (পবিত্র আত্মা) এটি নাযিল করেছে। روح القدس এখানে মাওসুফকে (রূহকে) সিফাতের (কুদুসের) দিকে ইযাফত সম্বোধন করা হয়েছে।

مِن رَّبِّكَ **তোমার রবের পক্ষ হতে** অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। بِالْحَقِّ **সত্য সহকারে:** এটি হাল হিসাবে নসবের স্থানে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে متصفا بكونه حقا সত্য অবস্থায় এই কুরআন নাযিল হয়েছে।

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا **যাতে মুমিনদের সুদৃঢ় করা যায়:** অর্থাৎ যাতে মুমিনদেরকে ঈমানের উপর মজবুত রাখা যায় সেই জন্য তোমার উপর জিবরীলের মাধ্যমে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। নাসেখ মানসুখও আল্লাহর পক্ষ হতেই এসেছে। যাতে মুমিনগণ বলতে পারে যে, নাসেখ এবং মানসুখের প্রত্যেকটিই আমাদের রব আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। বিশেষ করে যখন তারা জানতে পারবে যে, নসখ (রহিত) করার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে, তখন তারা ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকবে।

وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ আর এটি মুসলিমদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ: এখানে **هدى** এবং **بشرى** শব্দ দু'টি **ليثبت** এর অবস্থানের উপর আতফ (স্থাপন) করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে: **تثبيتا لهم وهداية وبشرى**। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সন্দেহগুলো থেকে আরেকটি সন্দেহ বর্ণনা করেছেন এবং জবাব দিয়েছেন।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়: অর্থাৎ আমি অবশ্যই জানি যে, এই কাফেররা বলে, একজন মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ কে কুরআন শিক্ষা দেয়। আসমানের কোন ফেরেশতা তাঁর নিকট কুরআন নিয়ে আসে না। যেই মানুষটি তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়, সে এর আগে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অনারবদের কিতাবাদি পাঠ করেছে। কারণ মুহাম্মাদ একজন অশিক্ষিত মানুষ। কুরআনে অতীতের যেসব খবর উল্লেখ করা হচ্ছে, মুহাম্মাদ ﷺ দ্বারা তা রচনা করা সম্ভব নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার জবাব এইভাবে দিয়েছেন যে, لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়: অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ﷺ! যেই ব্যক্তি তোমাকে কুরআন শিক্ষা দেয় বলে তারা ধারণা করছে, তার ভাষা আরবী নয়। সে আরবী বলতে পারে না। আর এই কুরআন তো পরিষ্কার আরবী ভাষায়। অর্থাৎ এই কুরআন অলঙ্কারপূর্ণ আরবী ভাষায় এবং এর বর্ণনা সুস্পষ্ট। সুতরাং তোমরা কিভাবে ধারণা করছ যে, একজন অনারব লোক মুহাম্মাদ ﷺ কে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে? অথচ তোমরা কুরআনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়েছ, অক্ষম হয়েছ কুরআনের মত কয়েকটি বা একটি সূরা আনয়ন করতে। তোমরা আরবী ভাষার লোক, সুস্পষ্ট আরবী বলায় পারদর্শী এবং অলঙ্কারপূর্ণ বক্তব্য প্রদানকারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হওয়ার পরও তোমরা কুরআনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়েছ।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর শিক্ষাঃ উপরোক্ত আয়াতে কারীমাগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন আল্লাহরই কালাম। ফেরেশতা বা কোন মানুষের কালাম নয়। যারা বলে কুরআন আল্লাহর কালাম নয়; সৃষ্টির কালাম, এখানে তাদের কথারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহর জন্য মাখলুকের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা নাযিল কেবল উপর থেকেই হয়।

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

২৩। কিয়ামাতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে স্বচক্ষে দেখবে

وقوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} {عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ} {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} {لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} وهذا الباب في كتاب الله كثير. ومن تدبر القرآن طلبًا للهدى تبين له طريق الحق.

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۞إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

“সে দিন অনেক মুখ-মন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে” (সূরা কিয়ামাহ ৭৫: ২২-২৩)। আল্লাহ তা‘আলা সূরা মুতাফফিফীনের ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ﴾

“উঁচু আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইউনুসের ২৬ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

“যারা উত্তম আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো বেশী”। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ক্বাফ এর ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَاوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

সেখানে তারা যা চাইবে তাই তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله বলেন, আল্লাহর কিতাবে

এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে, তার জন্য সত্যের পথ পরিস্কার হবে।

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন মুমিনদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। **ناضرة** শব্দটি **النضارة** থেকে যোয়াদ বর্ণ দিয়ে পড়তে হবে। এর অর্থ হচ্ছে উজ্জ্বল ও সুন্দর হওয়া অর্থাৎ আলোকোজ্জল, তরতাজা, সুন্দর এবং জ্যোতির্ময় হওয়া। সেদিন তারা তাদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা তাদের চোখ দ্বারাই তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ সম্পর্কে রসূল ﷺ হতে মুতাওয়াতির সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেঈ এবং উম্মতের সালাফগণের ইজমা হয়েছে এবং ইসলামের ইমামগণ তাতে একমত হয়েছেন।

আয়াতে কারীমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবেন।

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ উঁচু আসনে বসে তারা দেখতে থাকবেন: الأرائك শব্দটি **أريكة** এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে সিংহাসন বা খাঁট। মুমিনগণ সিংহাসনে বসে তাদের রব আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে দেখবে। আর কাফেরদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে যেমন এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, তারা **عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ** নিশ্চয়ই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হবে।

এ আয়াত থেকেও কিয়ামাতের দিন মুমিনদের জন্য তাদের মহান রবকে দেখার বিষয়টি প্রমাণিত হলো।

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ "যারা উত্তম আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো বেশী: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব আমল ওয়াজিব করেছেন, উহা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং যেসব পাপাচার থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন, যারা তা বর্জন করার মাধ্যমে কল্যাণের পথ অবলম্বন করবে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ তথা উত্তম বিনিময়। এর

ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, উহা হচ্ছে জান্নাত। وزيادة (আরো বেশী) এর তাফসীরে সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে সহীহ সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে যিয়াদাহ বা বেশী বলতে আল্লাহর মহান চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা। এই উম্মতের সালাফে সালেহীনগণও এই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই উপরের আলোচনা হতে প্রমাণ মিলছে যে, মুমিনদের জন্য কিয়ামাতের দিন তাদের রবকে দেখার সুযোগ রয়েছে।

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا সেখানে তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে:

জান্নাতে মুমিনদের মন যা চাইবে, তাদের জন্য তাই রয়েছে সেখানে। তাদের চোখ বিভিন্ন প্রকার নেয়ামাত এবং অপরিমীত কল্যাণ পেয়ে শীতল হবে।

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে:
অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার নেয়ামাত ও কল্যাণের অতিরিক্ত যা থাকবে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা।

আয়াতে কারীমার এই অংশ থেকেই প্রমাণ নেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত চেহারার দিকে মুমিনদের তাকানো প্রমাণিত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে যা শিক্ষণীয়:

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে কিয়ামাতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিদার প্রমাণিত হলো। আর এটিই হবে মুমিনদের জন্য জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার বিষয়ে এটিই হচ্ছে সাহাবী, তাবেঈ এবং মুসলিমদের সম্মানিত ইমামগণের কথা। শিয়াদের রাফেযী সম্প্রদায়, জাহমীয়া এবং মুতাযেলারা এই মাসআলায় খেলাফ করেছে। তারা আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের বিরোধীতা করেছে। উপরোক্ত বাতিল ফির্কার লোকেরা আল্লাহর দিদার অস্বীকার করার পক্ষে কতিপয় দুর্বল সন্দেহ এবং ভ্রান্ত দলীল পেশ করেছে। তার

মধ্যে

(১) আল্লাহকে দেখা যাবে এই কথা সাব্যস্ত করলে আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোন একটি দিকে রয়েছেন। আর তিনি যদি কোন দিকে থাকেন, তাহলে তার জন্য জিসিম (দেহ, কায়া, আকৃতি, শরীর ইত্যাদি) সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা জিসিম বা দেহ ও শরীর থেকে পবিত্র।

এই সন্দেহের জবাব এই যে, দিক শব্দটির মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে আছেন, তাহলে এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল। অসংখ্য দলীল এই কথাকে বাতিল প্রমাণিত করেছে। আল্লাহকে দেখা যাবে বা তাকে দেখা সম্ভব এটা সাব্যস্ত করলে, আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত হয়ে যায় না। আর যদি দিক দ্বারা উপরের দিক উদ্দেশ্য হয় তথা এটি উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার জন্য উপরের দিক সুসাব্যস্ত। এটি অস্বীকার করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলার দিদার অর্জিত হওয়ার সাথে তিনি উপরের দিকে হওয়া সাংঘর্ষিক নয়।

(২) মুতাযেলা এবং আল্লাহর দিদারে অবিশ্বাসী অন্যান্য সম্প্রদায় দলীল হিসাবে আল্লাহর বাণী: لَن تَرَانِي "তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না"- এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। তাদের দলীল গ্রহণের জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে দুনিয়াতে আল্লাহর দিদার নাকোচ করা হয়েছে। আখেরাতের দিদার নাকোচ করা হয়নি। যেমন অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে আখেরাতে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়েছে। আখেরাতে মানুষের অবস্থা দুনিয়ার অবস্থার চেয়ে ভিন্ন হবে।[২১]

---

২১. দুনিয়াতে মানুষের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে দুনিয়ায় তৈরী করা হয়নি। পাহাড়ের গঠন মানুষ গঠনের চেয়ে অধিক মজবুত ও শক্ত হওয়ার পরও যেহেতু পাহাড় আল্লাহর নূরের সামনে টিকে থাকতে পারেনি এবং আল্লাহ তা'আলা যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাই বুঝা গেল যে মানুষ চর্ম চক্ষু দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

(৩) তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারাও দলীল গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

"দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। (সূরা আনআম ৬:১০৩)

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে ইদরাক তথা আল্লাহকে আয়ত্ত করার নাফী এসেছে। আল্লাহর দিদার নফী করা হয়নি। إدراك অর্থ হচ্ছে আয়ত্ত ও বেষ্টন করা।

মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে; কিন্তু তাঁকে আয়ত্ত করতে পারবে না। বরং মানুষের দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারবে না, এই কথা থেকেও আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এই আয়াতটি আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করার অন্যতম দলীল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জানেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন, আল্লাহর কিতাবে এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহর জন্য নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার বিষয়ে অনেক আলোচনা এসেছে। গ্রন্থকার এখানে তা থেকে সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর নাম এবং তাঁর সিফাতের বর্ণনা এসেছে। এগুলো আল্লাহর জন্য ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করতে হবে, যেভাবে সাব্যস্ত করলে আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় হয়।

যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে অর্থাৎ তাতে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং কুরআন যেই হেদায়াতের প্রমাণ বহন করে, তার উপর দৃষ্টি দিবে, তার জন্য সত্যের পথ উন্মুক্ত হবে। সত্যের রাস্তা তার জন্য পরিস্কার হবে। কুরআন নিয়ে গবেষণা করাই হচ্ছে উহা পাঠ করার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল

করেছি, যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়"। (সূরা সোয়াদ ৩৮:২৯) আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মাদের ২৪ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের হৃদয়ের উপর তালা লাগানো আছে?" আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনুনের ৬৮ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

"তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি? না কি সে এমন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে আসেনি?

الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة

আল্লাহ তা‘আলার জন্য সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলীর উপর সুন্নাতের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেনঃ

ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ

অতঃপর এই সিফাতগুলোর মধ্যে উহাও অন্তর্ভুক্ত, যার বিবরণ রসূলﷺ এর পবিত্র সুন্নাতে রয়েছে। কেননা সুন্নাত কুরআনকে ব্যাখ্যা করে, কুরআনে যা সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে সুন্নাত উহাকে বর্ণনা করে, কুরআন যেদিকে আহবান করে সুন্নাতও সেদিকেই আহবান করে এবং কুরআন যা বর্ণনা করে, সুন্নাতও তাই বর্ণনা করে।

ব্যাখ্যাঃ শাইখের এই উক্তিটিকে পূর্বের বাক্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। পূর্বের বাক্যটি হচ্ছে,

وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ .... الخ الْإِخْلَاصِ

অর্থাৎ নাফী ও ইছবাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার মধ্যে সূরা ইখলাসে বর্ণিত তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী অন্যতম।

তেমনি রসূল ﷺ তাঁর প্রভুকে যে সব গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন এবং যেসব সিফাত সহীহ সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে, হাঁ ও না বোধক বক্তব্যের মাধ্যমে ঐসব গুণাবলীও আল্লাহ তা‘আলার জন্য সুসাব্যস্ত।

কেননা সুন্নাত হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতি এবং আল্লাহর কিতাবের পর যেই মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করা দরকার, তা হচ্ছে রসূল ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

"তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাক, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ এবং রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও (সূরা নিসা ৪:৫৯)।

আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কুরআনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং রসূল ﷺ এর ওয়াফাতের পর তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া।

السنة সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ **الطريقة** রাস্তা, পথ।[২২]

আর ইসলামের পরিভাষায়:

هي ما ورد عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من قول أو فعل أو تقرير

রসূল ﷺ থেকে যেই কথা, কাজ এবং সমর্থন বর্ণিত হয়েছে তাকে সুন্নাত বলা হয়।

---

২২. চাই সেই রাস্তা সঠিক হোক কিংবা বাতিল হোক। চাই সেই রাস্তা حسي (বাহ্যিক) হোক যেমন মানুষের চলার রাস্তা ও পথ অথবা معنوى (নৈতিক) হোক। যেমন হেদায়াত, আলো ও সত্যের পথ কিংবা গোমরাহীর পথ হোক।

فصل: مكانة السنة

অধ্যায়: সুন্নাতের অবস্থান

সুন্নাহ দ্বারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করণে দলিল গ্রহণ।

فالسنة تفسر القرآن সুন্নাত কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে: কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর প্রতি যা নাযিল করেছেন, তিনি তা মানুষের জন্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে লোকদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারো এবং যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে" (সূরা নাহাল ১৬:৪৪)।

এমনি সুন্নাত **تبين القرآن** অর্থাৎ কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করে। যেমন সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত এবং অধিকাংশ হুকুম-আহকাম কুরআনে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। আর সুন্নাতে নাববী তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে।

সেই সাথে আরো জানার বিষয় যে, **تدل على القرآن وتعبر عنه** অর্থাৎ কুরআন যেই দিকে আহবান করে, সুন্নাতও সেই দিকেই আহবান করে এবং কুরআন যা বর্ণনা করে, সুন্নাতও তাই বর্ণনা করে। তাই সুন্নাত সকল ক্ষেত্রেই কুরআনের সমর্থক।

সুতরাং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা যা সাব্যস্ত তার হুকুম একই। আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কুরআন দ্বারা যেমন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত হয়েছে, তেমনি সুন্নাত দ্বারাও তা সাব্যস্ত হয়েছে।

রসূল ﷺ সহীহ হাদীসসমূহে তাঁর প্রভুকে যে সুউচ্চ গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব-আবশ্যক

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেনঃ

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ

রসূল ﷺ সহীহ হাদীসসমূহে তাঁর প্রভুকে যেই সুউচ্চ গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন এবং হাদীস সম্পর্কে পারদর্শী আলিমগণ যেসব হাদীস কবুল করে নিয়েছেন, সেই হাদীসগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী রয়েছে তা বিশ্বাস করা আবশ্যক।

ব্যাখ্যাঃ **وما وصف به** থেকে শুরু করে **بالقبول** পর্যন্ত সবগুলো শব্দ মিলে মুবতাদা হয়েছে। আর **وجب الإيمان بها كذالك** হচ্ছে তার খবর। অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন জরুরী, তেমনি রসূল ﷺ সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা রসূল ﷺ সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾

"এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। তা অহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (সূরা নাজম ৫৩:৩-৪)

সুতরাং রসূল ﷺ সুন্নাতও আল্লাহর পক্ষ হতে অহী স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

"আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন, এমনসব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বেশী" (সূরা নিসা ৪:১১৩)।

এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনুল কারীম। আর হিকমাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুন্নাত। সুতরাং সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। বিশেষ করে আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَاآتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো"। (সূরা হাশর ৫৯:৭)

সুতরাং হাদীস গ্রহণ করার শর্ত হচ্ছে, তা রসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হওয়া চাই। এই জন্যই ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله বলেছেন: **من الأحاديث الصحاح** **হাদীস সহীহ হতে হবে। الصحاح** শব্দটি **صحيح** এর বহুবচন।

পরিভাষায় **والحديث الصحيح** সহীহ ঐ হাদীসকে বলা হয়:

هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة

যা বর্ণনা করেছেন পূর্ণ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী তাঁর অনুরূপ আরেকজন বর্ণনাকারী থেকে। আর যা **شاذ** (বিরল) ও **معلول** (ত্রুটিযুক্ত) নয়।

কাজেই হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে।

(১) বর্ণনাকারীদের আদালত তথা ন্যায় পরায়ণতা (عدالة الرواه),

(২) তাদেরে স্মরণ শক্তি (ضبطهم),

(৩) হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হওয়া (اتصال السند),

(৪) হাদীসের সনদ সকল ইল্লত তথা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া (سلامته من العلة) এবং

(৫) হাদীসটি শায (অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত) না হওয়া (سلامته من الشذوذ)।[২৩]

تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ হাদীস সম্পর্কে পারদর্শী আলিমগণ যেসব হাদীস কবুল করে নিয়েছেন অর্থাৎ যেই হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন এবং যার উপর আমল করেছেন, তাকে সহীহ্ হাদীস বলে।

মুহাদ্দিসগণ ব্যতীত অন্যদের কথা হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সুন্নাতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার অনেক সিফাতের উদাহরণ পেশ করেছেন।

---

২৩ কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর এমন বর্ণনাকে শায বলা হয়, যা তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য অথবা অধিক সংখ্যক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত। এ ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনাটিই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর আমল করা হবে।

ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله

১। আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে দুনিয়ার আসমানে তাঁর নেমে আসা সুসাব্যস্ত করণ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

من ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم يَنْزِل رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه متفق عليه

"হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রসূলﷺ এর বাণীঃ আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন দু'আকারী আছে কি? আমি তার দু'আ কবুল করবো। কোন সাহায্য প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে দান করবো। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করবো"।[২৪]

ব্যাখ্যাঃ يترل ربنا **আমাদের রব নেমে আসেনঃ** যেভাবে নেমে আসা আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভা পায়, তিনি সেভাবেই নেমে আসেন। আমরা তাতে বিশ্বাস করি। আল্লাহর নেমে আসাকে সৃষ্টির নেমে আসার সাথে তুলনা করি না। সূরা শুরার **১১** নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই।"।

---

২৪. সহীহঃ সহীহ বুখারী ১১৪৫ ও সহীহ মুসলিম ৭৫৮, ইবনে মাজাহ ১৩৬৬, আবূ দাউদ ১৩১৫, তিরমিযী ৩৪৯৮।

إلى سماء الدنيا **দুনিয়ার আসমানে:** এখানে মাউসুফকে সিফাতের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম ছিল, **السماء الدنيا** অর্থাৎ দুনিয়ার নিকটতম আসমান।

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন: **ثلث** শব্দের বিশেষণ হিসাবে **الآخِرُ** শব্দের শেষ বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নুযুলে ইলাহী তথা দুনিয়ার আসমানে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসার সময় নির্ধারিত রয়েছে।

فَأَسْتَجِيبَ لَهُ আমি তার দু'আ কবুল করবো: প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাব হিসাবে **فأستجيب** ফেলে মুযারেটি মানসুব হয়েছে। এমনি **فأعطيه** এবং **فأغفر له** ফেল দু'টিও একই কারণে মানসুব হয়েছে। **فاستجيب له** অর্থ হচ্ছে, আমি তার দু'আ কবুল করবো বা তার ডাকে সাড়া দেবো।

হাদীস থেকে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসার দলীল পাওয়া যায়। নামা বা অবতরণ করা আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের অন্যতম। একই সাথে হাদীস দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকা সাব্যস্ত হলো। কেননা নেমে আসা উপর থেকেই হয়। হাদীসে ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর নেমে আসাকে তাঁর রহমত বা আদেশ আগমন করার দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ আসল হচ্ছে শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা এবং প্রকৃত অর্থ বাদ না দেয়া।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: **من يدعوني فأستجيب له** কে আমার কাছে দু'আ করবে, আমি তার দু'আ কবুল করি। এখান থেকে কি এই কথা বুঝা যায়, আল্লাহর রহমত বা তাঁর আদেশ এইভাবে শেষ রাতে ডাকাডাকি করে এবং কথা বলে? এই হাদীস থেকে আল্লাহর কালামও সাব্যস্ত হয়। কেননা এতে রয়েছে فيقول الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন। এখানে দান করা, দু'আ কবুল করা এবং ক্ষমা করা সিফাতও

আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার সিফাতে ফেলীয়ার অন্তর্ভূক্ত। যেই হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন, উহাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে।

إثبات أن الله يفرح ويضحك

২। এ কথা সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা খুশী হন ও হাসেন।

وقوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ: (لله أشد فرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته) الحديث. متفق عليه. وقوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة) متفق عليه.

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ بِرَاحِلَتِهِ

"বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল।[২৫] নাবী ﷺ আরো বলেন:

يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন, যাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করে। অতঃপর তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে।[২৬]

ব্যাখ্যা: لله শব্দের মধ্যে প্রথমে যেই লাম অক্ষরটি প্রবেশ করেছে, তাকে লামে ইবতেদা বলা হয়। আর أشد فرحا এর মধ্যে فرحا শব্দটি তামীয হিসাবে মানসুব হয়েছে।

الفرح শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আনন্দিত ও খুশী হওয়া এবং অন্তরের মধ্যে ফুর্তি অনুভব হওয়া। পাপাচার ছেড়ে দিয়ে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসাকে তাওবা বলা হয়।

---

২৫. সহীহ মুসলিম ২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা।

২৬. সহীহ বুখারী ২৮২৬, সহীহ মুসলিম ১৮৯০, ইবনে মাজাহ ১৯১, নাসাঈ ৩১৬৬।।

بتوبة عبده বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে।

التوبة **তাওবা:** পাপ বর্জন করে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা।

بِرَاحِلَتِهِ তার বাহনে: الراحلة বলা হয় ঐ উটনীকে, যা বোঝা বহন করার বয়সে উপনীত হয়েছে।

الحديث : ফেলে মুকাদ্দারের কারণে **الحديث** শব্দটি মানসুব হয়েছে। উহ্য বাক্যটি হচ্ছে **أكمل الحديث** হাদীসটি পূর্ণরূপে পড়ুন। পূর্ণ হাদিস:

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

“বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে থামলো। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে ফেলেছে।[২৭]

---

২৭. সহীহ মুসলিম ২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা।

এ হাদীস থেকে আল্লাহর আনন্দিত হওয়া ও খুশী হওয়া প্রমাণিত হলো। তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে খুশী হওয়া শোভনীয়, তিনি সেভাবেই খুশী হন। এটিও আল্লাহর সিফাতে কামালিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর খুশী হওয়া কোন মাখলুকের খুশী হওয়ার মত নয়। এটি তাঁর অন্যান্য সিফাতের মতই। আল্লাহর খুশী হওয়া তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার খুশী।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে এমন খুশী হন না যে, তাওবার প্রতি তাঁর প্রয়োজন ছিল এবং বান্দার তাওবার মাধ্যমে তিনি উপকৃত হবেন। কেননা আনুগত্যকারীর আনুগত্য আল্লাহর কোন উপকার করে না এবং পাপাচারীর পাপাচারও আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না।

রসূল ﷺ বলেন: **يضحك الله إلى رجلين... إلخ "আল্লাহ তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন।** হাদীসের শেষাংশে নাবী ﷺ এর কারণ উল্লেখ করেছেন।

يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل فَيُستشهد ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فَيُسْتَشْهَدُ

"মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে অন্য কাফেরের হাতে শহীদ হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ফলে সে তাওবা করে এবং ইসলাম কবুল করে নেয়। পরবর্তীতে সেও আল্লাহর পথে জেহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়।[২৮]

এতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অনুগ্রহ এবং সীমাহীন রহমতের প্রমাণ মিলে। কেননা মুসলিমগণ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। কখনো এমন হয় যে, কাফেরদের কেউ তাদের কাউকে হত্যা করে ফেলে। এতে আল্লাহ তা'আলা নিহত মুসলিমকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই হত্যাকারী কাফেরের উপরও অনুগ্রহ করেন এবং তাকে ইসলামের পথ দেখান। ফলে সেও জেহাদে গিয়ে শহীদ হয়। পরিণামে সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করে।

২৮ . সহীহ বুখারী ২৮২৬, সহীহ মুসলিম ১৮৯০, ইবনে মাজাহ ১৯১, নাসাঈ ৩১৬৬।

এটি আসলেই আশ্চর্যের বিষয়। হাসি সাধারণত ঐসব বিস্ময়কর বিষয় থেকেই হয়ে থাকে, যা সাধারণত খুব কমই সংঘটিত হয়।

উপরের হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য হাসা বিশেষণ সাব্যস্ত। হাসি তাঁর সিফাতে ফেলিয়ার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে হাসা শোভনীয়, আমরা তাঁর জন্য সেভাবেই হাসি সাব্যস্ত করি। তাঁর হাসি মানুষের হাসার মত নয়।[২৯]

২৯. আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীর প্রতি খুশী হন এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারীর ক্রিয়া-কর্ম দেখে হাসেন। তবে আমাদেরকে এ কথা স্বরণ রাখতে হবে যে, খুশী হওয়া এবং হাসা আল্লাহর গুণাবলীর অন্যতম একটি গুণ। আমরা এতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতীতই বিশ্বাস করি। আল্লাহর শানে যেমন হাসা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই হাসেন। তাঁর হাসা কোন মাখলুকের হাসার মত নয়।

إثبات أن الله يعجب ويضحك

৩। আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্যান্বিত হন এবং হাসেন।

وقوله: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ آزِلِينَ قَنِطِينَ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» حديث حسن

রসূল ﷺ বলেন: "আমাদের রব তাঁর বান্দাদের নিরাশ হওয়াতে এবং তিনি যে তাদের অবস্থা অচিরেই পরিবর্তন করে দিবেন তাতে আশ্চর্যবোধ করেন। তোমরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখেন। এ অবস্থায় তিনি হাসতে থাকেন। তিনি জানেন যে, তোমাদের বিপদ মুক্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির সময় অতি নিকটে। এই হাদীসটি হাসান।[৩০]

ব্যাখ্যা: عَجِبَ رَبُّنَا আমাদের রব আশ্চর্যবোধ করেন: অভিধানগ্রন্থ 'আলমিসবাহ' নামক কিতাবে রয়েছে, তাজ্জব দুই প্রকার বিষয় ও বস্তু থেকে হতে পারে।

(১) এমন বিষয় ও বস্তু থেকে আশ্চর্যবোধ হয়, যাতে আশ্চর্যবোধকারী ঐ বস্তু বা বিষয়ের প্রশংসা করে। এই প্রকার আশ্চর্যবোধের মধ্যে আশ্চর্যবোধকারী বিষয়টিকে সুন্দর ও ভাল মনে করে এবং তার প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা জানায়।

(২) এমন বিষয় হতে আশ্চর্যবোধ করা হয়, যাকে আশ্চর্যবোধকারী অপছন্দ করে। এই প্রকার আশ্চর্যবোধের মধ্যে আশ্চর্যবোধকারী কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করে এবং উহার নিন্দা করে।

---

৩০. الإمام احمد في مسنده (4/ 11، 12) وابن ماجه (المقدمة،64/1) ، وابن عاصم في (السنة) (544) والآجري في (الشريعة) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (حديث حسن) (الواسطية، ص13)

مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ তাঁর বান্দাদের নিরাশ হওয়া থেকে: কোন জিনিস হতে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়াকে **قنوط** বলা হয়। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া এবং অনাবৃষ্টির অপকারিতা বিদূরিত হওয়া থেকে নিরাশ হওয়া।

وَقُرْبِ غِيَرِهِ অচিরেই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া: غيره শব্দের গাইন বর্ণে যের দিয়ে এবং ইয়া বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ কঠিন অবস্থাকে ভাল অবস্থার মাধ্যমে পরিবর্তন করা।

يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ آزِلِينَ তোমরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখেন। الأزل থেকে آزلين শব্দটি গঠন করা হয়েছে। **الأزل** এর যা বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়তে হবে। এর অর্থ হচ্ছে সংকীর্ণতা ও নিরাশায় নিপতিত হওয়া। বলা হয়ে থাকে **أزل يأزل أزلا** অর্থাৎ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটনে নিপতিত হয়েছে।

فَيَظَلُّ يَضْحَكُ তিনি হাসতে থাকেন: এটি আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত সিফাতে ফেলিয়াসমূহের (কর্মগত বিশেষণসমূহের) মধ্যে গণ্য, যা মাখলুকের কোন সিফাতের মত নয়। সুতরাং এই হাদীসে আল্লাহ তা'আলার কর্ম সম্পর্কিত সিফাতসমূহ থেকে দু'টি সিফাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সিফাত দু'টি হচ্ছে আশ্চর্যান্বিত হওয়া এবং হাসা। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এই দু'টি সিফাত তাঁর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। আল্লাহর আশ্চর্যান্বিত হওয়া এবং হাসা মাখলুকের আশ্চর্যবোধ করা ও হাসার মত নয়। হাদীসে আল্লাহ তা'আলার জন্য নযর তথা দৃষ্টিও সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটিও আল্লাহর কর্মগত সিফাতের অন্তর্ভূক্ত। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নয়।

إثبات الرجل والقدم لله سبحانه

৪। আল্লাহ্ তা'আলার 'পা' সাব্যস্ত করণ

وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يلقى فيها وهي تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رجله ــ وفي رواية: عليها قَدَمَه ــ فيتزوي بعضها إلى بعض فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ) متفق عليه

নাবী ﷺ বলেন: "জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে। জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? তখন মহান রাব্বুল আলামীন জাহান্নামে নিজের 'পা' রাখবেন।[৩১] অন্য বর্ণনায় رجله -এর স্থলে قدمه এসেছে। এতে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে এবং বলবে, 'যথেষ্ট হয়েছে' 'যথেষ্ট হয়েছে'।[৩২]

ব্যাখ্যা: পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা কাফের ও গুনাহ্গারদেরকে যেই আগুনের শাস্তি দিবেন, সেই শাস্তির অন্যতম নাম হচ্ছে জাহান্নাম। কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নামের গভীরতার কারণেই এই নামে নামকরণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নাম যেহেতু খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই একে জাহান্নাম হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ জাহান্নাম শব্দটি الجهومة থেকে গৃহীত হয়েছে। জুহুমাহ শব্দের অর্থ অন্ধকার।

يلقى فيها জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে: অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে। ঐদিকে **জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি?** অর্থাৎ জাহান্নাম আরো বেশী চাইতে থাকবে। কেননা জাহান্নাম অনেক প্রশস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে ভর্তি করার ওয়াদা করেছেন।

---

৩১. সহীহ বুখারী ৪৮৫০, সহীহ মুসলিম ২৮৪৬।

৩২. সহীহ বুখারী ৬৬৬১, সহীহ মুসলিম ২৮৪৮, তিরমিযী ৩২৭২, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪৫৭।

حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رجله তখন মহান রাব্বুল আলামীন তাতে নিজের 'পা' রাখবেন: জাহান্নাম যেহেতু অত্যন্ত বড় এবং উহা যেহেতু খুব প্রশস্ত আর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে পূর্ণ করার ওয়াদা করেছেন, ঐ দিকে আল্লাহ তা'আলার রহমতের দাবী হচ্ছে, তিনি কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিবেন না, তাই তিনি ওয়াদা পূর্ণ করতে গিয়ে জাহান্নামে স্বীয় 'পা' রাখবেন।

فيزوي بعضها إلى بعض এতে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে: অর্থাৎ জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে যাবে এবং এর উভয় পার্শ্ব পরস্পর মিশে যাবে। ফলে এর মধ্যে তখন যত বাসিন্দা থাকবে, তাদের ছাড়া আর কোন লোক প্রবেশ করার জায়গা খালী থাকবে না।

فَتَقُولُ قَطْ قَطْ জাহান্নাম বলবে, 'যথেষ্ট হয়েছে' 'যথেষ্ট হয়েছে'। অর্থাৎ জাহান্নাম বলবে আমার জন্য এই পরিমাণই যথেষ্ট।

অত্র হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহর 'পা' সাব্যস্ত হলো। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেমন 'পা' শোভনীয়, তাঁর 'পা' ঠিক সেরকমই। আল্লাহ তা'আলার হাত এবং চেহারার মতই পা তাঁর সিফাতে যাতীয়া তথা সত্তাগত বিশেষণ।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মুআত্তিলা (আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী) সম্প্রদায় মারাত্মক ভুল করেছে। তারা বলেছে, **قدمه** (আল্লাহর 'পা') বলতে বিশেষ এক প্রকার সৃষ্টি উদ্দেশ্য। তারা আরো বলেছে, হাদীসের অপর বর্ণনায় যেখানে قدمه এর স্থলে رجله এসেছে। তাই 'পা' বলতে একদল মানুষ (কাফের) উদ্দেশ্য। যেমন বলা হয়ে থাকে رجل جراد (পঙ্গপালের একটি দল)।

এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন, حتى يضع رجله আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে 'পা' রাখবেন। তিনি এই কথা বলেননি যে, حتى يلقي فيها তিনি উহাতে নিক্ষেপ করবেন। যেমন হাদীসের প্রথম অংশে বলেছেন, জাহান্নামে উহার বাসিন্দাদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে।

সেই সাথে আরো বলা হয়েছে যে, رجل শব্দকে জামা'আত বা দল দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেলেও قدم শব্দকে প্রকৃত কিংবা রূপকার্থে জামা'আত বা দল দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই।

إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى

৫। আল্লাহ তা'আলার আহবান, আওয়াজ এবং কালাম রয়েছে

وقوله: (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وقوله: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ)

রসূল ﷺ বলেন: "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবে, আমি তোমার আহবানে সাড়া দিচ্ছি ও তোমার আনুগত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা তখন আওয়াজ উঁচু করে এই বলে ডাক দিবেন, আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমার বংশধর থেকে একদল লোককে বের করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বুখারী ও মুসলিম।[৩৩]

রসূল ﷺ আরো বলেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই তার প্রভু কথা বলবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাদের সকলের সাথেই কথা বলবেন। কথা বলার সময় বান্দার মাঝে এবং তার রবের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না।[৩৪]

ব্যাখ্যা: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ আমি তোমার আহবানে সাড়া দিচ্ছি ও তোমার আনুগত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি: لبيك শব্দটি **ألب بالمكان** সে অমুক স্থানে অবস্থান করেছে, এ বাক্য থেকে নেওয়া হয়েছে। যখন কেউ কোন স্থানে অবস্থান করে, তখন বলা হয় **ألبَّ بالمكان**। মাফউলে মুতলাক হিসাবে **لبيك** শব্দটি মানুসব হয়েছে।

৩৩. সহীহ বুখারী ৭৪৮৩, ৪৭৪১, সহীহ মুসলিম ২২২।
৩৪. সহীহ বুখারী ৭৪৪৩, ৭৫১২, সহীহ মুসলিম ১০১৬, ইবনে মাজাহ ১৮৫।

তাগিদ স্বরূপ এটিকে দ্বি-বচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমার আনুগত্য করার জন্য বারবার প্রস্তুত ও সুদৃঢ় রয়েছি।

سعديك শব্দটি المساعدة থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আমি তোমার অনুগত আছি এবং আনুগত্য করার জন্য বারবার তোমার কাছে সাহায্য চাচ্ছি।

فَيُنَادِي **অতঃপর ডাক দিবেন।** এখানে দাল বর্ণে যের দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ডাক দিবেন।

بصوت **আওয়াজ সহকারে** এই শব্দটি ينادي এর তাগিদ স্বরূপ এসেছে। কেননা ডাক দেয়া বা আহবান করা সাধারণত: আওয়াজের সাথেই হয়ে থাকে। এটি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর মতই। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا "আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়" (সূরা নিসা ৪:১৪৬)।

بعثا إلى النار **জাহান্নামের বাহিনী:** এখানে بعث শব্দটি مبعوث অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আগুনের দিকে প্রেরিত বাহিনীকে বের করো। উহার অর্থ হলো জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করো।

উপরের হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আল্লাহর পক্ষ হতে এমন আওয়াজসহ কথা এবং আহবান হয়, যা শোনা যায়। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর পক্ষ হতে আহবান আসবে। হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন এবং ডাক দেন।

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سيكلمه ربه **তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই তার প্রভু কথা বলবেন না:** এখানে সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হলেও সর্বকালের সকল মুমিন উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বিনা মধ্যস্থতায় কথা বলবেন। ليس بينه وبينه ترجمان আল্লাহর মাঝে এবং বান্দার মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না: যে ব্যক্তি এক ভাষার কথা অন্য ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করে, তাকে দোভাষী বলা হয়। অর্থাৎ এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় অনুবাদকারীর নাম তারজুমান।

এ হাদীস থেকেও দলীল পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাথে কথা বলবেন। তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন। আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাতে ফেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, তিনি কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক মুমিনের সাথেই কথা বলবেন।

إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه

৬। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি তাঁর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন।

وقوله في رقية المريض: (رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ ، أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ ، اجعل رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فيبرأ) حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: (أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ) حديث صحيح. وقوله: (والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه) حديث حسن رواه أبو داود وغيره.وقوله للجارية: (أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) رواه مسلم.

রসূল ﷺ রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলেছেন:

(رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ ، أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ ، اجعل رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فيبرأ) حديث حسن رواه أبو داود وغيره

"তিনিই আমাদের প্রভু, যিনি আকাশে রয়েছেন। হে আমাদের প্রভু! তোমার নাম পবিত্র। তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে। আসমানে যেমন তোমার রহমত রয়েছে তেমনি যমীনেও তোমার রহমত নাযিল করো। আমাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করো। তুমি পবিত্রদের প্রতিপালক। তোমার নিকট হতে রহমত নাযিল করো এবং তোমার 'শিফা' হতে 'শিফা' নাযিল কর। আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হবে। এ হাদীসটি

হাসান। ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৩৫] রসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"আমার উপর কি তোমাদের আস্থা নেই? অথচ আমি ঐ আল্লাহর একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি, যিনি আকাশে আছেন।[৩৬] নাবী ﷺ বলেনঃ

[والعرش فوق ذلك وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ] حديث حسن رواه أبو داود وغيره

"তার উপর আল্লাহর আরশ। আর আল্লাহ্ আরশের উপর। তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন"। হাদীসটি হাসান। আবু দাউদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি দাসীকে রসূল জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ

(أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) رواه مسلم.

"আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলেছিল আসমানের উপর। রসূল আলাইহি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি তখন দাসীর মনিবকে বললেন, তুমি একে আযাদ করে দাও। কারণ সে মুমিন।[৩৭]

....

ব্যাখ্যাঃ **في رقبة المريض** রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময়, নাবী ﷺ উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন। অর্থাৎ রোগীর জন্য সুস্থতা প্রার্থনা করে এই দু'আ পাঠ করতেন। কুরআন ও হাদীসের দু'আর মাধ্যমে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। আর শিরকী কথা ও কর্ম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা নিষিদ্ধ।

---

৩৫. আবু দাউদ ৩৮৯২, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

৩৬ . সহীহ মুসলিম ১০৬৪, সহীহ বুখারী ৪৩৫১।

৩৭ .সহীহ মুসলিম ৫৩৭, আবূ দাউদ ৯৩০, নাসাঈ ১২১৮।

رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ আমাদের প্রভু রয়েছেন আসমানে: **في السماء** বলতে **على السماء** অর্থাৎ আকাশের উপরে উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে في হরফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

"কাজেই তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাস চলাফেরা করো"। (সূরা তাওবা ৯:২)। এখানেও في হরফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত। في অক্ষরটি আসল অর্থে তথা যারফিয়া হিসাবেও ব্যবহৃত হওয়া বিশুদ্ধ। তখন السماء দ্বারা সাধারণভাবে উপর বুঝাবে।

تَقَدَّسَ اسْمُكَ তোমার নাম পবিত্র: অর্থাৎ তোমার অতি সুন্দর নামগুলো প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। اسم শব্দটি এখানে একবচন হলেও মুযাফ হওয়ার কারণে এর দ্বারা আল্লাহর সকল পবিত্র নামই উদ্দেশ্য হবে।

أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে: অর্থাৎ আসমান ও যমীনে তোমার ঐসব সৃষ্টি ও নির্ধারণগত আদেশ কার্যকর হয়, যার মাধ্যমে সবকিছুই সৃষ্টি ও সংঘটিত হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু তাকে বলেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়"। (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)

এমনি আল্লাহর আরেক প্রকার আদেশ রয়েছে, যা শরীয়তের ঐসব আদেশকে অন্তর্ভূক্ত করেছে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ আসমানে যেমন

তোমার রহমত রয়েছে, তেমনি যমীনেও তোমার রহমত নাযিল করো: এখানে আল্লাহ তা'আলার যেই রহমত আসমানের সকল বাসিন্দাকে নিজের মধ্যে শামিল করে নিয়েছে ঐ রহমতের উসীলায় আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন যমীনবাসীর জন্যও তার রহমতের একটি অংশ নির্ধারণ করেন।

اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا আমাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করো: এখানে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে।

المغفرة অর্থ হচ্ছে ঢেকে রাখা এবং পাপাচার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। মাথাকে ঢেকে রাখার জন্য এবং শত্রুর আঘাত থেকে মাথাকে হেফাযত করার জন্য মাথায় যেই হিলমেট المِغْفَر পরিধান করা হয়, তা এই **المغفرة** শব্দ থেকেই নেয়া হয়েছে। এখানে الحوب হচ্ছে الإثم (অপরাধ)। আর الخطايا এবং الذنوب একই অর্থে ব্যবহৃত। উহা হচ্ছে গুনাহ ও পাপসমূহ।

أنت رب الطيبين তুমি পবিত্রদের প্রতিপালক: এই বাক্যের মাধ্যমেও উসীলা দেয়া হয়েছে। **طيب** শব্দের বহুবচন **الطيبون**। তারা হচ্ছেন নাবী এবং তাদের অনুসারীগণ। আল্লাহর রুবুবীয়াতকে উক্ত শ্রেণীর লোকদের প্রতি সম্বন্ধিত করার দ্বারা তাদের সম্মান, মর্যাদা ও তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা সবকিছুরই প্রভু ও মালিক।

أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ তোমার নিকট হতে রহমত নাযিল করো: অর্থাৎ যেই রহমতটি তুমি সৃষ্টি করেছো, তা তুমি আমাদের উপর নাযিল করো। আল্লাহর রহমত দুই প্রকার।

(১) আল্লাহর যেই রহমত তাঁর অন্যতম সিফাত অর্থে ব্যবহৃত, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ "আর আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে"। (সূরা আরাফ: ১৫৬)

(২) আবার রহমতকে কখনো আল্লাহ তা'আলার দিকে তাঁর ক্রিয়া হিসাবে সম্বন্ধিত করা হয়। তখন উহা ঐ সব মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা সৃষ্টিকর্তার দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। যেমন এই হাদীসে রহমত শব্দটি তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। যেমন নাবী ﷺ নিম্নের এই হাদীসে বলেছেন:

«خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً إِلاَّ وَاحِدَةً»

"আল্লাহ তা'আলা একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টির মধ্যে তা থেকে মাত্র একটি রহমত ছেড়েছেন। আর ৯৯টি রহমত তাঁর নিকট রেখে দিয়েছেন।[৩৮]

রোগী যেহেতু আল্লাহর রহমতের প্রতি মুখাপেক্ষী, তাই নাবী ﷺ তাঁর রবের কাছে রোগীর উপর রহমত নাযিল করার আবেদন করেছেন, যাতে তিনি এর মাধ্যমে রোগীকে শিফা দান করেন।

এই হাদীস থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য 'উলু' তথা উপরে হওয়া সাব্যস্ত। আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর। পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, উলু তথা উপরে হওয়া আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত সিফাত। সেই সাথে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়াত, তাঁর ইলাহীয়াত, তাঁর পবিত্রতা, সকল সৃষ্টির উপরে হওয়া, তাঁর সকল আদেশ, তাঁর রহমত ইত্যাদি সিফাত তুলে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব।

أَلا تَأْمَنُونِي তোমাদের কি আমার উপর আস্থা নেই? নাবী ﷺ পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করে এ কথা বলা হয়েছে, যে তাঁর কতক মাল বণ্টনে আপত্তি উত্থাপন করেছিল।[৩৯] এখানে যেই ألا অব্যয়টি এসেছে, তা বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয় এবং তা দ্বারা সতর্ক করা উদ্দেশ্য হয়। আর تأمنون শব্দটি الأمانة থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব ও

৩৮. সহীহ বুখারী ৬৪৬৯, সহীহ মুসলিম ২৭৫২, তিরমিযী ৩৫৪১, ইবনে মাজাহ ৪২৯৩।
৩৯. সহীহ বুখারীতে (৪৩৫১) এ হাদীসটি বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।

খেয়ানত না করা। অর্থাৎ তোমরা কি মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে আমার উপর আস্থাশীল নও?

وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء অথচ আমি ঐ সত্তার একজন আস্থা ভাজন ব্যক্তি, যিনি আসমানের উপর রয়েছেন: আসমানে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি আমাকে তাঁর অহী, রেসালাত এবং শারীয়াতের তাবলীগ করার উপর আমানতদার বানিয়েছেন। সুতরাং রসূল ﷺ আমানতদারী এবং সত্যবাদীতার সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। উপরোক্ত হাদীস থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহর জন্য উলু (উপরে হওয়া বিশেষণ) সাব্যস্ত। কেননা রসূল ﷺ বলেন, **من في السماء** যিনি রয়েছেন আসমানের উপর। একটু পূর্বে এই বাক্যের ব্যাখ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে।

والعرش فوق ذلك উহার উপর আল্লাহর আরশ: এ বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঐসব সৃষ্টির উপর, যা রসূল ﷺ তাঁর সাহাবীর জন্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাতে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে এক আসমান থেকে অন্য আসমান পর্যন্ত দূরত্ব, প্রত্যেক আসমানের পূরত্ব, সপ্তম আসমানের উপরস্থ সাগর, সেই সাগরের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দূরত্ব এবং ঐ সাগরের উপর সাতটি বিশাল আকারের ওয়াল (বিশেষ আকৃতির আট ফেরেশতা) থাকার কথা বর্ণনা করা রয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, উহার উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ।

والله فوق العرش আর আল্লাহ্ আরশের উপরে। অর্থাৎ তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে আরশের উপর সমুন্নত হওয়া শোভনীয়, তিনি সেভাবেই আরশের উপর সমুন্নত রয়েছেন।

وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন: অর্থাৎ তিনি তাঁর ইলমের মাধ্যমে তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, যা থেকে কোন বস্তুই গোপনীয় নয়।

উপরের হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য আরশের উপর সমুন্নত হওয়া সুসাব্যস্ত। আর আল্লাহ তা'আলার আরশ সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে বান্দাদের সমস্ত আমলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপনীয় নয়।

وقوله للجارية দাসীর কথা: সে ছিল মুআবীয়া ইবনুল হাকামের দাসী। মনিব মুআবীয়া দাসীর উপর ক্রোধান্বিত হয়ে দাসীকে চপেটাঘাত করলেন। অতঃপর তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং রসূল ﷺ কে বিষয়টি জানালেন। তিনি নাবী ﷺ আরো জানালেন যে, আমি কি তাকে মুক্ত করে দিবো না? তিনি বললেন, আমার কাছে ওকে নিয়ে এসো। তিনি দাসীকে নাবী আলাইহি ওয়া কাছে নিয়ে আসলেন। রসূল ﷺ দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, **أين الله** আল্লাহ কোথায়? এতে দলীল পাওয়া যায় যে, আল্লাহ কোথায়? এই প্রশ্ন করা জায়েয আছে।

দাসী তখন বলল في السماء আসমানের উপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর। এই বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। নাবী ﷺ দাসীকে আরো প্রশ্ন করলেন যে, আমি কে? নাবী ﷺ সম্পর্কে দাসীর বিশ্বাস কী ছিল, তা জানার জন্য তাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে।

দাসী তখন বলল, **أنت رسول الله** "আপনি আল্লাহর রসূল"। এই বাক্যের মাধ্যমে দাসী রসূল ﷺ জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য দিল। তিনি তখন দাসীর মনিব মুআবীয়াকে বললেন,

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ তুমি একে আযাদ করে দাও, কারণ সে মুমিন। এতে প্রমাণ পাওয়া গেল, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ তা'আলা উপরে এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল, সে মুমিন হিসাবে গণ্য হবে। আরো জানা গেল যে, দাসমুক্তির জন্য ঈমান পূর্বশর্ত। এ হাদীসে সমস্ত সৃষ্টির উপরে অবস্থিত সাত আসমানের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার দলীল পাওয়া গেল। এতে আরো প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করার সময় আঙ্গুল বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে উপরের দিকে ইঙ্গিত করা বৈধ।

إثبات معية الله لخلقه وأنها لاتنافي علوه فوق عرشه

৭। এটি সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের সাথেই আছেন। এটি সাব্যস্ত করা আরশের উপর তাঁর সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

রসূল ﷺ বলেন:

أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ" حَدِيثٌ حَسَنٌ. أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت

"সর্বোত্তম ঈমান হলো তুমি জানবে যে, যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমার সাথেই"। হাদীসটি হাসান। ইমাম তাবারানী উবাদাহ বিন সামেত ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূল ﷺ আরো বলেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ؛ فَلا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

"তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়াবে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। এমনকি ডান দিকেও না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে রয়েছেন। একান্ত যদি থুথু ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে।[৪০] বুখারী ও মুসলিম। রসূল ﷺ আরো বলেন,

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ

৪০ . সহীহ বুখারী ৪১৬, সহীহ মুসলিম ৫৪৮, আবূ দাউদ ৪৮৫, নাসাঈ ৭২৪, দারিমী ১৩৯৮, ইবনে মাজাহ ৮৬১।

شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ رِوَاه مُسْلِمٌ،

"হে আল্লাহ! হে সাত আসমান ও যমীনের প্রভু! হে আরশে আযীমের রব! হে আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে দানা ও বীচি বিদীর্ণকারী! হে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি তোমার নিকট আমার নফসের অনিষ্ট হতে এবং ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক বিচরণকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার ললাট তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই الأَوَّل (প্রথম)। তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমিই الآخِر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমিই الظَّاهِر (সবকিছুর উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই البَاطِن (মাখলুকের অতি নিকটে), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছু নেই"। তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো এবং আমাকে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করো। ইমাম মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪১]

সাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উঁচু করলেন তখন তিনি বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ! اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করো। কেননা তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহবান করছো না। যাকে তোমরা আহবান করছো তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং অতি নিকটে। তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও আহবানকারীর অধিক নিকটে"।[৪২] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

---

৪১. সহীহ মুসলিম ২৭১৩, তিরমিযী ৩৪৮১, ইবনে মাজাহ ৩৮৩১, আবূ দাউদ ৫০৫১।
৪২ . সহীহ বুখারী ৬৩৮৪, সহীহ মুসলিম ২৭০৪, আবূ দাউদ ১৫২৬, বাইহাকী ৩০১২।

ব্যাখ্যা: أَفْضَلُ الإِيمَانِ **সর্বোত্তম ঈমান**। অর্থাৎ ঈমানের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তোমার সাথেই। পূর্বোক্ত কথার মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যে, ঈমানের তারতম্য হয়। অর্থাৎ সকল মুমিনের ঈমান এক সমান নয়।

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ **তুমি জানবে যে, আল্লাহ তোমার সাথেই আছেন।** অর্থাৎ ইলমের মাধ্যমে এবং তোমার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে তিনি তোমার সাথেই, তুমি যেখানেই থাকো না কেন। যে ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তার ভিতর ও বাহির একই রকম হবে এবং সকল স্থানেই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলবে। ইমাম তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাবারানী হচ্ছেন, আবুল কাসেম সুলায়মান আল-লাখমী। হাদীসের যেসব হাফেয বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মু'জামুল কাবীরে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসে দলীল পাওয়া গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ইলমের মাধ্যমে মাখলুকের সাথেই এবং তিনি তাদের আমলসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হলো সবসময় এই কথা মনে রাখা। এতে তার আমল সুন্দর হবে।

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ **তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়:** অর্থাৎ সলাত শুরু করে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। হাদীসে উল্লেখিত قبل শব্দের 'কাফ' বর্ণে যের দিয়ে এবং 'বা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে।

فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ **কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সামনের দিকে রয়েছেন।** এটি হচ্ছে সলাত আদায়কারীকে কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে নিষেধ করার কারণ। কেননা আল্লাহ তা'আলা সলাত

আদায়কারীর চেহারার দিকে রয়েছেন। অর্থাৎ সামনের দিকে রয়েছেন। যেভাবে সামনে থাকা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়, তিনি সেভাবেই সলাত আদায় কারীর সামনে থাকেন। এতে করে এটি আবশ্যক হয় না যে, তিনি মাখলুকের সাথে একদম মিলিত অবস্থায় রয়েছেন। বরং আসমানসূহের উপর আরশে তিনি সমুন্নত। আরশে সমুন্নত হয়েও তিনি মাখলুকের অতি নিকটে এবং তাদের সকলকে পরিবেষ্টনকারী।

সলাত আদায়কারী যেন তার ডান দিকেও থুথু না ফেলে। কেননা ডান দিকের আলাদা মর্যাদা রয়েছে এবং সলাত আদায়কারীর ডান দিকে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা। যেমন বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে।

وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ একান্ত যদি সলাত আদায়কারী ব্যক্তিকে থুথু ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে: অর্থাৎ সলাত আদায় কারী ব্যক্তি যদি থুথু ফেলতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন তাঁর বাম দিকে কিংবা বাম পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করে।

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো, আসমানসমূহের উপরে আরশে সমুন্নত হয়েও আল্লাহ তা'আলা সলাত আদায়কারী বান্দার নিকটবর্তী হন এবং সলাত আদায়কারীর দিকে বিশেষভাবে অগ্রসর হন (মনোনিবেশ করেন)।

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِ হে আল্লাহ! হে সাত আসমান ও যমীনের প্রভু: اللهم এর মূল হচ্ছে يا أللهُ । আল্লাহ শব্দের পূর্ব হতে হরফে নেদা يا কে ফেলে দিয়ে তার বদলে শেষে ميم বাড়ানো হয়েছে। হে সাত আসমানের প্রভু! অর্থাৎ উহার স্রষ্টা ও মালিক।

وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ আরশে আযীমের রব: অর্থাৎ এমন বিশাল আরশের মালিক, যার বিশালতা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। আরশ হচ্ছে আল্লাহর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আরশের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ **হে আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক!** অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা, সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর মালিক। এতে সাব্যস্ত হলো, সবকিছুর প্রতিপালনকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى **দানা ও বীচি বিদীর্ণকারী:** খাদ্য দ্রব্যের দানা ও খেজুরের বীচিকে উদ্গত করণের জন্য বিদীর্ণকারী।

মুসা ﷺ এর উপর তাওরাত (التوراة), ঈসা ﷺ এর উপর ইঞ্জিল (الإنجيل) অবতীর্ণকারী এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর কুরআন (القرآن) অবতীর্ণকারী। এই হাদীসে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন, এই তিনটি কিতাবের ফাযীলাত প্রমাণিত হলো। আরো জানা গেল যে, এই কিতাবগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।

أعوذ بك **আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি:** অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং তোমার পথকেই আকঁড়ে ধরছি।

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ **তোমার নিকট ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি:** ভূপৃষ্ঠে যেসব প্রাণী বিচরণ করে, সেগুলোর প্রত্যেকটিকেই دابة বলা হয়।

أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا **যার ললাট তুমি ধারণ করে আছ:** মাথার সামনের অংশকে ললাট বা কপাল বলা হয়। অর্থাৎ হে আল্লাহ! ঐসব অনিষ্টকারী প্রাণী যেহেতু তোমার ক্ষমতা ও আয়ত্তাধীন এবং তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে সেভাবেই পরিচালনা করো, তাই তুমি আমার উপর থেকে ঐগুলোর অনিষ্ট দূর করে দাও। রসূল ﷺ তাঁর দু'আয় বলতেন,

أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛

“হে আল্লাহ! তুমিই الأَوَّل (প্রথম)। তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না। তুমিই الآخر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই থাকবে না। তুমিই الظَاهِر (সবকিছুর উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই الَباطِن (অতি নিকটে), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই”।[৪৩]

আল্লাহ তা‘আলার এই চারটি নামের মধ্যে দু’টি নাম তাঁর চিরস্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতার প্রমাণ করে। এই দু’টি নাম হচ্ছে الأَوَّل (প্রথম) এবং الآخر (সর্বশেষ)। আর বাকী দু’টি নাম আল্লাহ তা‘আলা সকল সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়া এবং সৃষ্টির একদম নিকটে হওয়ার প্রমাণ করে। এই নাম দু’টি হচ্ছে الظَاهِر (প্রকাশ্যমান) এবং الَباطِن (অতি নিকটে)।

হাদীসের মধ্যে এই শেষ দু’টি নামই হচ্ছে মহল্লে শাহেদ। অর্থাৎ এখান থেকেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহি. দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা সকল মাখলুকের উপরে এবং তিনি নিকটেও। কেননা আল্লাহ তা‘আলার এই নাম দু’টিতে আল্লাহর জন্য علو (মাখলুকের উপরে সমুন্নত হওয়া) এবং قرب (সৃষ্টির নিকটে হওয়া) সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর এ দু’টি সিফাত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ তা‘আলা উপরে সমুন্নত হয়েও মাখলুকের নিকটে এবং মাখলুকের নিকটবর্তী হয়েও সকল মাখলুকের উপরে সমুন্নত।

اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো: অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর থেকে তোমার হকসমূহ এবং মাখলুকের হকসমূহ আদায়ের ব্যবস্থা করো। বান্দা নিজের শক্তিতে অসৎকাজ করতে অক্ষম এবং নিজের শক্তিতে কোন সৎকাজই করতে পারে না, -এখানে তাই বলা হয়েছে।

وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ এবং আমাকে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করো: الفقر

---

৪৩. সহীহ: সহীহ মুসলিম ২৭১৩, ইবনে মাজাহ ৩৮৩১, আবূ দাউদ ৫০৫১, তিরমিযী ৩৪৮১।

অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন, অভাব। ফকীর বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার কিছুই নেই অথবা যার কাছে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য বস্তু রয়েছে। এই হাদীস থেকে আরো জানা গেল যে, প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এবং দু'আ কবুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতের উসীলা দেয়া বৈধ।

সাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উঁচু করলেন: এটি ছিল খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা। যেমন এই হাদীসের কোন কোন সনদে সুস্পষ্ট করেই তা বলা হয়েছে। সাহাবীগণ যেই যিকিরের মধ্যে আওয়াজ উঁচু করেছিল, তা ছিল তাকবীর। অর্থাৎ তারা উঁচু আওয়াজে **الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله** বলছিল। **أربعوا** অর্থ হচ্ছে **أرفقوا** অর্থাৎ নিজেদের জন্য সহজ করো।

فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا কেননা তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহবান করছো না: এটি হচ্ছে আওয়াজ অতিরিক্ত উঁচ না করার এবং নিজেদের উপর সহজ করার আদেশ দেয়ার কারণ। অর্থাৎ তোমরা তো এমন কাউকে ডাকছো না, যিনি তোমাদের ডাক শুনেন না এবং তোমাদেরকে দেখেন না। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে এমন আপদ ও ত্রুটি নাকোচ করা হয়েছে, যা শ্রবণ করার প্রতিবন্ধক এবং তাঁর পবিত্র সত্তা হতে এমন দোষ-ত্রুটি নাকোচ করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য শ্রবণ করার প্রতিবন্ধক। সেই সাথে হাদীসে উক্ত দোষ দু'টির বিপরীত গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। রসূল ﷺ বলেন: **إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا যাকে তোমরা আহবান করছো তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং তোমাদের অতি নিকটে।** সুতরাং আওয়াজ উঁচু করার কোন দরকার নেই।

إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও আহবানকারীর অধিক নিকটে: সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে এবং যারা তাঁর যিকির করে তিনি তাদের অতি নিকটে। তাই আওয়াজ উঁচু করে দু'আ

করার প্রয়োজন নেই। তিনি এত নিকটে যে, আওয়াজ নীচু করে দু'আ করলে যেভাবে শুনেন, উঁচু আওয়াজে দু'আ করলেও ঠিক সেভাবেই শুনেন।

হাদীস থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকটবর্তী হন। হাদীসে ইহা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি উঁচু আওয়াজগুলো যেমন শুনেন, নীচু ও অস্পষ্ট আওয়াজগুলো সেভাবেই শুনেন।

উপরের সবগুলো হাদীস প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ মাখলুকের সাথে, তাদের নিকটে, তিনি মাখলুকের সব আওয়াজ শুনেন এবং তিনি তাদের সমস্ত নড়াচড়া (আমলসমূহ) দেখেন। আর তিনি যে সৃষ্টির উপরে এবং আরশের উপর সমুন্নত এটি তার বিরোধী নয়। আল্লাহর মাঈয়াত তথা সৃষ্টির সাথে থাকার ব্যাখ্যা এবং উহার প্রকারভেদ কুরআনুল কারীমের দলীল-প্রমাণসহ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

৮। মুমিনগণ কিয়ামাতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবে।

রসূল ﷺ বলেন:

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ليلة البدر لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا »
(بخارى: 554)

"কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখতে পাও, সেভাবেই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যদি এই পরিমাণ সামর্থ থাকে, সূর্য উদয় এবং অস্তের পূর্বের সলাত হতে কোন বস্তুই তোমাদেরকে পরাভুত করতে পারবে না, তাহলে উক্ত সলাতদ্বয়কে তোমরা যথাসময়ে আদায় করো।[৪৪]

ব্যাখ্যা: এখানে **إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা দেখতে পাও:** দ্বারা মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। سترون এর মধ্যে যে سين অক্ষরটি প্রবেশ করেছে, তা ভবিষ্যৎকালের জন্য হলেও এখানে তা দ্বারা তাগিদ তথা বাক্যের বিষয়কে শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য।

ترون ربكم অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চোখ দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে। মুমিনগণ তাদের রবকে দেখার বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো রসূল ﷺ হতে মুতাওয়াতির তথা ব্যাপক সংখ্যক বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪৪ . সহীহ বুখারী ৫৫৪, সহীহ মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭২৯, ইবনে মাজাহ ১৭৭।

كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ليلة البدر তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে এই চন্দ্রকে দেখতে পাও: অর্থাৎ চন্দ্র তার পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করার রাতে। এটি হচ্ছে মাসের ১৪তম রাত। ঐ রাতে চন্দ্র আলোতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এখানে এই তাশবীহ তথা আল্লাহর দিদারকে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জোর দিয়ে আল্লাহর দিদারকে সত্য হিসাবে সাব্যস্ত করা এবং তার দ্বারা রূপকার্থ উদ্দেশ্য হওয়ার সন্দেহকে দূর করা। বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহর দিদারকে পূর্ণিমার রাতের মেঘহীন আকাশে চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলার **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** সদৃশ আর কিছুই নেই।

لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ উহাকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় না। تا বর্ণে পেশ দিয়ে এবং ميم বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন কোনো যুলুম হয় না যে, ভীড়ের কারণে কেউ দেখতে পাবে আবার কেউ দেখতে পাবে না।

لاتضامون এর তা تا বর্ণে যবর দিয়ে এবং ميم বর্ণে তাশদীদ দিয়ে পড়া হয়েছে। এভাবে পড়া হলে এর মাসদার হবে التضامّ। অর্থাৎ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার জন্য তোমাদের একজনকে অন্যজনের কাছে গিয়ে মিশতে হয় না। এই বর্ণনা অনুসারে অর্থ হবে, চাঁদ দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে এক স্থানে জড়ো হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যাতে খুব ভীড় হওয়ার সম্ভবানা থাকে।

উভয় বর্ণনার অর্থ একসাথে এই হবে যে, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। এই দেখা সত্য। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকেই দেখতে পাবে।

فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا সুতরাং তোমাদের যদি সামর্থ থাকে যে, কোনো বস্তুই তোমাদেরকে পরাভুত করতে পারবে না: অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বের সলাতটি পড়া হতে তোমরা পরাজিত হয়ে যাবে না। এটি হচ্ছে

ফজরের সলাত। আর সূর্য ডুবার পূর্বেও একটি সলাত থেকে পরাভূত হবেনা। তা হচ্ছে আসরের সলাত। তোমরা যদি উক্ত সলাত দু'টি যথা সময়ে আদায়ের সামর্থ রাখো, তাহলে সলাতদ্বয় আদায় করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি ও গাফেলতী করো না। বরং জামা'আতের সাথে এবং সঠিক সময়ে এই সলাত দু'টি আদায়ে যত্নবান হও। এই দু'টি সলাতকে খাস করে উল্লেখ করার কারণ হলো, এতে ফেরেশতাগণ একসাথে মিলিত হয়। সুতরাং আসর ও ফজরের সলাত পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই যে ব্যক্তি এই সলাত দু'টি যত্নসহকারে আদায় করবে, সে সর্বোত্তম পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা।

হাদীস থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন খোলাখুলিভাবে এবং কপালের চোখ দিয়ে প্রকাশ্যভাবেই মুমিনগণ তাদের রবকে দেখতে পাবে। যে আয়াতগুলোতে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করার সময় ঐসব লোকের আলোচনা ও প্রতিবাদ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, যারা এই মাসআলায় বিরোধীতা করেছে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করেছে।

موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية

যেসব হাদীসে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ সিফাতগুলো সুসাব্যস্ত করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

"হে পাঠক! উপরোক্ত হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন! অনুরূপ অনেক হাদীসে রসূল ﷺ তাঁর রবের ঐসব সিফাতের সংবাদ দিয়েছেন যা তাঁর রব তাঁকে জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যেসব সুউচ্চ সিফাতের সংবাদ দিয়েছেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সেসব সুমহান সিফাতের প্রতি বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি তারা রসূল ﷺ হাদীসগুলোতে বর্ণিত সিফাতগুলোর প্রতিও বিশ্বাস করে। তারা ঐসব সিফাতের কোন পরিবর্তন করে না, কোনটিকেই বাতিল করে না এবং এগুলো থেকে কোনটির ধরণ, কায়া, কিংবা উপমাও পেশ করে না।

....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখুল ইসলাম রসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ সিফাতের হাদীসগুলোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের অবস্থান বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের

অবস্থান ঠিক কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার সিফাতের আয়াতসমূহের প্রতি তাদের অবস্থানের অনুরূপ। তা হলো হাদীসগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং ঐগুলোর প্রকৃত ও আসল অর্থে বিশ্বাস করা। হাদীসের শব্দমালা যেই বাহ্যিক অর্থ প্রদান করে, তারা সেই বাহ্যিক অর্থকে বিভিন্ন প্রকার বাতিল ব্যাখ্যার মাধ্যমে অন্য অর্থে পরিবর্তন করে না, হাদীসের শব্দসমূহ যা প্রমাণ করে, তারা তা অস্বীকার করে না এবং বাতিলও করে না। সেই সাথে তারা হাদীসসমূহে উল্লেখিত আল্লাহর সিফাতসমূহকে সৃষ্টিসমূহের সিফাতের সাথে তুলনাও করেনা। কেননা **ليس كمثله شيء** আল্লাহর সদৃশ কোন কিছুই নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের তরীকা ঐসব বিদ'আতী, জাহমীয়া, মুতাযেলা এবং আশায়েরাদের তরীকার বিপরীত, যারা আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত দলীলগুলোকে অস্বীকার করে অথবা সেগুলো যা প্রমাণ করে, তার অপব্যাখ্যা করে। তারা ঐসব মুশাব্বোহা (আল্লাহর সিফাতকে বান্দার সিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়েরও বিপরীত, যারা আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে ফেলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে আল্লাহর সিফাতগুলো মাখলুকের সিফাতের মতই। বস্তুত: তারা যা বলে, আল্লাহ তা'আলা তার অনেক উর্ধ্বে।

مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة

উম্মতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মর্যাদা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّ الْأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمَمِ فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَةِ وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وغيرهم وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ

বরং এই উম্মত যেমন পূর্বের উম্মতসমূহের তুলনায় মধ্যমপন্থী উম্মত হিসাবে পরিগণিত, ঠিক তেমনি এই উম্মতের মধ্যকার বিভিন্ন ফির্কার তুলনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা মধ্যমপন্থী জামা‘আত হিসাবে গণ্য।

আল্লাহ তা‘আলার সুউচ্চ সিফাতের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে সিফাতকে অস্বীকারকারী জাহমীয়া সম্প্রদায় এবং আল্লাহ তা‘আলার সুমহান সিফাতকে বান্দার সিফাতের সাথে তুলনাকারী মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝখানে।

আল্লাহ তা‘আলার কর্মসমূহের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান হচ্ছে জাবরীয়া এবং কাদারীয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝখানে।

আল্লাহ তা‘আলার ওয়াঈদ তথা গুনাহর কারণে আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে এবং রসূল ﷺ পবিত্র সুন্নাতে শাস্তির যেসব ধমক এসেছে,

তাতেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান মুরজীয়া এবং কাদারীয়াদের ওয়াঈদিয়ী সম্প্রদায়ের মাঝখানে।

ঈমান এবং দ্বীনের নামগুলোর বিষয়েও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান একদিকে হারুরী (খারেজী) ও মুতাযেলাদের মাঝখানে এবং অন্যদিকে মুরজীয়া ও জাহমীয়াদের মাঝখানে।

এমনি রসূল ﷺ সাহাবীদের ব্যাপারেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান খারেজী এবং রাফেযীদের মাঝখানে।

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান বর্ণনা করার পর উপরোক্ত বাক্যগুলোর মাধ্যমে তাদের ফাযীলাত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। যাতে করে অন্যদের তুলনায় তাদের মর্যাদা ও ফাযীলাত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কেননা কোন বিষয়ের সৌন্দর্য কেবল তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। সকল জিনিসের ক্ষেত্রেই একই কথা। সমস্ত বস্তুই তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله বলেন: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মতের সমস্ত ফির্কার তুলনায় মধ্যমপন্থী ফির্কা হিসাবে স্বীকৃত: আল-মিসবাহুল মুনীর নামক কিতাবে রয়েছে যে, الوسط শব্দের واو এবং سين বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। ওয়াসাত অর্থ হলো সরল-সোজা। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়পরায়ন এবং উৎকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের উপর সাক্ষী হতে পারো"।

সুতরাং আহলে সুন্নাতের লোকেরা ‘ওয়াসাত’। الوسط অর্থ হচ্ছে তারা ন্যায়পরায়ন, উৎকৃষ্ট এবং উত্তম। দ্বীনের ক্ষেত্রে কঠোরতায় এবং শৈথিল্য প্রদর্শনে যে দু’টি দল বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান তাদের উভয়ের মাঝখানে। সেই সাথে যেসব ফির্কা নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা তাদের তুলনায় মধ্যমপন্থী।

মুসলিম উম্মত পূর্বের উম্মতদের তুলনায় মধ্যমপন্থী। অতীতের যেসব উম্মত বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের দিকে ঝুকে পড়েছে এবং যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও ঢিলামি করেছে এই উম্মত তাদের তুলনায় মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মধ্যমপন্থী মাযহাবের বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা

প্রথমত: আল্লাহ তা‘আলার সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সিফাতকে বাতিলকারী জাহমীয়া এবং আল্লাহর সিফাতের উপমা পেশকারী মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে।

জাহমীয়াদের ইমাম জাহাম বিন সাফওয়ান আত্ তিরমিযীর দিকে নিসবত করে জাহমীয়া সম্প্রদায়ের নাম রাখা হয়েছে। এরা আল্লাহ তা‘আলার সত্তাকে পবিত্র সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি তারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ বিশেষণগুলোকেও অস্বীকার করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ধারণাপ্রসূত দলীল হচ্ছে আল্লাহর জন্য নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করা হলে মাখলুকের সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যায়। তাই তারা সমস্ত নাম ও সিফাতকে বাতিল করে দিয়েছে। এ কারণেই তাদেরকে মুআত্তেলা তথা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ সিফাতসমূহকে বাতিলকারী সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র সত্তাকে অতি সুন্দর নাম ও সুমহান সিফাত থেকে মুক্ত করে ফেলেছে।

আর আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের সাথে তুলনাকারী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে মুশাব্বেহা সম্প্রদায় বলার কারণ হলো তারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। এমনকি আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে ফেলেছে এবং আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতগুলোকে মাখলুকের সাধারণ সিফাত সমূহের সাথে তুলনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত কথার অনেক উর্ধে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মাঝখানে। তারা আল্লাহর সিফাতগুলোকে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই সাব্যস্ত করেন। তারা আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনা করেনা এবং আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতগুলোর কোন উপমা ও দৃষ্টান্তও পেশ করেন না। সুতরাং তারা আল্লাহকে মাখলুকের সিফাত থেকে পবিত্র করতে গিয়েও বাড়াবাড়ি করেন না এবং তাঁর সুউচ্চ সিফাতগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়েও বাড়াবাড়ি করেন না। বরং তারা আল্লাহর সিফাতগুলো বাতিল করা ছাড়াই আল্লাহকে সকল ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত বৈশিষ্ট থেকে পবিত্র করেন এবং মাখলুকের সাথে তুলনা করা ব্যতীতই তারা আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করেন।

দ্বিতীয়ত: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর কর্মসমূহের ক্ষেত্রেও জাবরীয়া এবং কাদারীয়া সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝখানে। الجبر শব্দের দিকে নিসবত করে তাদের জাবরীয়া সম্প্রদায় হিসাবে নাম রাখা হয়েছে। কেননা তারা বলে: **إن العبد مجبور على فعله** অর্থাৎ বান্দা তার কর্মের উপর একান্ত বাধ্য। তার কোন স্বাধীনতা নেই। সুতরাং তারা আল্লাহর কর্মগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি বান্দার কোন কাজই নেই বলে ধারণা করেছে। তারা আরো মনে করেছে যে, বান্দারা কোন কাজই করে না। তাদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র কর্তা এবং বান্দার কর্মও আল্লাহ তা'আলাই করেন। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে

বান্দার সমস্ত নড়াচড়া এবং কর্ম একান্তই বাধ্যতামূলক। বান্দা যেই নড়াচড়া ও কর্ম সম্পাদন করে, তা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কম্পনের মতই। বান্দার কাজগুলো বান্দার দিকে কেবল রূপকার্থেই নিসবত করা হয়।

এবার কাদারীয়া সম্প্রদায়ের কথায় আসি। القدر শব্দের দিকে নিসবত করে তাদেরকে কাদারীয়া বলা হয়। তারা বান্দাদের জন্য তাদের কর্মসমূহ সাব্যস্ত করতে গিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে। তারা বলেছে, বান্দাই তার নিজের কর্মের স্রষ্টা। এতে আল্লাহর কোন ইচ্ছা নেই। সুতরাং তাদের ধারণায় বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন নয়, আল্লাহ তা নির্ধারণ করেন নি এবং তার ইচ্ছাও করেন নি। বরং বান্দারা নিজেদের স্বাধীন ও মুক্ত ইচ্ছাতেই তাদের কর্মসমূহ সম্পাদন করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছে, বান্দার জন্য এখতিয়ার ও ইচ্ছা রয়েছে। বান্দার কাজ বান্দার দ্বারাই সংঘটিত হয়। তবে সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করতে পারে না। সে কেবল উহাই করে, যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ "আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা সাফফাত ৩৭:৯৬) এখানে বান্দাদের জন্য কর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেই কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ "তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না"। এই আয়াতে বান্দাদের জন্য এমন ইচ্ছা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার পরে হয়। কাদার তথা তাকদীরের মাসআলা আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা অচিরেই সামনে আসছে ইনশা-আল্লাহ।

তৃতীয়ত: আল্লাহর অঈদ বা শাস্তির ভয় দেখানোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যমপন্থী। الوعيد অর্থ হচ্ছে আযাবের ভয়

দেখানো। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐসব আয়াত ও হাদীস, যাতে পাপীদের জন্য আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। শাইখুল ইসলামের উক্তি: **بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم** এর তাৎপর্য হলো আল্লাহর অঙ্গীদের (শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের) ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে মুরর্জিয়া এবং কাদারীয়াদের ওয়াঈদীয়া ফির্কার লোকদের অবস্থানের মাঝামাঝি। الإرجاء শব্দের দিকে নিসবত করে তাদেরকে المرجئة বলা হয়। الإرجاء অর্থ পিছিয়ে দেয়া বা বের করে দেয়া। তারা যেহেতু আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না, তাই তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। তারা মনে করে কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তি ফাসেক নয়। তারা আরো বলে যে, ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর নয়। যেমন কাফের অবস্থায় সৎকাজ করলে সৎকাজ কোন উপকারে আসবে না।

সুতরাং তাদের নিকট কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার। সে শাস্তির সম্মুখীন হবে না। তারা কবীরাহ গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম লাগাতে গিয়ে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। এমনকি তাদের ধারণায় পাপাচারের কারণে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না এবং কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তির উপর ফাসেক হওয়ার হুকুমও লাগানো যাবে না।

আর ওয়াঈদীয়া সম্প্রদায়ের মতে গুনাহগারের জন্য শাস্তির যেই ধমক এসেছে, তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ব্যাপারে তারা আরো কড়াকড়ি করে বলেছে যে, সে যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। দুনিয়ার হুকুমে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে।

কিন্তু কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় ফির্কার লোকদের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলেন যে, কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তি অপরাধী এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। তার ঈমানেও কমতি আসবে এবং তাকে ফাসেক বলা হবে। মুরজিয়াদের ন্যায় তারা কবীরা গুনাহ্কারীকে পূর্ণ ঈমানদার বলে না। সে শাস্তি থেকে

সম্পূর্ণ নিরাপদ এ কথাও বলে না। কিন্তু সে ঈমানের গন্ডি থেকে বের হবেনা এবং কিয়ামাতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সেখানে চিরকাল থাকবেনা। তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে অপরাধের পরিমাণ মোতাবেক তাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর সে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওয়াঈদীয়া সম্প্রদায়ের মত এ কথা বলেনা যে, ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে এবং পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।

সুতরাং মুরজিয়ারা শুধু ঐসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে ঈমান আনলেই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই) জান্নাতে যাওয়া যাবে বলে ওয়াদা করা হয়েছে। আর ওয়াঈদীয়ারা (খারেজী ও মুতাযেলারা) কেবল ঐসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, পাপাচারে লিপ্ত হলে জাহান্নামে যেতে হবে।

কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উভয় প্রকার দলীলকে একত্র করেছেন এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন।

চতুর্থত: ঈমান ও দ্বীনের বিভিন্ন পরিভাষাতেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে কাফের বলা, মুসলিম বলা এবং ফাসেক বলার ক্ষেত্রেও তারা মধ্যমপন্থী। দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহগারদেরকে কি রকম শাস্তি দেয়া হবে, তাতেও তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান হারুরী ও মুতাযেলা এবং মুরজিয়া ও জাহমীয়াদের অবস্থানের মাঝখানে। হারুরীরাই খারেজী। হারুরা নামক স্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে হারুরী বলা হয়। হারুরা ইরাকের একটি গ্রামের নাম। আলী ﷺ এর পক্ষ ত্যাগ করে তারা হারুরা নামক গ্রামে একত্রিত হয়েছিল। এই জন্যই তাদেরকে হারুরী বলা হয়।

ওয়াসেল বিন আতার অনুসারীদেরকে মুতাযেলা বলা হয়। মুসলিমদের কেউ কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত হলে তার হুকুম কী হবে, এই মাসআলায় তার মাঝে এবং হাসান বসরী ﷺ এর মাঝে মতভেদ হওয়ার কারণে ওয়াসেল

প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করেছিল। পরবর্তীতে ওয়াসেলের অনুসারীরাও হাসান বসরীর দারস ত্যাগ করে ওয়াসেলের সাথে যোগ দেয়। এতে হাসান বসরী বললেন: إنه قد اعتزلنا অর্থাৎ ওয়াসেল আমাদের মজলিস পরিত্যাগ করেছে। ইমাম হাসান বসরী ﷬ এর এই কথা থেকেই তাদেরকে মুতাযেলা বলা হয়।

কবীরা গুনাহয় লিপ্ত মুসলিমের হুকুমের ব্যাপারে খারেজী ও মুতাযেলাদের মাযহাব অত্যন্ত কঠোর। তারা তাকে ইসলামের বাইরে বলে হুকুম লাগিয়েছে। অতঃপর মুতাযেলারা বলেছে, সে মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; বরং সে ঈমান এবং কুফুরী, -এই দুই স্তরের মাঝখানে অবস্থান করবে।

আর খারেজীরা বলেছে যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তবে উভয় দল পরকালের হুকুমে একমত হয়ে বলেছে যে, কবীরা গুনাহকারী যদি সেই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

মুরজিয়া ও জাহমীয়াদের অবস্থান খারেজী ও মুতাযেলাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তির উপর হুকুম লাগাতে গিয়ে তারা চরম শৈথিল্য ও ঢিলামি করেছে এবং তার সাথে সহনশীলতা প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করেছে। মুরজিয়াদের কথা হচ্ছে لايضر مع الإيمان معصية অর্থাৎ ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচার কোন ক্ষতি করে না। কেননা তাদের মতে শুধু অন্তরের সত্যায়নকে ঈমান বলা হয়। তবে তাদের কারো মতে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে জবানের উচ্চারণও জরুরী। কিন্তু তাদের কেউ এই কথা বলেনি যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভূক্ত হবে। তাই তাদের মতে আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বাড়েনা এবং পাপাচারের মাধ্যমে উহা কমেনা। সুতরাং পাপাচার ঈমানকে কমিয়ে দেয়না এবং পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তিরও হকদার হয় না। বিশেষ করে যখন পাপাচারকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত না হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় দলের তুলনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। তারা বলেছে পাপাচারী পাপাচারে

লিপ্ত হলেই ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। ফলে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর ইচ্ছা করলে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিবেন। কিন্তু শাস্তি দেয়া হলেও চিরকাল জাহান্নামে রাখা হবে না। যেমন বলে থাকে খারেজী এবং মুতাযেলারা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বলে যে, পাপাচার ঈমানের মধ্যে কমতি আনয়ন করে এবং পাপাচারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশের যোগ্য হয়ে যায়। তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলে সে কথা ভিন্ন। আর কবীরা গুনাহকারী ফাসেক হয়ে যাবে এবং তার ঈমানও ত্রুটিপূর্ণ হবে। তারা মুরজিয়াদের ন্যায় কবীরা গুনাহকারীকে কামেল (পূর্ণ) ঈমানদার বলে না।

পঞ্চমত: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রসূল ﷺ সাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযী ও খারেজীদের তুলনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, **هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك** "যে নাবী ﷺ এর সাথে ঈমানদার অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছে এবং ঈমান অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে"।

রাফেযী নামটি الرفض থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাফয্ অর্থ বর্জন করা, পরিত্যাগ করা। শিয়াদেরকে রাফেযী বলার কারণ হলো, তারা তাদের অন্যতম ইমাম যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইনকে বললেন, আপনি আবু বকর ও উমারের নাম উচ্চারণের পর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা বর্জন করুন। অর্থাৎ তাদের ফাযীলত, প্রশংসা ও সুনাম বলা বর্জন করুন। আলী বিন হুসাইন তখন বললেন, معاذ الله অর্থাৎ এরূপ করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এতে তারা যায়েদকেই পরিত্যাগ করলো। এ জন্যই তাদেরকে রাফেযী (পরিত্যাগকারী) হিসাবে নাম রাখা হয়েছে।

সাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযীদের মাযহাব হচ্ছে, তারা আলী বিন আবু তালিব এবং আহলে বাইতের ফাযীলত বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করে থাকে এবং তাদেরকে অন্যসব সাহাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়,

তারা বাকীসব সাহাবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। বিশেষ করে তিন খলীফা অর্থাৎ আবু বকর, উমার এবং উছমান ﵃ কে তারা শত্রু মনে করে, তাদেরকে গালি দেয় এবং তাদের উপর লা’নত বর্ষণ করে। কখনো কখনো তারা কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত বাকী সবাইকে অথবা কতিপয় সাহাবীকে কাফের বলে।

খারেজীরা শিয়া ও রাফেযীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আলী ﵁ কে এবং তাঁর সাথে অনেক সাহাবীকেই কাফের বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে ও তাদের জান-মাল হালাল করেছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা রাফেযী এবং খারেজী এই উভয় দলের বিরোধী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা সমস্ত সাহাবীর সাথেই বন্ধুত্ব রাখে। কারো প্রতি ভালবাসা পোষণে বাড়াবাড়ি করে না; বরং সকল সাহাবীর ফাযীলাত ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা নাবী ﷺ পরে সাহাবীদেরকেই এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করে। এ বিষয়ে সামনে আরো বিবরণ সামনে আসছে।

وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لاتنافي بينهما

এই বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপরে সমুন্নত, আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং সকল মাখলুকের সাথে। মাখলুকের উপরে হওয়া এবং তাদের সাথে থাকা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

فصل: وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ الإِيْمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَن رَّسُولِهِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؟ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَهُوَ مَعَكُمْ) أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ، اللُّغَةُ، بَلِ الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرُ الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهِم... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَّعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

অনুচ্ছেদ: ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টি উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, রসূল ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে (প্রচুর সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে) যা বর্ণিত হয়েছে এবং এই উম্মতের সালাফগণ যেসব বিষয়ের উপর একমত হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে

শামিল। তার মধ্যে এও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত আরশের উপর এবং সকল মাখলুকের উপর। সেই সাথে তিনি মাখলুকের সাথেও। তারা যেখানেই থাকে না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথেই। তারা যা আমল করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতে মাখলুকের উপরে থাকা এবং তাদের সাথে থাকাকে একসাথে একত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে, তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সাথেই"।

وَهُوَ مَعَكُمْ 'তিনি তোমাদের সাথেই' এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথে মিশে রয়েছেন। আরবী ভাষা এই অর্থকে আবশ্যক করেনা। আল্লাহ্ মাখলুকের সাথে মিশে আছেন, এই ধারণা এই উম্মাতের সালাফদের ইজমার পরিপন্থী এবং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেই ফিতরাত (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তারও খেলাফ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অথচ আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম উদাহরণ, চন্দ্র আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন, আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্য হতে ক্ষুদ্র সৃষ্টিসমূহের অন্যতম। ইহাকে রাখা হয়েছে আসমানে। তারপরও চাঁদ ভ্রমণকারীর সাথেও থাকে এবং গৃহে অবস্থানকারীর সাথেও থাকে। ভ্রমণকারী যেখানে অবতরণ করে এবং যেখানেই চলে চাঁদ তার সাথেই থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপরে থেকেও মাখলুকের নিকটে। তাদের রক্ষক, তাদের সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রুবুবীয়াতের

অন্যান্য সিফাতের মাধ্যমে তিনি মাখলুকের উপরে এবং তাদের অতি নিকটে।

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷀ বিশেষভাবে দু'টি মাস'আলা বর্ণনা করেছেন।

(১) আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া এবং

(২) তাঁর মাখলুকের সাথে থাকা।

শাইখুল ইসলাম একটি সন্দেহ দূর করার জন্য বিশেষভাবে এ দু'টি মাস'আলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে থাকা এবং সৃষ্টির সাথে থাকার বিষয়টিকে কেউ কেউ পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করতে পারে। আবার কেউ এই ধারণাও করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথেই, এর মানে হচ্ছে আল্লাহর সিফাতগুলো মাখলুকদের সিফাতের মতই এবং তিনি আমাদের সাথে একদম মিশে আছেন। যেমন এক মাখলুক অন্য মাখলুকের সাথে মিশে থাকে। সুতরাং প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সমস্ত সৃষ্টির উপরে আরশের উপর সমুন্নত হয়ে আবার সৃষ্টির সাথে না মিশে তাদের অতি নিকটবর্তী হন কিভাবে?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷀ এই সন্দেহের একাধিক জবাব দিয়েছেনঃ

প্রথম জবাবঃ আরবদের যেই ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে তা এই অর্থকে আবশ্যক করে না। কেননা مع শব্দটি ভাষাগত দিক থেকে সাধারণ সান্নিধ্য ও নিকটত্ব অর্থ প্রদান করে; সহাবস্থান, সংমিশ্রণ, লাগালাগি এবং সংস্পর্শ ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে না। কেননা আপনি বলে থাকেন, **زوجتي معي** আমার স্ত্রী আমার সাথেই। অথচ এই কথা বলার সময় আপনি থাকেন একস্থানে, আপনার স্ত্রী থাকে অন্য স্থানে। আপনারা আরো বলে থাকেন, **مازلنا نسير والقمر معنا** আমরা পথ চলছিলাম, চাঁদ আমাদের সাথেই ছিল।

অথচ চাঁদ থাকে আসমানে, থাকে মুসাফিরের সাথে এবং থাকে স্বদেশে অবস্থানকারীর সাথেও। সাধারণ একটি সৃষ্টি চাঁদের ব্যাপারে যদি এটি বলা সঠিক হয়, তাহলে যেই মহান স্রষ্টা সবচেয়ে বড় তাঁর শানে এটি বলা কেন জায়েয হবে না যে, তিনি আসমানের উপরে আরশের উপর থেকেও আমাদের সাথে?

দ্বিতীয় জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথে একদম মিশে আছেন, এই কথা উম্মতের সালাফে সালেহীন তথা সাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের অনুসারীদের ইজমার পরিপন্থী। অথচ তারা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং উত্তম আদর্শ। তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত, সকল সৃষ্টির উপরে এবং তাদের থেকে আলাদা। তারা আরো একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইলমের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ **وهو معكم** এর ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথেই।

তৃতীয় জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে নন বরং তাদের সাথে মিশে আছেন, -এই কথা মানুষের ঐ স্বভাব-প্রকৃতির দাবীর পরিপন্থি, যা দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যেই স্বভাব স্থাপন করেছেন, এই বিশ্বাস তার বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা যে মাখলুকের উপরে, সৃষ্টিগত স্বভাব অনুযায়ী মাখলুক এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করে। মানুষ বিপদাপদ ও সঙ্কটময় মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়ার সময় উপরের দিকে অন্তরকে ধাবিত করে। ডান দিকে কিংবা বাম দিকে দৃষ্টিপাত করেনা। এ বিষয়ে কারো দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। এটি কেবল ঐ সৃষ্টিগত স্বভাবের দাবীতেই করে থাকে, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থত জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যে সংবাদ দিয়েছেন এবং রসূল ﷺ মুতাওয়াতির সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে, এই ধারণা তার বিপরীত। কুরআন ও হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির

উপরে এবং আরশেরও উপরে। সেই সাথে তিনি সৃষ্টির সাথেও তারা যেখানেই থাকুক না কেন। মুতাওয়াতির হাদীস,

هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء

যার সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একদল রাবী তাদের অনুরূপ আরেক দল রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, মিথ্যার উপর যাদের একমত হওয়া সাধারণত অসম্ভব হয়।

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে এবং তাদের সাথে, -এ বিষয়ে অনেক আয়াত এবং বহু হাদীস রয়েছে। সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াত তার মধ্যে অন্যতম, যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ উপরে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম বলেন: وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِم আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে থেকেও মাখলুকের নিকটে। তাদের পর্যবেক্ষক এবং তাদের সম্পর্কে অবগত: এখানে তিনি পূর্বের কথাকেই পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন। এর পূর্বে তিনি বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশের উপরে এবং মাখলুকের সাথে। এখানেও তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম সমূহের মধ্য হতে الرقيب (পর্যবেক্ষক) এবং المهيمن (সংরক্ষক) -এই নাম দু'টি উল্লেখ করে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটেই। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১ নং আয়াতে বলেন:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া নজর রাখেন"।

এখানে رقيب অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর বান্দাদের সকল অবস্থার পর্যবেক্ষণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর বান্দাদের নিকটে।

আল্লাহ তা‘আলা সূরা হাশরের ২৩ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ﴾

“আল্লাহই সেই মহান সত্তা, যিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, অতীব পবিত্র, সকল দোষ-ক্রটি হতে মুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, হেফাযতকারী, পরাক্রমশালী, প্রবলশক্তিধর (শক্তির মাধ্যমে সবকিছুকে সংশোধনকারী) এবং অতীব মহিমান্বিত”।

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَّعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ. আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রুবুবীয়াতের অন্যান্য সিফাতের মাধ্যমে তিনি মাখলুকের উপরে এবং তাদের অতি নিকটে:

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার রুবুবীয়াতের দাবী হচ্ছে তিনি স্বীয় সত্তাসহ সব সৃষ্টির উপরে, তিনি বান্দাদের সকল কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত। সেই সাথে তিনি তাঁর ইলমের মাধ্যমে তাদের অতি নিকটে এবং তিনি তাদেরকে সকল দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি তাদের সকল বিষয় পরিচালনা করেন, তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবং তার বিনিময় প্রদান করেন।

مايجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه وتعالى ومعنى كونه سبحانه وتعالى في السماء وأدلة ذلك

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে এবং মাখলুকের সাথে থাকার ব্যাপারে যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, তিনি আসমানে থাকার অর্থ ও এর দলীলসমূহ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ مِثْلِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ : (فِي السَّمَاءِ) أَنَّ السَّمَاءَ تُظِلُّهُ أَوْ تُقِلُّهُ ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) وَهُوَ الذي (يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি আরশের উপরে। আরো বলেছেন যে, তিনি আমাদের সাথে। প্রকৃতপক্ষেই তিনি আরশের উপরে এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি আমাদের সাথে। এইসব কথার তাহরীফ (পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন) করার প্রয়োজন নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার কালামকে বাতিল ধারণা থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন في السماء অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানে, এই কথা থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করে আছে অথবা আসমান আল্লাহকে ঢেকে রেখেছে ও ছায়া দিচ্ছে। আলেম ও মুমিনদের সর্ব সম্মতিক্রমে এই কথা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। (সূরা বাকারা ২:২৫৫)

তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে অনড় রেখেছেন, যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়। (সূরা ফাতির ৩৫:৪১)

আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন, যার ফলে তাঁর হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর উপর পতিত হয় না"। (সূরা হজ্জ ২২:৬৫)

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমেই সুপ্রতিষ্ঠিত"। (সূরা রূম ৩০:২৫)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে যেই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপরে এবং তিনি আমাদের সাথেও, এ বিষয়ে যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, শাইখুল ইসলাম এখানে তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেমন সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপরে এবং তিনি আমাদের সাথেও, উহার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। এই কথার তাবীল (ব্যাখ্যা) করা জায়েয নয় এবং উহার বাহ্যিক অর্থকে পরিবর্তন করাও বৈধ নয়। যেমন ব্যাখ্যা করে থাকে জাহমীয়াদের মুআত্তিলা সম্প্রদায় এবং মুতাযেলা ও তাদের অনুরূপ ফির্কার লোকেরা। তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষে আরশের উপরে সমুন্নত নন; বরং আরশের উপর সমুন্নত হওয়া মাজায তথা রূপকার্থবোধক। তাই তারা **الاستواء على العرش** আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকে যে, **الاستيلاء على الملك** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজত্ব দখল করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, এই কথার ব্যাখ্যায় তারা বলে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে **علو القهر والقدرة** অর্থাৎ আল্লাহর প্রতাপ, শক্তি ও তাঁর ক্ষমতা সকলের উপরে। তারা অনুরূপ আরো এমন বাতিল ব্যাখ্যা করে থাকে, যা আল্লাহ তা'আলার কালামকে তার আসল অর্থ থেকে স্থানান্তরের শামিল।

বিদ'আতীদের কেউ কেউ বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে, এই কথার অর্থ হচ্ছে তিনি সর্বত্র বিরাজমান, উপস্থিত এবং তিনি প্রত্যেক স্থানেই রয়েছেন। যেমন বলে থাকে জাহমীয়াদের সর্বেশ্বরবাদী সম্প্রদায় এবং অন্যরা। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলার এ সম্পর্কিত কালামকে বাতিল ধারণা থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন في السماء অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানে, এই কথা থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করে আছে অথবা আসমান আল্লাহকে ঢেকে রাখছে ও ছায়া দিচ্ছে: এখানে تقله অর্থ হচ্ছে تحمله 'তাকে বহন করছে'। আর تظله মানে تستره 'তাকে ঢেকে রেখেছে'। الظلة 'ছায়া' বলা হয় ঐ জিনিসকে, যা তোমাকে উপরের দিক থেকে ঢেকে রাখে। আল্লাহ তা'আলা আসমানে থাকার অর্থ এই নয় যে, আসমান তাঁকে বহন করছে, (নাউযুবিল্লাহ) এবং আসমান তাঁকে ঢেকে রেখেছে ও ছায়া দিচ্ছে। যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করবে, সে দুই কারণে মারাত্মক ভুলের মধ্যে পতিত হবে।

প্রথম কারণ: আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করছে অথবা আল্লাহ তা'আলাকে ঢেকে রেখেছে, এই ধারণা আলেমদের ও ঈমানদারদের ইজমার পরিপন্থী। আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে এবং তাঁর সৃষ্টির বাইরে বা তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে মাখলুকের কোন স্বভাব নেই এবং সৃষ্টির মধ্যেও তাঁর যাতের কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ﴾

"তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না? (সূরা মুলক ৬৭:১৬-১৭)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এখানে আসমান দ্বারা যদি আমাদের উপরে নির্মিত আসমান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে في হরফে জারটি **على** অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ **على السماء** 'আল্লাহ

তা‘আলা আসমানের উপরে’। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

“এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডের মধ্যে শুলিবিদ্ধ করবো”। এখানেও فِي হারফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডের উপর শুলিবিদ্ধ করবো।

আর যদি **السماء** দ্বারা **العلو** (উপর) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে **في السماء** অর্থ হবে في العلو অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা উপরে। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

দ্বিতীয় কারণ: আসমান আল্লাহ তা‘আলাকে বহন করছে এবং আসমান তাঁকে ঢেকে রেখেছে, এই ধারণা কুরআনের ঐসব সুস্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী, যা আল্লাহ তা‘আলার বড়ত্ব ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর অমুখাপেক্ষীতার প্রমাণ করে। বরং সকল সৃষ্টিই আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

“আল্লাহ তা‘আলার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে” (সূরা বাকারা ২:২৫৫)।

আরশের মধ্যে কুরসী একটি বিশাল সৃষ্টি। ইহা আসমান ও যমীনের চেয়ে বড়। আরশ কুরসীর চেয়েও অনেক বড়। আসমান ও যমীনসমূহ যদি কুরসীর চেয়ে ছোট হয়, কুরসী যদি আরশের চেয়ে ছোট হয় এবং আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু সবকিছু থেকে বড়, তাহলে আসমান কিভাবে আল্লাহকে তার নিজের মধ্যে পুরে রাখবে বা তাঁকে বহন করবে অথবা ছায়া দিবে কিংবা ঢেকে রাখবে? আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ﴾

“আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় রেখেছেন। আসমান ও যমীন যদি স্বীয় স্থান থেকে সরে যায়, তাহলে আল্লাহর পরে আর কেউ তাদেরকে স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে না”। (সূরা ফাতির ৩৫:৪১) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

“আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন, যার ফলে তাঁর হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর উপর পড়ে যায় না”। (সূরা হাজ্জ ২২:৬৫)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমেই সুপ্রতিষ্ঠিত” (সূরা রূম ৩০: ২৫)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আসমান ও যমীন আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহই আসমানকে ধরে রেখেছেন, যাতে উহা স্বীয় স্থান থেকে সরে না যেতে পারে এবং তিনি আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে উহা যমীনের উপর পড়ে না যায়। একমাত্র আল্লাহর আদেশেই আসমান দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং ইহা জানার পর এই কথা বোধগম্য নয় যে, আল্লাহ তা‘আলা আসমানের প্রতি মুখাপেক্ষী এবং আসমান তাঁকে বহন করছে কিংবা ছায়া দিচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা এ বাতিল ধারণার অনেক উর্ধ্বে।

وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لاينافي علوه وفوقيته

এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী। সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা জরুরী যে, তাঁর মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া উপরে থাকার পরিপন্থী নয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ বলেন:

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ) وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের অতি নিকটবর্তী হন এবং তিনি তাদের আহবানে সাড়া দেন। আল্লাহ তা'আলার এই সিফাত দু'টির প্রতি বিশ্বাস করা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তিনি নিজেকে যেসব সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত করেছেন, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করার মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'টি সিফাতকে অর্থাৎ মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের আহবানে সাড়া দেয়াকে একই আয়াতে একত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

"আর হে নাবী! আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকের জবাব দেই " (সূরা বাকারা ২:১৮৬) নাবী ﷺ বলেন:

إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

“তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও অধিক নিকটে”।[৪৫]

আল্লাহ তা‘আলা মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহয় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐসব আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী নয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি মাখলুকের উপরে রয়েছেন। কেননা আল্লাহর সমস্ত সুউচ্চ সিফাতের কোনো সৃদশ নেই। তিনি নিকটে থেকেও সৃষ্টির উপরে এবং উপরে থেকেও তাদের নিকটে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির উপরে এবং তিনি স্বীয় আরশের উপর সমুন্নত। পূর্বোক্ত অধ্যায়সমূহে শাইখুল ইসলাম দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে ইহা প্রমাণ করার পর এই অধ্যায়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা উপরে, এই বিশ্বাসের সাথে আরো বিশ্বাস করা জরুরী যে, তিনি মাখলুকের অতি নিকটে। আল্লাহ তা‘আলা মাখলুকের নিকটে, এই কথা বিশ্বাস করাও আল্লাহ তা‘আলার প্রতি এবং আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মাখলুকের অতি নিকটে এবং তিনি মাখলুকের দু‘আ শ্রবণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা এ দু’টি বিশেষণকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নিকটে থাকা ও দু‘আ শ্রবণ করা, এ দু’টি বিশেষণ আল্লাহ তা‘আলা সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

“আর হে নাবী! আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই। যে

৪৫ . সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১৯৫৯৯, সহীহ মুসলিম ২৭০৪, আবূ দাউদ ১৫২৬ ।

আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের উচিৎ আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপর ঈমান আনয়ন করা। এতে আশা করা যায় যে, তারা সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে"।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক লোক নাবী ﷺ নিকট আগমন করল। সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকটে যে, আমরা তাঁকে নিরবে ডাকবো? না কি তিনি আমাদের থেকে অনেক দূরে যে, উঁচু আওয়াজে ডাকবো?

নাবী ﷺ তার এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: فإني قريب আমি আহবানকারীর অতি নিকটে। সে যখন আমাকে ডাকে, আমি তখন তার ডাকে সাড়া দেই।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, দু'আ চুপিসারেই করা উচিৎ। দু'আতে আওয়াজ উঁচু করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

"তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও অধিক নিকটে"। এই হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ব্যক্তি দু'আ করে, তিনি জবাব দেয়ার মাধ্যমে তার নিকটবর্তী হন। এই নিকটবর্তী হওয়া আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকার পরিপন্থী নয়। এ জন্যই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্য় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐসব আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী নয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি মাখলুকের উপরে রয়েছেন। কেননা সবগুলোই সত্য। সত্য বিষয় কখনো পরস্পর বিরোধী হয় না। আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ সিফাতের কোন সদৃশ নেই।

আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ব্যাপারে এই কথা বলা যাবে না যে, তিনি যখন সৃষ্টির উপরে থাকবেন, তখন মাখলুকের সাথে থাকেন কিভাবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণেই এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ভুল ধারণাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সাথে কিয়াস করা। এই কিয়াস বাতিল। কেননা **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** আল্লাহ তা'আলার কোন সদৃশ নেই।

অতএব একই সাথে উপরে ও নিকটে থাকা আল্লাহ তা'আলার সুমহান সিফাতের মধ্যে মিলিত হতে পারে। কেননা তিনি সর্বাধিক মহান, সবেচেয়ে বড়, মহামহিম এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। একজন বান্দার হাতে একটি সরিষার দানা যেমন, বিশাল বিশাল সাতটি আসমান আল্লাহ তা'আলার হাতের মধ্যে ঠিক ঐ পরিমাণ স্থান দখল করে। সুতরাং যার বড়ত্বের কিছু দিক এ রকমই, তিনি কত বড়!! যিনি এত বড়, তাঁর জন্য আরশের উপরে থাকা এবং যখন ইচ্ছা আরশের উপরে থেকেই মাখলুকের নিকবর্তী হওয়া কিভাবে অসম্ভব হতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা **علي في دنوه قريب في علوه** "নিকটে থেকেও উপরে এবং উপরে থেকেও নিকটে"। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো এ কথারই প্রমাণ করে। এই কথার উপর মুসলিম মিল্লাতের আলেমগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সুমহান সিফাত হচ্ছে **عَلِيٌّ في دنوه** "তিনি মাখলুকের নিকটে থাকা অবস্থায়ও উপরে থাকেন" এবং **قريب في علوه** "আরশের উপরে থাকা অবস্থায়ও মাখলুকের নিকটে থাকেন"।

وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة

এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার কালাম।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ বলেন:

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةً لَا كَلَامُ غَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ عِبَارَةٌ بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانِي وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এবং তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করার মধ্যে এ বিশ্বাস করাও শামিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। উহা আল্লাহর কালাম ও সিফাত, মাখলুক নয়। উহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং আখেরী যামানায়[৪৬] তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন। এ কুরআন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল করেছেন। উহা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম; অন্যের কালাম নয়।

---

৪৬. আখেরী যামানায় এক রাতেই কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন মানুষের অন্তর এবং মুসহাফ থেকে কুরআন উঠে যাবে। তাদের অন্তরে ও মুসহাফে কুরআনের কোন অংশই অবশিষ্ট থাকবে না। পৃথিবী তখন পাপাচারে ভরে যাবে। এমনকি আল্লাহ আল্লাহ বলার মত কোন লোক থাকবে না। তখন সেই নিকৃষ্ট লোকদের উপর কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয হবে না যে, এটি কেবল আল্লাহর কালামের বিবরণ অথবা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় যে কালাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা প্রকাশের মাধ্যম। মানুষ এটি পাঠ করলেই কিংবা কাগজে লিখলেই তা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কালাম হতে বের হয়ে যায় না। কেননা কোন কালাম সর্বপ্রথম যার নিকট থেকে শুরু হয়, ঐ কালামকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে যে উক্ত কালামকে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তার দিকে সেই কালামের সম্বন্ধ হয় না। কুরআনের অক্ষরগুলো এবং অর্থসমূহ আল্লাহ তা'আলারই কালাম। কুরআনের মর্মার্থগুলো ব্যতীত শুধু অক্ষরগুলোই যে আল্লাহর কালাম, তা নয় এবং উহার অক্ষরগুলো ছাড়া শুধু মর্মার্থগুলোই যে তাঁর কালাম, তাও নয়; বরং অক্ষরসমূহ এবং মর্মার্থসমূহ মিলেই আল্লাহর কালাম।

....

ব্যাখ্যা: পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের রূকনসমূহের অন্যতম। ঈমানের এ দু'টি মূলনীতির মধ্যে এ বিশ্বাসও শামিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আল্লাহর সুমহান সিফাতগুলোর প্রতি ঈমানকেও শামিল করে। আল্লাহর কালাম তাঁর সুমহান সিফাতসমূহের মধ্যেই গণ্য। কালামকে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। সিফাতকে তার মাউসুফের দিকে ইযাফাত করার যে নিয়ম রয়েছে, এটি হচ্ছে সেই নিয়মের ইযাফত। আল্লাহর সিফাতসমূহ মাখলুক নয়। সুতরাং আল্লাহর কালামও মাখলুক নয়।

অনেক ফির্কা এই মাসআলায় মতভেদ করেছে। তাদের মতে কুরআন মাখলুক। (নাউযুবিল্লাহ)। যারা কুরআনকে মাখলুক বলে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ তাদের কতিপয়ের মত এ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

এক. জাহমীয়াদের মতামত: তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন না। তিনি অন্যের মধ্যে কালাম সৃষ্টি করেছেন। সেই কালামকেই তার দিকে সম্বন্ধ করে বর্ণনা করা হয়। তাই তাদের মতে রূপক অর্থে

আল্লাহ তা'আলার দিকে কালামের সম্বন্ধ করা হয়, প্রকৃত অর্থে নয়। কেননা তিনি কালাম সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি কথা বলেন মানে অন্যের মধ্যে কথা সৃষ্টি করেন।

আল্লাহর কালাম সম্পর্কে এই কথা বাতিল। এই কথা কুরআন ও হাদীসের দলীল বিরোধী এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য নয়। সালাফদের কথা এবং মুসলিমদের ইমামগণের মতেরও বিরোধী। কেননা প্রকৃতপক্ষে যে কথা বলতে পারে না অথবা যার গুণাবলীর মধ্যে 'কথা বলা' বিশেষণ নেই, তাকে متكلم (বক্তা) বলা হয় না। সুতরাং কিভাবে এই কথা বলা যেতে পারে যে, قال الله "আল্লাহ বলেছেন", অথচ বাস্তবে এর প্রবক্তা আল্লাহ তা'আলা নন; বরং অন্য কেউ? কিভাবেই বা এটি বলা জায়েয হতে পারে যে, هذا كلام الله "এটি আল্লাহর কালাম", অথচ বাস্তবে তা অন্যের কালাম; আল্লাহর নয়?!

শাইখুল ইসলাম বলেন, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শুরু হয়েছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন। তিনি এ কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল করেছেন, উহা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কালাম; অন্যের কালাম নয়ঃ এই বক্তব্যের মাধ্যমে শাইখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাহমীয়া ফির্কার প্রতিবাদ করা। তারা বলে, কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে শুরু হয়েছে এবং তিনি কুরআনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কথা বলেননি; বরং রূপক অর্থে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলা হয়েছে। অথচ উহা অন্যের কালাম। আল্লাহর দিকে কুরআনকে সম্বন্ধ করার কারণ হলো, উহা আল্লাহর সৃষ্টি।

কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে শুরু হয়েছে, এ কথার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা থেকেই তা বের হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি এর মাধ্যমে কথা বলেছেন। এখানে مِنْ হরফে জারটি সীমানার শুরু বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

তাঁর দিকেই ফিরে যাবেঃ অর্থাৎ কুরআন পুনরায় আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। কেননা আখেরী যামানায় কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। মানুষের অন্তরে কুরআনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং কাগজেও লিখা থাকবে না। এটি কিয়ামাতের অন্যতম আলামত।

অথবা কুরআন আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, এ কথার অর্থ এটাও হতে পারে যে, কুরআনকে কেবল আল্লাহর দিকেই সম্বন্ধ করা হবে।

দুই. কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মতঃ অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ বিন কুল্লাবের অনুসারী কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তারা বলে কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালামের বিবরণ। তাদের মতে, **كلام الله هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم** "আল্লাহর কালাম বলতে এমন মর্মার্থ উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে যুক্ত। আল্লাহর হায়াত এবং ইলমের মতই এটি তাঁর সত্তার জন্য আবশ্যক। আল্লাহর কালাম তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে এই মর্মার্থটি মাখলুক তথা সৃষ্টি নয়। অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দমালা এবং সেগুলো উচ্চারণের আওয়াজসমূহ সৃষ্টি। এগুলো আল্লাহর কালামের হেকায়াত (বিবরণ); এগুলো হুবহু আল্লাহর কালাম নয়।

তিন. আশায়েরাদের মতঃ আবুল হাসান আল-আশআরী এর অনুসারীগণ বলে থাকে, কুরআন আল্লাহর কালাম প্রকাশের ইবারাত বা মর্মার্থ ও তাৎপর্য। সুতরাং তাদের মতে আল্লাহর কালাম হচ্ছে এমন এবারত বা মর্মার্থ ও তাৎপর্য, যা আল্লাহর পবিত্র সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আর এই মর্মার্থ ও তাৎপর্য মাখলুক নয়। আমরা যেই শব্দগুলো পাঠ করি, তা আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মর্মাথ ও তাৎপর্যেরই নাম। আমাদের দ্বারা পঠিত শব্দগুলো মাখলুক। এগুলো আল্লাহর কালামের বিবরণ, এই কথা বলা যাবে না।

কোন কোন আলিম বলেছেন, কুরআনের ব্যাপারে আশায়েরা এবং কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ শুধু শাব্দিক। এই মতভেদে কোন

লাভ নেই। আশায়েরা এবং কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে, কুরআন দুই প্রকার। শব্দমালা এবং অর্থসমূহ। কুরআনের শব্দগুলো মাখলুক। কুরআনের মধ্যে যেই শব্দমালা রয়েছে, তা মাখলুক। আর কুরআনের অর্থগুলো কাদীম (অবিনশ্বর ও চিরন্তন) এবং তা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত কুরআনের সব অর্থ মিলে মূলতঃ একটি অর্থই প্রকাশ করে, তা বিভক্তিযোগ্য নয় এবং একাধিকও নয়। সে যাই হোক, উপরোক্ত মত দু'টি এক রকম না হলেও পরস্পর কাছাকাছি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ এ দু'টি মতকেই বাতিল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয হবে না যে, এটি কেবল আল্লাহর কালামের বিবরণ। যেমন বলে থাকে কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা অথবা এ কথাও বলা বৈধ হবে না যে, উহা আল্লাহর কালাম প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। যেমন বলে থাকে আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেনঃ মানুষ এটি পাঠ করলেই কিংবা কাগজে লিখলেই তা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কালাম হতে বের হয়ে যায় না। কুরআন আল্লাহর কালাম। যেখানেই কুরআন পাওয়া যাবে, উহার অক্ষরসমূহ এবং মর্মার্থসমূহ আল্লাহর কালাম বলেই গণ্য হবে। চাই তা মানুষের অন্তরে সংরক্ষিত থাকুক বা জবানের মাধ্যমে তেলাওয়াত করা হোক অথবা কাগজে লিখিত অবস্থায় থাকুক। উপরোক্ত কোন অবস্থাতেই কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কালামের বাইরে গণনা করা যাবে না।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালামের মধ্যে গণ্য হওয়ার দলীল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ কোন কালাম সর্বপ্রথম যার নিকট থেকে শুরু হয়, উহাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে যে উক্ত কালামকে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তার দিকে সেই কালামের সম্বন্ধ হয়না। কেননা যে ব্যক্তি মুবাল্লিগ বা প্রচারক হয়ে অন্যের কালাম পৌঁছিয়ে দেয়, তাকে কেবল মাধ্যম বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾

"আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। কেননা এরা একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়"।

এ আয়াতে যেই শ্রবণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল প্রচারকারীর মাধ্যমেই হতে পারে। অর্থাৎ প্রচারকের নিকট থেকেই, কেবল শ্রবণ করা সম্ভব। আর শ্রুত জিনিসকেই আল্লাহর কালাম হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, কোন কথা সর্বপ্রথম যে বলে, সেই কথাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়।

চার. মুতাযেলাদের মত: তারা বলে থাকে, কুরআনের অক্ষরগুলোই শুধু আল্লাহর কালাম। উহার মর্মার্থ ও তাৎপর্য আল্লাহর কালাম নয়। তাই তারা বলে থাকে, সাধারণভাবে যখন এই কথা বলা হবে, ইহা আল্লাহর কালাম, তখন শুধু শব্দ উদ্দেশ্য হবে। যাকে আল্লাহর কালাম বলে নাম দেয়া হয়েছে, তার দ্বারা শুধু শব্দই উদ্দেশ্য হবে, উহার মর্মার্থ কালামের অংশ হবে না; বরং আল্লাহ তা'আলার কালামের শব্দগুলো যা বুঝায়, উহা আল্লাহর কালাম নয়।

অতঃপর শাইখুল ইসলামের উক্তি: ولا الحروف دون المعاني উহার অক্ষরগুলো ব্যতীত শুধু মর্মার্থগুলোই আল্লাহর কালাম নয়, -এর মাধ্যমে মুতাযেলাদের মাযহাবের বিপরীত মত বর্ণনা করেছেন। যেমন কুল্লাবীয়া এবং আশায়েরাদের মাযহাব। যেমন একটু পূর্বে ব্যাখ্যাসহ তাদের মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে।

সঠিক মাযহাব হচ্ছে, অক্ষর এবং মর্মার্থগুলো সহকারেই কুরআন আল্লাহর কালাম। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত। আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা ইহাই সুসাব্যস্ত।

وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية

এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, মুমিনগণ কিয়ামাতের দিন এবং জান্নাতে প্রবেশের পর তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَبِرُسُلِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ بِهَا سَحَابٌ وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى

পূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এবং রসূলদের প্রতি ঈমানের যে বর্ণনা প্রদান করেছি, তার মধ্যে এ বিশ্বাস করাও শামিল যে, মুমিনগণ কিয়ামাতের দিন চোখ দিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। দিনের বেলায় পরিস্কার আকাশে সূর্যকে মেঘখন্ড আড়াল করে না রাখলে তারা যেমন সূর্যকে দেখতে পায় এবং পূর্ণিমার রাতে তারা যেমন চাঁদ দেখতে পায়, চাঁদ দেখতে যেমন তাদের কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলাকে তারা কিয়ামতের প্রশস্ত ময়দানে দেখতে পাবে। অতঃপর তারা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করার পরও দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা করবেন, সেভাবেই তিনি মুমিনদেরকে দেখা দিবেন।

ব্যাখ্যা: আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এবং নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে পরকালে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে, এ বিশ্বাসও শামিল হওয়ার কারণ হলো, তিনি তাঁর কিতাবে এবং রসূল তাঁর সুন্নাতে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি

তাতে বিশ্বাস করবে না, সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলদের প্রতি কুফরী করল। কেননা যারা আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি এবং আল্লাহর রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাদেরকে অন্যান্য যেসব বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছে, তারা তার সবগুলোতেই বিশ্বাস করে। **عِيَانًا** শব্দের আইন বর্ণে যের দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ তারা আসলেই আল্লাহকে খোলাখুলিভাবে দেখতে পাবে, তাতে কোন অস্পষ্টতা থাকবে না। কিয়ামাতের দিন আল্লাহকে দেখার বিষয়টি রূপকার্থক নয়। যেমন বলে থাকে আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতে অবিশ্বাসী মুআত্তেলা ফির্কার লোকেরা।

দিনের বেলায় আকাশ পরিস্কার থাকলে এবং কোন মেঘমালা সূর্যকে আড়াল না করে রাখলে তারা যেমন সূর্যকে দেখতে পায় এবং পূর্ণিমার রাতে তারা যেমন চাঁদ দেখতে পায়, চাঁদ দেখতে যেমন তাদের কোন অসুবিধা হয়না, তেমনি তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে: অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহকে দেখতে পাবে, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে পূর্বে ব্যাখ্যাসহ যেসব আয়াত ও হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, এটা এ কথাই প্রমাণ করে।

তারা আল্লাহ তা'আলাকে কিয়ামাতের প্রশস্ত ময়দানে দেখতে পাবে। অতঃপর তারা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করার পরও দেখতে পাবে: এখানে ঐসব স্থানের কথা এসেছে, যাতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ অর্জিত হবে। মোট দু'টি স্থানে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে।

প্রথম স্থান: في عرصات القيامة অর্থাৎ কিয়ামাতের ময়দানে। العرصات শব্দটি العرصة -এর বহুবচন। এমন প্রশস্ত স্থানকে العرصة বলা হয়, যাতে কোন বাড়িঘর থাকেনা। কিয়ামাতের ময়দান বলতে হিসাবের জন্য দন্ডায়মানের স্থানকে বুঝায়। কিয়ামাতের ময়দানে কি শুধু মুমিনগণই আল্লাহকে দেখতে পাবে? না অন্যরাও দেখতে পাবে?

এ মাসআলায় তিনটি মত রয়েছে। (১) মানুষ যখন হিসাবের জন্য কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবে, তখন মুমিন, কাফের এবং মুনাফেক সকলেই

আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। (২) মুমিন ও মুনাফেকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে, কাফেররা নয়। (৩) শুধু মুমিনরাই দেখতে পাবে। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

দ্বিতীয় স্থানঃ মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহকে দেখতে পাবে। কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা ইহা প্রমাণিত। ব্যাখ্যাসহ কিছু দলীল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই সাথে যারা আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে, তাদের প্রতিবাদও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

الجنة **(জান্নাত)** শব্দের আভিধানিক অর্থ বাগান। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জান্নাত বলা হয় সেই বাসস্থানকে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। জান্নাতকে সকল প্রকার নেয়ামাত দ্বারা পূর্ণ করে রাখা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই তিনি মুমিনদেরকে দেখা দিবেন। অর্থাৎ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই এবং নির্দিষ্ট কোন ধরণ ও কায়া ছাড়াই তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে।

ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر

আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়সমূহ।

ما يكون في القبر

১। কবরে সংঘটিতব্য বিষয় সমুহ।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

مِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُمْتَحَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّيَ اللَّهُ وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصُعِقَ ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةُ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ

মৃত্যুর পর যা কিছু হবে বলে নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কবরের ফিতনা (পরীক্ষা), কবরের আযাব এবং কবরে মুমিনদেরকে যেই নেয়ামাত প্রদান করা হবে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

সকল মানুষকেই কবরে পরীক্ষা করা হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর জিজ্ঞেস করা হবে: তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নাবী ﷺ কে? আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্ সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে আর যালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন (সূরা ইবরাহীম ১৪:২৭)।

মুমিন ব্যক্তি তখন বলবেঃ আমার রব আল্লাহ্, আমার দ্বীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ ﷺ আমার নাবী।[৪৭] আর আখেরাতের বিষয়সমূহে সন্দেহ পোষণকারী বলবেঃ হায় আফসোস! হায় আফসোস! এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলেছি। অতঃপর লোহার ভারী একটি হাতুরি দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে। এতে সে এমন উচ্চস্বরে চিৎকার করবে, যা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সবসৃষ্টিই শুনতে পাবে। কোন মানুষ যদি তা শুনতো, তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতো। কবরের এ ফিতনার পর রয়েছে নিয়ামত কিংবা আযাব।

....

ব্যাখ্যাঃ আখেরাত দিবস বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রূকন। মানুষের পরিশুদ্ধ বিবেক ও বোধশক্তি এবং সৃষ্টিগত স্বভাব এ কথাই প্রমাণ করে। সমস্ত আসমানী কিতাব এই কথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করেই বলেছে। সমস্ত নাবী-রাসূল ইহা বিশ্বাস করার প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন। কিয়ামত দিবসকে আখেরাত দিবস বা শেষ দিবস হিসাবে নামকরণ করার কারণ এই যে, দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই দিন আগমন করবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, মৃত্যুর পর যা হবে বলে নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেই আখেরাতের প্রতি

---

৪৭. সহীহঃ সহীহ মুসলিম ২৮৭১, তিরমিযী ৩১২০, আবূ দাউদ ৪৭৫৩, নাসাঈ ২০৫৭, ইবনে মাজাহ ৪২৬৯, মুসনাদে আহমাদ ।

ঈমান বলা হয়। সুতরাং দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা, কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা, কবর থেকে পুনরুত্থান এবং পুনরুত্থানের পর মানুষের অন্যান্য অবস্থা। অতঃপর শাইখুল ইসলাম আখেরাতের অনেক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আখেরাতের বিষয়গুলো হতে কবরে যা হবে সে সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম বলেন: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কবরের ফিতনা, কবরের আযাব এবং কবরে মুমিনদেরকে যেই নেয়ামাত প্রদান করা হবে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এখানে শাইখ মূলত দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বিষয়: কবরের ফিতনা। الفتنة শব্দের আভিধানিক অর্থ পরীক্ষা করা। এখানে ফিতনা দ্বারা কবরে মুনকার- নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতার প্রশ্ন উদ্দেশ্য। তারা মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করবেন।

শাইখুল ইসলাম বলেন: **فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُمْتَحَنُونَ فِي قُبُورِهِم فيقال للرجل সকল মানুষকেই কবরে পরীক্ষা করা হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর জিজ্ঞেস করা হবে: তোমার রব কে?** মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী হোক। অধিকাংশ সময় যেহেতু পুরুষের কথাই উল্লেখ করা হয়, তাই এখানেও পুরুষকে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর শাইখ ঐসব প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন, যা মৃত ব্যক্তির সামনে পেশ করা হবে। মুমিন ব্যক্তি প্রশ্নগুলোর কী উত্তর দিবে এবং কাফের বা মুনাফেক কী উত্তর দিবে এবং প্রশ্নের জবাবের পরে কাফের বা মুনাফেক যেই আযাবের সম্মুখীন হবে এবং মুমিন ব্যক্তি যেই নিয়ামতের মধ্যে থাকবে, শাইখ তাও উল্লেখ করেছেন।

মুনকার- নাকীর ফেরেশতাদ্বয় যেই প্রশ্ন করবেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। কেননা তা নাবী ﷺ থেকে এত সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসগুলো একসাথে মিলালে মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছে যায়। কুরআনুল কারীম দ্বারা কবরে ফিতনা বা প্রশ্নের

মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

মুমিনদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং আখেরাতেও। আর যালেমদেরকে আল্লাহ ভুলিয়ে দিবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা ইবরাহীম ১৪:২৭)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ﵏ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বারা বিন আযিব হতে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ বলেন: কবরের আযাবের ব্যাপারে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।[৪৮] ইমাম মুসলিম একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে,

يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت "মৃত ব্যক্তিকে কবরে বলা হবে, তোমার রব কে? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। আল্লাহর এই বাণীতে উক্ত কথার সত্যতা মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

"মুমিনদেরকে আল্লাহ সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে।

সঠিক কথা বলতে এখানে তাওহীদের ঐ কালেমা উদ্দেশ্য, যা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে। দুনিয়াতে মুমিনদেরকে তাওহীদের বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হলো, সত্যের পথে যত কষ্ট ও নির্যাতন আসুক, তা সহ্য করে তারা উহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। আর আখেরাতে উহার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হলো

---

৪৮ . সহীহ: সহীহ মুসলিম ২৮৭১, তিরমিযী ৩১২০, আবূ দাউদ ৪৭৫৩, নাসাঈ ২০৫৭, ইবনে মাজাহ ৪২৬৯, মুসনাদে আহমাদ ।

নাকীর-মুনকার নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাব দেয়ার তাওফীক দান করা।

শাইখুল ইসলাম বলেন: وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ আখেরাতের বিষয়সমূহে সন্দেহ পোষণকারীকে প্রশ্ন করা হলে সে বলে: হায় আফসোস! হায় আফসোস! هاه هاه এটি দ্বিধা-দ্বন্ধ, ব্যথা, বেদনা ও কষ্টের আওয়াজ। মুনাফেক বা সন্দেহ পোষণকারী আরো বলবে: এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলেছি। কেননা সে রসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তাতে বিশ্বাস করেনি। কাজেই তাঁর পক্ষে সঠিক জবাব দেয়া অসম্ভব হবে। যদিও সে হয়ে থাকে দুনিয়াতে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সুস্পষ্টভাষী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ "আর যালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভুলিয়ে দিবেন"।

فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ অতঃপর লোহার ভারী একটি হাতুড়ি দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে: লোহার বড় হাতুড়িকে مرزبة মারযাবা বলা হয়। এই হাতুরি দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে। আঘাতের কারণে সে এমন উঁচু আওয়াজে চিৎকার করতে থাকবে, যার আওয়াজ মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সব সৃষ্টিই শুনতে পাবে। মানুষ সেই চিৎকার শুনলে কী অসুবিধা হতো অর্থাৎ মানুষকে সেই আওয়াজ না শুনানোর মধ্যে কী হিকমত রয়েছে, নাবী ﷺ তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মানুষ যদি তা শুনতে পেত, তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতো। অর্থাৎ মরে যেতো অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের দাবী এই যে, কবরে মৃত ব্যক্তির যা হবে, জীবিতরা তা অনুভব করবেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা কবরের আযাবকে গাইবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি যদি তা প্রকাশ করতেন, তাহলে যেই উদ্দেশ্যে তা গোপন রাখা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য ও হিকমত ঠিক থাকতো না। সেটি হচ্ছে গায়েবের প্রতি ঈমান।

দ্বিতীয় বিষয়: কবরে মৃত ব্যক্তির আরো যা হবে, শাইখুল ইসলাম তার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন: অতঃপর কবরের ফিতনা (প্রশ্নোত্তর

পর্ব) শেষ হবার পর থেকে মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবরবাসী কবরে শান্তি পেতে থাকবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। শাইখুল ইসলাম এই উক্তির মাধ্যমে কবরের আযাব ও নেয়ামাত সাব্যস্ত করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হচ্ছে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি তার কবরে নেয়ামাতের মধ্যে ডুবে থাকবে অথবা শাস্তিতে নিপতিত হবে। আর এটি হবে রূহ এবং দেহ উভয়ের জন্যই। যেমন এ ব্যাপারে রসূল ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কবরের আযাব ও নেয়ামাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ফরয। এর ধরণ এবং বৈশিষ্ট সম্পর্কে কথা বলা যাবেনা। মানুষের বোধশক্তি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কেননা উহা আখেরাতের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। আখেরাতের বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া এবং তিনি যাদেরকে উহা থেকে যা কিছু জানিয়েছেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ জানেনা। আল্লাহ তা'আলা রসূলদেরকে কবরের আযাবের কিছু কিছু আযাব শুনিয়েছেন।[৪৯]

মুতাযেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা কবরের আযাবকে অস্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হচ্ছে তারা কবরের আযাব শুনে না এবং মৃত ব্যক্তি কবরে শাস্তি ভোগ করছে এবং তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, এটি তারা দেখে না।

তাদের এই দলীলের জবাব হলো, আমরা যদি কোন জিনিস খুঁজে না পাই এবং না দেখি, তার অর্থ এই নয় যে, ঐ জিনিসটি আসলেই নাই অথবা কোন ঘটনা যদি আমরা ঘটতে না দেখি, তাহলে এমন কিছু বুঝার সুযোগ নেই যে, ঐ ঘটনা আসলেই সংঘটিত হয়নি।

---

৪৯. সহীহ হাদীসে এসেছে একদা রসূল ﷺ মক্কা অথবা মদীনার দু'টি নতুন কবরের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন:

إِنَّهُماَ لَيُعَذَّبَانِ وَماَ يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ: بَلَى أماَّ أحَدُهُماَ فَكَانَ يَسْعَي بِالنَّمِيْمَةِ, وَأَمَّا الآخَرَ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

"কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। হ্যাঁ উহা বড় পাপই তো। তাদের একজন ছিল চোগলখোর এবং অপরজন পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না" (বুখারী ২১৮ ও মুসলিম ২৯২)

এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমরা দেখি না, অথচ উহা বিদ্যমান রয়েছে। কবরের আযাব অথবা নিয়ামাত ঐ বিষয়াবলীরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আখিরাত এবং উহার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে গায়িব তথা অদৃশ্যের বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং এ পৃথিবীর মানুষের বোধশক্তির আয়ত্তের বাইরে রেখেছেন। যাতে গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনগণ অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সর্বোপরি আখিরাতের বিষয়গুলোকে দুনিয়ার বিষয়াদির উপর কিয়াস করা যাবে না।

কবরের আযাব দুই প্রকার।

(১) চিরস্থায়ী আযাব। চিরস্থায়ী আযাব হবে কাফিরের। যেমন, ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা গাফেরের ৪৬ নং আয়াতে বলেন:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"দোযখের আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো"।

(২) এমন আযাব, যা নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর উহা স্থগিত রাখা হবে। আর এটি হবে কতিপয় গুনাহগার মুমিনের আযাব। তাদেরকে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। অতঃপর তার আযাব কমানো হবে। জীবিত কোন ব্যক্তির দু'আ অথবা সাদকা কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার কারণে তার আযাব একেবারেই বন্ধ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

القيامة الكبرى وما يجري فيها

২। মহাপ্রলয় এবং তাতে যা ঘটবে

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷀ বলেনঃ

إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى فَتُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْسَادِ وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا

কবরের ফিতনার পর কারো শাস্তি বা নিয়ামাত মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। তখন সমস্ত মানুষের রূহগুলোকে তাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। কিয়ামত সংঘটিত হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং রসূল ﷺ তাঁর হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন। মুসলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা পোষণ করেছেন। 'লোকেরা কিয়ামাতের দিন সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর সামনে খালী পায়ে, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় হাযির হবে।'[৫০]

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷀ এ অধ্যায়ে এবং তার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে ঐসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা আখেরাতে সংঘটিত হবে। আর এ সব বিষয় কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই শুরু হবে। মোট ঘর বা বাসস্থান হলো তিনটি।

(১) দুনিয়ার ঘর (دار الدنيا)।

(২) বারযাখ তথা কবর জগতের ঘর (دار البرزخ)।

---

৫০. সহীহ বুখারী ৪৬২৫, সহীহ মুসলিম ২৮৫৯, তিরমিযী ২৪২৩, নাসাঈ ২০৮৩, মুসনাদে আহমাদ ২০৯৬, দারিমী ২৮৪৪।

(৩) আখেরাতের ঘর (والدار الآخرة)।

এই তিনটি ঘরের প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ বিশেষ হুকুম-আহকাম রয়েছে এবং এগুলোর জন্য এমন এমন ঘটনা রয়েছে, যা তাতে সংঘটিত হবে। বারযাখের গৃহে যা হবে, শাইখ তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

এখানে তিনি ঐসব বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন, যা আখেরাতের ঘরে সংঘটিত হবে। তিনি বলেন:

কবরের ফিতনার পর কারো শাস্তি অথবা নিয়ামত মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিয়ামাত দু'টি। ছোট কিয়ামত ও বড় কিয়ামত। মৃত্যু হলো ছোট কিয়ামাত। এই ছোট কিয়ামত প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদাভাবে কায়েম হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর এবং দেহ থেকে রূহ বের হওয়ার দিনই তার উপর এই কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে।[৫১]

---

৫১. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله কিয়ামাত এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার সাথে কিয়ামতের আলামতগুলো উল্লেখ করেননি। কিয়ামতের আলামতগুলো যেহেতু কিয়ামাতের মতই গায়েবী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই অন্যান্য আলেমগণ আকীদাহর বিষয়গুলোর সাথে কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলোও উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে কিয়ামাতের যেসমস্ত আলামতের কথা বর্ণিত হয়েছে তা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। কিয়ামাতের ছোট আলামতগুলোর অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে। যা এখনও প্রকাশিত হয়নি তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সহীহ মুসলিম (২৯০১) হুযায়ফা رضي الله عنه হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ

"একদা রসূল ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তখন কিয়ামাতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন: যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখতে পাবে ততদিন কিয়ামত হবে না। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমন (৩) ভূগর্ভ থেকে নির্গত

আর বড় কিয়ামাত সমস্ত মানুষের উপর একসাথে কায়েম হবে এবং সব মানুষকে দুনিয়া থেকে একসাথেই উঠিয়ে নিবে। এই দিনকে কিয়ামাত (দন্ডায়মান) দিবস হিসাবে নাম দেয়ার কারণ হলো তাতে শেষ ফুৎকারের সাথে সাথে সকল মানুষ তাদের কবর থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দন্ডায়মান হবে। তাই শাইখুল ইসলাম বলেছেন, তখন রূহগুলোকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর এটি তখনই হবে, যখন ইসরাফীল সিঙ্গায় ফুঁ দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾

"তারপর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাযির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হবে। ভীত হয়ে বলবে, হায় আফসোস! কে আমাদেরকে আমাদের সমাধি থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো? (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫১-৫২)। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৬৮ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾

"অতঃপর আরেকবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে তখন হঠাৎ সবাই দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে"।

الروح শব্দের বহুবচন হচ্ছে الأرواح অর্থাৎ রূহসমূহ। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যার বদৌলতে বেঁচে থাকে, তার নাম রূহ। আল্লাহ ছাড়া

দাব্বাতুল আরদ্ নামক অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমন ৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমন (৬) ইয়াজুয-মা'জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধ্বস (৮) পশ্চিমে ভূমিধ্বস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে"।

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হচ্ছে কিয়ামাতের এ সমস্ত আলামতের একটিও এখনো প্রকাশিত হয়নি। কিয়ামাতের পূর্বে এগুলো প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা সংঘটিত হবে না।

অন্য কেউ রূহের হাকীকত তথা আসল অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾

"এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, রূহ আমার রবের আদেশ মাত্র"। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৮৫)

কিয়ামাত সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং রসূল ﷺ তাঁর হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন। মুসলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা পোষণ করেছেনঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ এখানে কিয়ামাতের দিন সৃষ্টির পুনরুত্থানের দলীলগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা, মানুষের বোধশক্তি এবং ফিতরাত পরিশুদ্ধ সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারা পুনরুত্থান প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে পুনরুত্থান সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, এর উপর দলীল কায়েম করেছেন এবং কুরআনের অধিকাংশ সূরাতেই পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করেছেন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ যেহেতু সর্বশেষ নাবী, তাই তিনি আখেরাতের বিষয়গুলোর এমন খোলাখুলি বিবরণ দিয়েছেন, যা অনেক নাবীর কিতাবসমূহেই পাওয়া যাবে না।

আমলের বিনিময় দেয়া মানুষের বিবেক ও বোধশক্তি দ্বারাই প্রমাণিত। আর শারীয়াত এটিকে সুসাব্যস্ত করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক স্থানেই মানুষের বোধশক্তিকে পুনরুত্থানের প্রতি সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সেখানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ কি মনে করে, তাকে বিনা হিসাবে ছেড়ে দেয়া হবে? অথবা তারা কি মনে করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন? তাদেরকে আদেশ-নিষেধ করা হবেনা? তাদেরকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেয়া হবেনা? আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের সাথে মোটেই শোভনীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ নয় যে, তিনি মানুষকে অযথা সৃষ্টি করবেন, কোন দায়িত্ব না দিয়েই তাদেরকে ছেড়ে দিবেন, আদেশ-নিষেধ করবেন না এবং তাদের কর্ম অনুপাতে ছাওয়াব বা শাস্তি দিবেন না। আল্লাহর হিকমাত এটি সমর্থন করে না।

এ রকম কোন সম্ভাবনা নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলকে অসৎকর্মীর সমান করবেন কিংবা মুসলিমদেরকে অপরাধীদের কাতারে শামিল করবেন। কেননা কতক সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার সৎকর্মের বিনিময় পাওয়ার আগেই মৃত্যু বরণ করে এবং কতিপয় অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত সাজা ভোগ করার আগেই মারা যায়। সুতরাং এমন একটি জগৎ অবশ্যই থাকা দরকার যেখানে উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই ন্যায্য বিনিময় পেয়ে যাবে। পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী কাফের হিসাবে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ﴾

"কাফেররা ধারণা করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবেনা"। (সূরা তাগাবুন ৬৪:৭)

শাইখুল ইসলাম বলেন: فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا **কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোকেরা সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর সামনে খালী পায়ে, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় দন্ডায়মান হবে:** حفاة শব্দটি حاف এর বহুবচন। যার পায়ে জুতা কিংবা মোজা থাকে না, তাকে حافٍ বলায় হয়। عراة (উলঙ্গ, বস্ত্রহীন) عارٍ এর বহুবচন। যার শরীরে কোন কাপড় থাকে না, সেই হচ্ছে عارٍ। আর غرلًا **শব্দটি** أغرل এর বহুবচন। খাতনাবিহীন লোককে আগরাল বলা হয়। যার পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে খাতনা করা হয়নি, সেই আগরাল। লোকেরা যখন কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে দন্ডায়মান হবে, তখন এই তিনটি বৈশিষ্ট তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে এই কথা পাওয়া যাচ্ছে। রসূল ﷺ বলেন:

إنكم تحْشَرُون إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا

"কিয়ামাতের দিন নগ্নপদ, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হবে"।[৫২]

---

৫২. সহীহ বুখারী ৪৬২৫, সহীহ মুসলিম ২৮৫৯, তিরমিযী ২৪২৩, নাসাঈ ২০৮৩, মুসনাদে আহমাদ ২০৯৬, দারিমী ২৮৪৪।

مايجري في يوم القيامة

কিয়ামাতের দিন আরো যা ঘটবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ تُنْصَبُ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۞ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ وَيُحَاسِبُ اللهُ الخَلائِقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ حَسَنَاتَ لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا

কিয়ামাতের দিন সূর্য মানুষের নিকটবর্তী হবে, মানুষের শরীর হতে নির্গত ঘাম তাদের নাক-মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।[৫৩] সেদিন দাড়িপাল্লা

---

৫৩ .নাবী ﷺ বলেন:

تَدْنُوْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ

“কিয়ামাতের দিন সূর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে। মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে। মানুষেরা তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। মানুষের শরীরের পঁচা ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো নাকের ডগা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। একথা বলার পর নাবী ﷺ তাঁর মুখের দিকে

স্থাপন করা হবে এবং উহার মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾

"সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল" (সূরা মুমিনূন ২৩:১০২-১০৩)।

সেদিন আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে। কেউ সেই আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে, কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

"প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের আমলনামা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিবো এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি কিতাব, যাকে সে খোলা আকারে পাবে। বলা হবেঃ পড়ো নিজের আমলনামা নিজেই। আজ নিজের হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট"। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ১৩-১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির হিসাব নিবেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দার সাথে নিবৃত্তে মিলিত হবেন এবং বান্দাকে পাপরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন এ বিষয়ে আল্লাহ্র কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

আর কাফেরদের ব্যাপারে কথা হলো, তাদের হিসাব ঐসব লোকদের হিসাবের মত হবে না, যাদের ভাল-মন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে।

ইঙ্গিত করে দেখালেন"। (সহীহ মুসলিম ২৮৬৪, তিরমিযী ২৪২১)

কেননা কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভাল আমলই থাকবে না। কিন্তু তাদের দুনিয়ার অপকর্মসমূহ গণনা করে রাখা হবে এবং তা সংরক্ষণ করা হবে। কিয়ামাতের দিন তাদের আমলগুলোর কারণে তাদেরকে আটকানো হবে, তাদেরকে তা স্বীকার করানো হবে। অতঃপর তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে।

ব্যাখ্যা: কুরআন ও হাদীসে কিয়ামাতের দিন যা হবে বলে উল্লেখিত হয়েছে, আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ তার কিয়দাংশ এখানে আলোচনা করেছেন। এই মহান দিনে যা হবে, তার বিস্তারিত বিষয়গুলো মানুষের বোধশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নাবী ﷺ হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারাই কেবল তা জানা যাবে। কেননা তিনি নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেন না।

যা বলেন, **إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى** তা কেবল অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই বলেন। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই জানেন। তারপরও কিয়ামতের দিন বান্দাদের আমলের হিসাব নেয়া, আমলসমূহ ওজন করা এবং পুস্তকে লিখিত অবস্থায় তা প্রকাশ করার মধ্যে হিকমতে ইলাহী হচ্ছে, যাতে করে তিনি তাঁর বান্দাদের দ্বারা পূর্ণ প্রশংসিত হতে পারেন, তাঁর পূর্ণ আদল ও ইনসাফ বাস্তবায়ন হয়, তাঁর সুপ্রশস্ত রহমত এবং রাজত্বের সুবিশালতা প্রমাণিত হয়।

এই মহা বিপদের দিনে বান্দাদের যে অবস্থা হবে, ইমাম ইবনে তাইমীয়া﵀ এখানে তার কিয়দাংশ আলোচনা করেছেন।

(১) **সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে:** সূর্য তাদের মাথার নিকটবর্তী হবে। যেমন সহীহ মুসলিমে মিকদাদ ﵁ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوِ اثْنَيْنِ

"যখন কিয়ামাতের দিন হবে, তখন সূর্যকে বান্দাদের নিকটবর্তী করা

হবে। এত নিকবর্তী করা হবে যে, তাদের মাঝে এবং সূর্যের মাঝে মাত্র এক বা দুই মাইলের ব্যবধান থাকবে”।[৫৪]

وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ মানুষের শরীর থেকে নির্গত ঘাম তাদের জন্য লাগাম স্বরূপ হয়ে যাবেঃ অর্থাৎ ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে লাগামের মত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কথা বলা থেকে বারণ করবে। সূর্য তাদের নিকটে চলে আসার কারণেই এমন হবে। অধিকাংশ মানুষের জন্যই সূর্য নিকটবর্তী হবে। অর্থাৎ সূর্যের তাপ অনুভব করবে। তবে নাবীদেরকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে এর বাইরে রাখতে চাইবেন, তাদের কথা ভিন্ন।

(২) বান্দাদের আমলসমূহ মাপার জন্য দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবেঃ এই দিন আরো যা হবে, তার অন্যতম হচ্ছে, দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এবং উহার মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। الموازين শব্দটি ميزان -এর বহুবচন। কিয়ামাতের দিন যেই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, উহার দ্বারা মানুষের ভাল ও মন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। সেদিন আসলেই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এই নিক্তির দু'টি পাল্লা এবং একটি কাঁটা থাকবে। মীযান (দাড়িপাল্লা) আখেরাতের অন্যতম একটি জিনিস। এর বিবরণ যেমন এসেছে, সেরকমই বিশ্বাস করি। কুরআন ও হাদীসের দলীলের বাইরে আমরা উহার কায়া ও ধরণ অনুসন্ধান করতে যাবো না।

বান্দাদের আমলসমূহ মাপার হিকমত হচ্ছে, এগুলোর পরিমাণ যাহির করা, যাতে সেই অনুপাতে বিনিময় দেয়া যায়।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ “আমলের তুলনায় যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে”: **فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** তারাই সফলকাম হবে”। অর্থাৎ তারা সাফল্য লাভ করবে, জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশের হকদার হবে।

---

৫৪. সহীহঃ তিরমিযী ২৪২১, মুসলিম ২৮৬৪।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ “এবং নেকীর তুলনায় যাদের অসৎ আমলের পাল্লা ভারী হবে”: فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم তারাই হবে এমন লোক, যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অর্থাৎ ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ জাহান্নামে তারা চিরস্থায়ী হবে। অর্থাৎ তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, কিয়ামাতের দিন দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে ওজন এবং মীযানের আলোচনা এসেছে। সবগুলো দলীল একসাথে মিলালে বুঝা যায়, আমলকারী, আমল এবং আমল যেই পুস্তকে লিখা আছে, সবই ওজন করা হবে। এই কথাগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। সবই ওজন করা হবে। তবে এ কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, পাল্লা ভারী বা হালকা হবে স্বয়ং আমলের কারণে; আমলকারীর ব্যক্তিসত্তা কিংবা যেই পুস্তিকায় আমল লিখা থাকবে, তার কোন বিবেচনা করা হবে না। আল্লাহই অধিক জানেন।

মুতাযেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দলীলগুলো তাবীল করে বলেছে, এখানে আমল ওজন করা এবং দাড়িপাল্লা স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে আদল তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীল, উম্মতের সালাফ ও তাদের ইমামদের ইজমা বিরোধী।

ইমাম শাওকানী ﵀ বলেন: এই বিষয়ে মুতাযেলাদের সর্বোচ্চ দলীল হচ্ছে, তারা বলে কবরে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়, এই কথা মানুষের বোধশক্তির পক্ষে কবুল করে নেয়া অসম্ভব। এ ছাড়া তাদের নিকট আর কোন দলীল নেই। তাদের এই কথার মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। কবরের আযাবের বিষয়টি তাদের বোধশক্তি মেনে না নিলেও তা এমন অনেক লোকের আকল কবুল করে নিয়েছে, যাদের বোধশক্তি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। সাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের অনুসারীদের আকল কবরের আযাবকে সহজভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছে। পরবর্তীতে অন্ধকার রাতের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ‘আতের আগমন ঘটল এবং যার যা ইচ্ছা বলতে লাগল ও শারীয়াতের দলীলগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করল।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, আখেরাতের বিষয়গুলো এমন কোন বিষয় নয়, যে বোধশক্তি দ্বারা তা বুঝা সম্ভব।

(৩) সেদিন আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে: এ মহাপ্রলয় দিবসের ঘটনাসমূহ থেকে শাইখুল ইসলাম আরো যা উল্লেখ করেছেন, সেদিন আমলনামাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। এখানে দফতর বলতে সেই দফতর উদ্দেশ্য, যাতে বান্দাদের ঐসব আমল লিখিত আছে, যা তারা দুনিয়াতে সম্পাদন করেছিল। সম্মানিত লেখকগণ তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। দফতর খোলা হবে, এই কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় বান্দার আমল লিখার দফতর বন্ধ করে দেয়া হয়। তাই কিয়ামাতের দিন হিসাব নেয়ার সময় সেই আমলনামা খোলা হবে। যাতে প্রত্যেক মানুষ তার আমলনামা দেখতে পারে এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, সে সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

কেউ আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে, কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে: এই অংশের মধ্যে কিয়ামাতের দিন মানুষের আমলনামা গ্রহণ করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল কারীমে এর বিবরণ এসেছে। মানুষ সেদিন দুইভাবে নিজ নিজ আমলনামা গ্রহণ করবে।

(ক) কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে। মুমিন ব্যক্তিই ডান হাতে আমলনামা পাবে

(খ) কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। কাফের তার আমলনামা বাম হাতে পাবে। তার বাম হাতকে বাঁকিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে তাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। আয়াতে কাফেরের আমলনামা উভয়ভাবেই দেয়ার কথা এসেছে। উভয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা কাফেরের ডান হাত সেদিন তার গলার সাথে বেঁধে রাখা হবে এবং তার বাম হাত পিছনে টেনে নেয়া হবে। অতঃপর সে বাম হাতে তার আমলনামা গ্রহণ করবে।

অতঃপর শাইখ আমলনামা প্রদানের উপর আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾

প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের আমলনামা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিব (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৩)।

طائره এর অর্থ হচ্ছে, তার থেকে ভাল-মন্দ যেসব আমল প্রকাশিত হয়েছে। উহা তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আমল তাকে জড়িয়ে থাকবে এবং তাকে উহার বিনিময় দেয়া হবে। আমলনামা হতে তার পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। হার বা মালা যেমন গলাকে পেচিয়ে থাকে তেমনি আমলনামা মানুষের গলায় ঝুলতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورً । এবং কিয়ামাতের দিন তার জন্য বের করবো একটি কিতাব, যাকে সে খোলা আকারে পাবে (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৩): অর্থাৎ তার সমস্ত আমলকে একটি কিতাবে একত্র করবো এবং কিয়ামাতের দিন তাকে উহা দিবো। সে যদি সৌভাগ্যবান হয়, তাহলে দিবো ডান হাতে। আর হতভাগ্য হলে দিবো বাম হাতে। আমলনামা সে খোলা অবস্থাতেই পাবে। সে তা পড়তে পারবে। অন্যরাও তার আমলনামা পড়তে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **يَلْقَاهُ مَنْشُورًا** আমলনামাকে খোলা অবস্থায় পাবে। এর কারণ হলো যাতে নেকীর পরিমাণ বেশী থাকলে তাকে দ্রুত সুখবর দেয়া যেতে পারে এবং অসৎ আমল বেশী থাকলে তাকে তিরস্কার করা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: اقْرَأْ كِتَابَكَ পড়ো নিজের আমলনামা নিজেই: অর্থাৎ দুনিয়াতে যে পড়তে পারতো এবং যে পারতোনা উভয়কেই আমি উহা পাঠ করার আগে বলবো: তোমার নিজের আমলনামা তুমি নিজেই পড়ো।

كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا "আজ নিজের হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৪): حسيبا শব্দটি এখানে حاسبا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تمييز হিসাবে উহা মানসুব হয়েছে। এটি হচ্ছে

সর্বোত্তম ন্যায় বিচার। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকেই তার হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যাতে করে সে তার সমুদয় আমল দেখতে পায় এবং তা থেকে কোনটিই অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে জানা গেল যে, প্রত্যেক মানুষকেই কিয়ামতের দিন আমলনামা প্রদানের বিষয়টি সুসাব্যস্ত। সে তার আমলনামা নিজেই পড়বে এবং তার মধ্যে যা থাকবে, তা অবগত হবে। অন্যের মাধ্যমে অবগত হওয়ার কোন প্রয়োজন পড়বে না।

(৪) সেদিন মানুষের হিসাব নেওয়া হবেঃ অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ হিসাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা সেদিন সৃষ্টিসমূহের হিসাব নিবেন। হিসাব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময়ের পরিমাণ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া এবং তাদের আমলসমূহ থেকে তারা যা ভুলে গেছে তাদেরকে উহা স্মরণ করিয়ে দেয়া। অন্যভাষায় বলা যায়, হাশরের ময়দান হতে চলে যাওয়ার আগেই আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাদেরকে তাদের ভাল-মন্দ আমলসমূহের হিসাব নেওয়ার জন্য আটকানোকে হিসাব বলা হয়।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ উল্লেখ করেছেন যে, হিসাব দুই প্রকার।

প্রথমঃ মুমিনের হিসাবঃ মুমিনের হিসাবের ব্যাপারে তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার সাথে নিবৃত্তে মিলিত হবেন এবং পাপরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾

"অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার কাছ থেকে হালকা হিসাব নেয়া হবে এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে"। (সূরা ইনশিকাক ৮৪:৭-৯)

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ من الناس ويقرره بذنوبه وَيَقُولُ له: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَن قد هَلَكَ، قَالَ: فَإِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثم يعطى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ»

"আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে নিকটবর্তী করে তার উপর স্বীয় (সম্মানের) পর্দা স্থাপন করে তাকে মানুষ থেকে আড়াল করবেন এবং তাকে দিয়েই তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? এমনকি আল্লাহ যখন তার কাছ থেকে সকল গুনাহর স্বীকৃতি আদায় করবেন এবং বান্দা যখন দেখবে যে, সে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে তখন আল্লাহ বলবেন: আমি দুনিয়াতে তোমার এ সমস্ত গুনাহ গোপন রেখেছি। আজ তোমার এ সমস্ত গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিবো। তখন তার ভাল কাজগুলোর আমলনামা (ডান হাতে) প্রদান করা হবে।[৫৫]

ويقرره بذنوبه তাকে দিয়েই তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন: অর্থাৎ তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবেন, যাতে সে তার গুনাহসমূহ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার করো? তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার করো?

মুমিনদের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক থাকবে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন সত্তর হাজারের হাদীসে এসেছে যে, তারা বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫৬]

---

৫৫. সহীহ বুখারী ২৪৪১, সহীহ মুসলিম ২৭৬৮।
৫৬. সহীহ মুসলিম ২১৬।

হিসাব হবে বিভিন্ন রকম। কারো হিসাব হবে একদম সহজ। আর এটি হলো কেবল আমলগুলো পেশ করা। আরেক প্রকার হিসাব হবে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা ﵂ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ বলেন:

«لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يوم القيامة إِلاَّ هَلَكَ فقلت يا رسول الله أَلَيْسَ قد قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيس أحد يناقش الْحِسَابَ يوم القيامة إلا عذب»

"কিয়ামাতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আয়েশা ﵂ বলেন: আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি "অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে অচিরেই তার সহজ হিসাব নেয়া হবে"? নাবী ﷺ তখন বললেন: মূলতঃ এটি হিসাব নয়; বরং তা হলো শুধু আমলগুলো পেশ করা। কিন্তু কিয়ামতের দিন যার কঠিন হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে"।[৫৭]

(২) কাফেরদের হিসাব: কাফেরদের হিসাব সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম বলেন: আর কাফেরদের ব্যাপারে কথা হলো, তাদের হিসাব ঐসব লোকদের হিসাবের মত হবে না, যাদের ভাল-মন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা কিয়ামাতের দিন তাদের কোন ভাল আমলই থাকবে না। অর্থাৎ তাদের এমন সৎ আমল থাকবে না, যা অসৎ আমলের সাথে তুলনা করে ওজন করা যায়। কেননা কুফরী করার কারণে তাদের আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। আখেরাতে তাদের অসৎ আমল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সুতরাং তাদের হিসাব নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের দুনিয়ার অপকর্মসমূহ গণনা করা এবং সংরক্ষণ করা। কিয়ামাতের দিন তাদের আমলগুলোর কারণে তাদেরকে আটকানো হবে, তাদেরকে তা স্বীকার করানো হবে। অতঃপর তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের কুফরী আমলগুলো তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে

৫৭. সহীহ বুখারী ৬৫৩৭।

এবং তাদের কাছ থেকে সেগুলোর স্বীকারোক্তি আদায় করার পর বদলা দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾

"আমি অবশ্যই কাফেরদের জানিয়ে দেব তারা কি কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো"। (সূরা হামীম সাজদাহ ৪১:৫০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾

"এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবেই তারা ছিল কাফের"। (সূরা আরাফ ৭:৩৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

"তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামের অধিবাসীদের উপর আল্লাহর লানত"। (সূরা মুলক ৬৭:১১)

حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته

নাবী ﷺ এর হাওয এবং উহার স্থান ও বৈশিষ্ট্য

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَفِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوْضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا

কিয়ামাতের ময়দানে থাকবে নাবী ﷺ এর হাওয। তাঁর অনুসারীরা পানি পান করার জন্য সেখানে উপস্থিত হবে। এই হাউযের পানি হবে দুধের চেয়েও অধিক সাদা, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি, উহার পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। এর দৈর্ঘ হবে একমাসের দূরত্বের সমান এবং প্রস্থ হবে এক মাসের দূরত্বের সমান। যে উহা থেকে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না।

ব্যাখ্যা: (৫) কিয়ামাতের দিন আরো যা থাকবে, তার মধ্যে নাবী ﷺ এর হাওয অন্যতম। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ এখানে হাওযে কাওছারের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: কিয়ামতের ময়দানে থাকবে নাবী ﷺ এর হাওযে কাউছার। তাঁর অনুসারীরা সেখানে পানি পান করার জন্য আগমন করবে।

সহীহ সনদে নাবী ﷺ থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন: চল্লিশজন সাহাবী নাবী ﷺ থেকে হাওযে কাউছারের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসগুলোর অনেকগুলোই বা অধিকাংশই সহীহ বুখারীতে রয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ এর কথা এখানেই শেষ। العرصات এর বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

الحوض শব্দের আভিধানিক অর্থ পানি জমা হওয়ার স্থান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে নাবী ﷺ হাওয সাব্যস্ত। মুতাযেলারা এতে ভিন্নমত করেছে। তারা নাবী ﷺ এর হাওয সাব্যস্ত করেনা এবং এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোও কবুল করে না। তারা হাওয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ পরিবর্তন করে থাকে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম হাওযের কতপিয় বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এই বৈশিষ্টগুলো একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন:

«حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَبَدًا»

"আমার হাওযের প্রশস্ততা হচ্ছে এক মাসের দূরত্বের সমান। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, তার সুঘ্রাণ হবে কস্তুরীর চেয়েও অধিক পবিত্র, উহার পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে সে কখনই পিপাসিত হবেনা।[৫৮]

৫৮. সহীহ বুখারী ৬৫৭৯, সহীহ মুসলিম ২২৯২।

الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه

সিরাত, উহার অর্থ, স্থান এবং উহার উপর দিয়ে মানুষের অতিক্রম

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرُكَّابِ الْإِبِلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ

কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপন করা হবে। উহা হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে স্থাপিত একটি পুল। লোকেরা নিজি নিজ আমল অনুযায়ী এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তাদের কেউ চোখের পলকের গতিতে চলবে, কেউ বিজলির গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে পার হবে, কেউ উটে আরোহীদের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে এবং কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। কাউকে সেখান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পুলের উপর থাকবে লোহার অসংখ্য আঁকুড়া বা কাঁটা। এগুলো আমল অনুযায়ী মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: (৬) শাইখুল ইসলাম এখানে উল্লেখ করেছেন যে, **কিয়ামাতের দিন যা হবে, তার মধ্যে পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার বিষয়টি অন্যতম।**

الصراط সিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো প্রশস্ত রাস্তা। আর শারীয়াতের পরিভাষায় পুলসিরাতের পরিচয় শাইখ নিজেই উল্লেখ

করেছেন যে, এটি মূলতঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার একটি সেতু। পুলসিরাত কোথায় স্থাপন করা হবে, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম বলেন যে, তা হবে **على متن جهنم** অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের উপর। ইহার উপর দিয়ে লোকদের অতিক্রম করার অবস্থা সম্পর্কে বলেন, কেউ পার হবে চোখের পলকে, কেউ বা বিজলির গতিতে। অর্থাৎ ঈমান এবং ঐ সমস্ত সৎ আমল অনুপাতে পুলসিরাতের উপরে তাদের অতিক্রমের গতি দ্রুত কিংবা ধীর হবে, যা তারা দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় সম্পাদন করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামের উপর টিকে থাকা ও দৃঢ়তা অনুপাতেই পুলসিরাতের উপর তাদের টিকে থাকা এবং অতিক্রম করার বিষয়টি নির্ভর করছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে **صراط معنوى** সিরাতে মানাভী (আদর্শিক পথ) তথা দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকবে, তারাই কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর স্থাপিত **صراط حسي** সিরাতে হিস্‌সী (বাহ্যিক পথ) পুলসিরাতের উপর দৃঢ়পদ থাকবে। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি এই ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হবে, সে কিয়ামতের দিন সিরাতে হিস্‌সীর উপর তথা পুলসিরাতের উপর থেকে ছিটকে পড়বে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

يعدو عدوا অর্থ হচ্ছে দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে চলবে। আর يزحف زحفا মানে পায়ের বদলে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চলবে। وعليه كلاليب পুলসিরাতের উপর থাকবে বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লোহা। كلاليب শব্দটি كلوب এর বহুবচন। كلوب শব্দের ‘কাফ’ বর্ণে যবর এবং ‘লাম’ বর্ণে তাশদীদ ও পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। تخطف এর ‘তোয়া’ বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। যের দিয়ে পড়াও জায়েয। الخطف মাসদার থেকে এই শব্দটি গঠিত। কোন জিনিসকে খুব দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াকে খাতাফ বলা হয়। মন্দ আমলের কারণে মানুষকে পুলসিরাতের উপর থেকে দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। শুবুহাত এবং শাহওয়াত (সন্দেহ এবং কুপ্রবৃত্তি)

মানুষকে দুনিয়াতে সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা অনুপাতেই পুলসিরাতের উপরের লোহার বক্র কাঁটাগুলো মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে এবং লোকেরা তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। নাবী ﷺ থেকে যেহেতু এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে ঈমান আনয়ন করে।

মুতাযেলী আলিম কাযী আব্দুল জাব্বার এবং তার অনেক অনুসারী জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপনের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছে। সে বলেছে, উপরোক্ত সিরাত বলতে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে যাওয়ার রাস্তাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মাদের ৫-৬ নং আয়াতে বলেছেন:

﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾

"তিনি অচিরেই তাদের পথপ্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন" দ্বারা জান্নাতের পথের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা সূরা সাফ্ফাতের ২২-২৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾

কিয়ামাতের দিন আদেশ করা হবে, ধরে নিয়ে এসো যালেমদেরকে, তাদের সহযোগীদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদের ইবাদাত করতো। অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও

দ্বারা জাহান্নামের দিকে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল এবং বিনা দলীলে এর দ্বারা সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের উক্তি থেকে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য। কোন ক্রমেই বিনা কারণে প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

القنطرة بين الجنة والنار

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের সেতু

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ

যারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যখন তারা পুলসিরাত পার হবে, তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সেতুর উপর থামানো হবে। এখানে তাদের একজন থেকে অপরজনের কিসাস বা বদলা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর যখন তাদেরকে পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিস্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

ব্যাখ্যা: (৭) কিয়ামাতের দিন আরো যা হবে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ তা থেকে কানতারার (সেতুর) উপর দন্ডায়মান হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম করবে এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

"একমাত্র সে ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে (সূরা আল-ইমরান ৩:১৮৫)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা শুরার ৭ নং আয়াতে বলেন:

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

"এক দল জান্নাতে যাবে এবং অপর দলকে যেতে হবে জাহান্নামে"।

তবে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মুমিনদের পারস্পরিক যুলুমের কিসাস নেওয়া হবে। পরিশেষে তারা যুলুম থেকে একদম পরিস্কার-পরচ্ছিন্ন হয়ে সুন্দরতম অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله فإذا عبروا বাক্য দ্বারা এই কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ তারা যখন পুলসিরাত পার হবে এবং জাহান্নামে পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে, তখন তারা একটি কানতারার উপর থামবে। সেতু, ওভার ব্রীজ এবং যমীনের উপর যেসব ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়, তার চেয়ে উঁচু বস্তুকে কানতারা বলা হয়। এই কানতারা সম্পর্কে একাধিক কথা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন: এটি হচ্ছে পুলসিরাতের ঐ কিনারা, যা জান্নাতের নিকটবর্তী। কেউ কেউ বলেছেন: এটি হচ্ছে শুধু মুমিনদের জন্য খাস আরেকটি সিরাত।

فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ অতঃপর তাদের একজনের জন্য অপরজন থেকে কিসাস বা বদলা গ্রহণ করা হবে: অর্থাৎ তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যুলুমের বদলা নেওয়া হবে। যালেম থেকে মাযলুমের হক আদায় করে নেওয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে যখন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে অর্থাৎ মাযলুমের হক আদায় এবং অন্যান্য দায়ভার হতে মুক্ত হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে। তখন তাদের কতকের অন্তরে অন্যদের প্রতি যেই হিংসা-বিদ্বেষ ছিল, তা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾

"তাদের মনে যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকবে তা আমি বের করে দেবো, তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে"। (সূরা হিজর ১৫:৪৭)

أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم

সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতের দরজা খুলবেন, তিনি সর্বপ্রথম তাতে প্রবেশ করবেন এবং নাবী ﷺ এর শাফা‘আতের বর্ণনা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّتُهُ وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ أَمَّا الشَّفَاعَةُ الْأُولَى فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ آدَمُ ، وَنُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ ، فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا

কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ﷺ বেহেশতের দরজা খুলবেন। সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে তাঁর উম্মতই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি কিয়ামাতের দিন তিনটি শাফা‘আত করবেন।

প্রথম শাফা‘আতটি করবেন হাশরের মাঠে অবস্থানকারী সকল মানুষের জন্য। যাতে তাদের মধ্যে দ্রুত ফায়সালা করা হয়। আদম, আলাইহিস সালাম নূহ, আলাইহিস সালাম ইবরাহীম, আলাইহিস সালাম মুসা, আলাইহিস সালাম এবং সমস্ত নাবীই সেদিন আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করার পর শাফা‘আতের বিষয়টি পরিশেষে মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট ফিরে আসবে।

দ্বিতীয় শাফা'আতটি হবে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য। এ দু'টি শাফা'আত নাবী ﷺ এর জন্য খাস।

আর তৃতীয় শাফা'আতটি হবে ঐসব লোকের ব্যাপারে, যাদের জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে যাবে। এই শাফা'আতটি হবে সমস্ত নাবী, সিদ্দীক এবং অন্যান্যদের জন্য। সুতরাং যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন, তাদেরকে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করানো না হয়। তিনি আরো সুপারিশ করবেন ঐ সব লোকের জন্য, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদেরকে সেখান থেকে বের করার সুপারিশ করবেন।

ব্যাখ্যাঃ (৮) কিয়ামাত দিবসের যেসব অবস্থা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অতিক্রম করার পর সেদিন মুমিনদের সর্বশেষ অবস্থা কী হবে, শাইখুল ইসলাম এখানে তা বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে তিনি বলেছেনঃ অতঃপর যখন তাদেরকে পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিস্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অনুমতির পূর্বে এবং জান্নাতের দরজা খোলার আবেদন করার আগে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

নাবী ﷺ সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেনঃ

«آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ»

"কিয়ামাতের দিন আমি জান্নাতে দরজায় উপস্থিত হয়ে উহার দরজা খোলার আবেদন করবো। তখন জান্নাতের প্রহরী বলবেঃ আপনি কে? আমি বলবোঃ মুহাম্মাদ। প্রহরী তখন বলবেঃ আপনার জন্য দরজা খুলতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য আমি জান্নাতের দরজা খুলবো না"।[৫৯]

---

৫৯. সহীহ মুসলিম ১৯৭।

الاستفتاح অর্থ হচ্ছে খোলার আবেদন করা। এখানে নাবী ﷺ সম্মান ও ফাযীলাত প্রকাশ করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ﷺ উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা তাদের ফাযীলত অন্যান্য সকল উম্মাতের উপরে। মুসিলম শরীফে আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীসে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাবী ﷺ বলেন:

«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»

"আমরা সকলের পরে দুনিয়াতে আসলেও কিয়ামাতের দিন সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবো"।[৬০]

কিয়াম তের দিন খাসভাবে নাবী ﷺ তিনটি শাফা'আত করবেন। الشفاعات শব্দটি شفاعة এর বহুবচন। শাফা'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ মধ্যস্থতা করা, সুপারিশ করা। আর শরীয়াতের পরিভাষায় শাফা'আত অর্থ হলো سؤال الخير للغير অন্যের জন্য কল্যাণের আবেদন করা। الشفاعة শব্দটি الشفع থেকে নেওয়া হয়েছে। ইহা الوتر শব্দের বিপরীত। شفع অর্থ জোড় আর وتر অর্থ বে-জোড়। শাফাআতকারী তার আবেদনের সাথে সুপারিশকৃতের আবেদনকেও শামিল করে নেয় বলেই তাকে সুপারিশকারী বলা হয়। অথচ এর আগে সে ছিল একাকী।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "কিয়ামাতের দিন নাবী ﷺ এর জন্য তিনটি শাফা'আত হবে"। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে নাবী ﷺ যেসব শাফা'আত করবেন, তিনি এখানে ঐসব শাফা'আতের আলোচনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে শাফা'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। **তবে অনুসন্ধানের পর মোট আট প্রকার শাফাআতের কথা জানা যাচ্ছে।** এগুলোর মধ্য হতে কতিপয়

৬০. সহীহ মুসলিম ৮৫৫।

শাফা'আত নাবী ﷺ এর সাথে খাস এবং আরো কিছু শাফা'আতের কথা জানা যায়, যা তাঁর জন্য এবং অন্যদের জন্যও সাব্যস্ত।

১) الشفاعة العظمى শাফাআতে উয্‌মা: وهي المقام المحمود এ শাফা'আত হবে মাকামে মাহমুদে । হাশরের মাঠে লোকদের দীর্ঘ অবস্থানের পর এবং আদম থেকে শুরু করে ঈসা ﷺ পর্যন্ত সবার কাছে সুপারিশের জন্য গমন করার পর নাবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দাদের মাঝে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার আবেদন করবেন। সকল নাবীই যখন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন, তখন নাবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুর অনুমতি নিয়ে শাফা'আত করবেন।

২) شفاعته ــ صلى الله عليه وسلم ــ في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত: হিসাবের পর জান্নাতীদেরকে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য নাবী ﷺ আল্লাহর নিকট শাফা'আত করবেন।

৩) شفاعته ــ صلى الله عليه وسلم ــ في عمه أبي طالب চাচা আবু তালেবের জন্য নাবী ﷺ এর শাফা'আত: নাবী ﷺ কিয়ামাতের দিন তাঁর চাচা আবু তালেবের শাস্তি হালকা করার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। এই শাফা'আত তাঁর সাথেই খাস। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফেরদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর শাফা'আত কেবল তাওহীদপন্থীদের জন্যই খাস। সুতরাং তাঁর কাফের চাচা আবু তালেবের জন্য যেই শাফা'আত তিনি করবেন, তা কেবল তাঁর সাথেই এবং আবু তালেবের জন্যই খাস। উপরের তিন প্রকার শাফাআত কেবল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ জন্যই নির্দিষ্ট।

৪) شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها তাওহীদপন্থীদের মধ্য হতে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে তথায় না পাঠানোর শাফা'আত: যেসব গুনাহগারদের জন্য

জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে জাহান্নামে না পাঠানোর জন্য নাবী ﷺ কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবেন।

৫) شفاعته ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ: জাহান্নামে প্রবেশকারী তাওহীদপন্থী একদল পাপী লোককে তা থেকে বের করার জন্য তিনি শাফাআত করবেন।

৬) شفاعته ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ في رفع درجات بعض أهل الجنة

জান্নাতের ভিতরে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ: জান্নাতবাসী কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাবী ﷺ শাফাআত করবেন।

৭) شفاعته ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم যাদের গুনাহর পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য সুপারিশ: কিয়ামাতের দিন যাদের গুনাহর পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য নাবী ﷺ শাফা'আত করবেন যে, তাদেরকে যেন জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। আলেমদের এক মত অনুযায়ী তারা হলেন আরাফবাসী।

৮) شفاعته ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে এক শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত: যেমন উক্কাশা বিন মিহসানের ব্যাপারে নাবী ﷺ এর শাফা'আত। উক্কাশা যখন শুনলেন, এই উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে, তখন তিনি আবেদন করলেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভূক্ত করেন। নাবী ﷺ তখন উক্কাশার জন্য উক্ত সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার দু'আ করলেন।[৬১]

---

৬১. সহীহ মুসলিম ২২০, সহীহ বুখারী ৫৭৫২।

এ শেষোক্ত পাঁচ প্রকারের শাফা'আত করার মধ্যে নাবী ﷺ এর সাথে আরো অনেকেই শরীক থাকবে। যেমন অন্যান্য নাবীগণ, ফেরেশতাগণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত সকল প্রকার শাফা'আতেই বিশ্বাস করে। কেননা সহীহ সূত্রে বর্ণিত অনেক দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত। তবে দু'টি শর্ত ছাড়া শাফাআত হবে না।

প্রথম শর্ত: শাফা'আতকারীকে শাফা'আত করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শাফা'আতের অনুমতি লাভ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

কে আছে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?" (সূরা বাকারা ২:২৫৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

"কোন শাফা'আতকারী এমন নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফা'আত করতে পারে (সূরা ইউনুস ১০:৩)।

দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَ﴾

"তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন"। (সূরা আম্বীয়া ২১:২৮) এ দু'টি শর্ত সূরা নাজমের ২৬ নং আয়াতে একসাথে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾

"আসমানে অনেক ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশও কোন কাজে

আসবেনা। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন"।

কাবীরা গুনাহয় লিপ্ত হয়ে যেসব মুমিন মৃত্যুবরণ করবে তাদের কেউ জাহান্নামের হকদার হলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য শাফা'আতের ব্যাপারে মুতাযেলা সম্প্রদায় লোকেরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে। সেই সাথে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার ব্যাপারেও শাফা'আত হওয়াকে মুতাযেলারা অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তারা শাফা'আতের উপরোক্ত প্রকারসমূহ থেকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকার শাফা'আতকেও তারা অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾

"সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না (সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:৪৮)।

তাদের কথার জবাব হলো, আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাফেরদের কোন কাজে আসবে না। তবে মুমিনদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে কতিপয় শর্তসাপেক্ষ সুপারিশ তাদের উপকার করবে।

মোটকথা শাফা'আতের ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে।

(১) এক শ্রেণীর লোক শাফা'আতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে। নাসারা, মুশরিক, সীমালংঘনকারী সুফী এবং কবর পূজারীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা যাদেরকে তা'যীম করে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাদের শাফাআতকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিকট পরিচিত শাফা'আতের মতই মনে করে থাকে। সুতরাং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাজে আসবে না।

(২) মুতাযেলা ও খারেজীরা শাফা'আতকে একদম অস্বীকার করেও সীমা লংঘন করেছে। তারা কবীরা গুনাহকারীদের জন্য নাবী ﷺ এবং অন্যদের শাফা'আতকে অস্বীকার করেছে।

(৩) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কুরআনের আয়াত এবং নাবী ﷺ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে। সুতরাং তারা শর্তসাপেক্ষ শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে।

إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها

কতিপয় গুনাহগারকে শাফা'আত ব্যতীত শুধু আল্লাহর রহমতেই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে জায়গা খালী থাকলে বা জান্নাতীদের তুলনায় জান্নাত অধিক প্রশস্ত হলে কী করা হবে?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া رحمه الله বলেন:

وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَفاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْآثَارِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ

কোন শাফা'আত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ও দয়ায় অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। দুনিয়াবাসীদের থেকে যারা জান্নাতবাসী হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পরেও জান্নাতে কিছু বাড়তি জায়গা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য নতুন কিছু মানুষ সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আখিরাতের জগতে যেসব বিষয় হবে যেমন হিসাব, ভাল আমলের ছাওয়াব, মন্দ আমলের শাস্তি প্রদান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ আসমানি কিতাবসমূহে এবং নাবীদের থেকে বর্ণিত ইলমের মধ্যে রয়েছে। মুহাম্মাদ ﷺ থেকে এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি তা অনুসন্ধান করবে, সে তা পেয়ে যাবে।

....

ব্যাখ্যাঃ (৯) কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে যত প্রকার শাফাআত হবে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঐসব লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার শাফা'আত, যারা ইতিমধ্যেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ প্রথমে তাদের বিষয়টি উল্লেখ করার পর এখানে উল্লেখ করেছেন যে, শাফা'আত ছাড়াও অন্য একটি কারণে অনেক লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে।

আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার রহমত, অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়া। সুতরাং তাওহীদপন্থী যেসব গুনাহগার মুমিনের অন্তরে একটি দানার চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান থাকবে, তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন" (সূরা নিসা ৪:৪৮) ।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ

«شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ»

"ফেরেশতাগণ শাফাআত করেছে, নাবীগণ শাফা'আত করেছেন এবং মুমিনগণও শাফা'আত করেছেন। এখন সবচেয়ে দয়ালু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো শাফা'আত বাকী নেই। অতঃপর তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে একমুষ্ঠি গ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে তিনি জাহান্নাম থেকে এমন একদল মানুষকে বের করবেন, যারা কখনো কোন ভাল আমলই করেনি" ।[৬২]

---

৬২ . সহীহ মুসলিম ১৮৩।

ويبقى في الجنة فضل জান্নাতে কিছু বাড়তি জায়গা থাকবে: অর্থাৎ দুনিয়াবাসীদের থেকে যারা জান্নাতবাসী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পরও তাতে প্রশস্ত জায়াগা খালী পড়ে থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে খুব প্রশস্ত করে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি সূরা আল ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"তোমরা দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা পৃথিবী ও আকাশের সমান। মুত্তাকী লোকদের জন্য উহা তৈরী করে রাখা হয়েছে"।

فَيُنْشِئُ اللَّهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন অনেক লোক।

فيدخلهم الجنة অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কেননা জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর রহমত। এর মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন। আর জাহান্নামে কেবল তাদেরকেই শাস্তি দিবেন, যারা হেদায়াতের দলীল পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলাহকে অস্বীকার করেছে এবং রসূলদেরকে অমান্য করেছে।

وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ الخ..... আখেরাতের জগতে যেসব বিষয় হবে..: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহি. আখেরাত দিবসের অবস্থা এবং তাতে যা হবে, উহা থেকে অনেক বিষয় উল্লেখ করার পর বাকীগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন। কেননা আখেরাতের বিষয়গুলো ইলমে গায়বের অন্তর্ভুক্ত, যা অহীর মাধ্যম ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه

তাকদীরের প্রতি ঈমান এবং তাতে যেসব বিষয় শামিল রয়েছে

[ঈমানের ছয়টি রুকনের একটি হচ্ছে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ বলেনঃ

وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ

নাজাতপ্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। উহার মধ্যে যেসব ভাল রয়েছে তার প্রতি এবং যেসব মন্দ রয়েছে, তার প্রতিও। তাকদীরের প্রতি ঈমানের দু'টি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই দু'টি জিনিসকে শামিল করে।

ব্যাখ্যাঃ القدر শব্দটি **قدرت الشيئ إذا أحطت بمقداره** এর মাসদার। অর্থাৎ যখন কোন জিনিস সম্পর্কে সকল দিক অবগত হওয়া যায়, তখন বলা হয় أحطت بمقداره "আমি উহার পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হয়েছি"। এই কথা আপনি ঠিক ঐ সময়ই বলে থাকেন, যখন সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছুই আপনি অবগত হতে সক্ষম হন।

কাদার বা তাকদীর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার ইলম রয়েছে। মাখলুকসমূহ সৃষ্টি করার আগেই আযালে (আদিতে) আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন।

পৃথিবীতে এমন কোন ঘটনা ঘটে না, যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেন নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই সে সম্পর্কে জানেন এবং সেই ঘটনার সাথে তাঁর ইচ্ছাও রয়েছে। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন

করা ঈমানের ছয় রুকনের একটি। তাকাদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা মানে উহার ভাল-মন্দ উভয়ের প্রতিই বিশ্বাস করা।

শাইখুল ইসলামের উক্তি: **وتؤمن الفرقة الناجية ــ أهل السنة والجماعة ــ بالقدر خيره وشره** **নাজী ফির্কা অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করে:** এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনা, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআন ও হাদীসের দলীলের দাবীও তাই। যেমন হাদীসে জিবরীলে এসেছে, জিবরীল যখন নাবী ﷺ কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বললেন:

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তাঁর ফেরেশতাদের উপর (৩) তাঁর কিতাবসমূহের উপর (৪) তাঁর রসূলদের উপর (৫) আখেরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর"।[৬৩]

এ হাদীসে নাবী ﷺ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নকে ঈমানের ষষ্ঠ রুকন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করবে, সে মুমিন হিসাবে গণ্য হবে না। তেমনি ঈমানের অন্য কোন রুকন অস্বীকার করলেও মুমিন হিসাবে গণ্য হবে না।

তাকদীরের প্রতি ঈমান দু'টি স্তরে বিভক্ত: শাইখুল ইসলাম এখানে উল্লেখ করেছেন যে, তাকদীরের প্রতি ঈমানের সর্বমোট চারটি স্তর রয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে এই স্তরগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ।

(১) প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার আযালী ইলম। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করার আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। বান্দারা যেসব আমল করে থাকে,

---

৬৩. সহীহ মুসলিম ৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

তা সম্পাদন করার পূর্বেই সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতিও সেই ইলমে আযালীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) সেই ইলম অনুযায়ী সবকিছু লাওহে মাহফুযে লিখে রাখা হয়েছে

(৩) যা কিছু ঘটে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই আল্লাহর (সৃষ্টি ও নির্ধারণগত) ইচ্ছা শামিল থাকে এবং তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতাধীন।

(৪) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম, নির্ধারণ এবং ইচ্ছা মোতাবেক সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্টি। এই হচ্ছে সংক্ষিপ্তাকারে তাকদীরের স্তরসমূহ। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

تفصيل مراتب القدر:

الدرجة الأولى وما تتضمنه الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلْقِ وَهُمْ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ

তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের স্তরসমূহের ব্যাখ্যা:

প্রথম স্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি ও বান্দাদের আমল সম্পর্কে তাঁর চিরন্তন ও অবিনশ্বর ইলম দ্বারা পূর্ণ অবগত এ বিষয়ে ঈমান আনা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷷ বলেন:

فَالدَّرَجَةُ الْأُولَى: الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلْقِ وَهُمْ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ ثُمَّ كَتَبَ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ : مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وَقَالَ تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا التَّقْدِيرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا وَمُنْكِرُوهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ

তাকদীরের প্রতি ঈমানের প্রথম স্তর হচ্ছে, অন্তর দিয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। আরো বিশ্বাস করা যে, বান্দারা যেসব আমল করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন ও অবিনশ্বর ইলম দ্বারা আগে থেকেই অবগত আছেন। সর্বদাই তিনি এই বিশেষণে বিশেষিত। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করার আগেও তিনি এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এখনো তা দ্বারা বিশেষিত আছেন এবং আবাদুল আবাদ এই বিশেষণে বিশেষিত থাকবেন। এই কথা বিশ্বাস করাও তাকদীরের প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি বান্দাদের সকল অবস্থা যেমন তাদের সকল প্রকার সৎ আমল, পাপাচার, রিযিক, বয়স ইত্যাদি সবকিছুই জানেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির তাকদীর সমূহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। তিনি সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে কলমকে আদেশ করলেন যে, লিখো। কলম বলল: কী লিখবো? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সবই লিখো।

সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই। আর যা তার জন্য ঘটার নয়, তা ঘটবেই না। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়"। (সূরা হজ্জ ২২:৭০) আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ২২ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে

রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ"। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইলমের অনুগামী এই তাকদীর বিভিন্ন স্থানে লিখা হয়। একই সময় একসাথে লিখা এবং বিভিন্ন সময় আলাদাভাবেও লিখা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন, লাওহে মাফুযে তাই লিখে রেখেছেন। আর যখন মাতৃগর্ভে শিশুর দৈহিক আকৃতি দান করেন, তখন তাতে রূহ ফুকে দেয়ার পূর্বে তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান এবং ফেরেশতাকে চারটি কথা লিখে দেয়ার আদেশ করা হয়। তাকে বলা হয়,

(১) রিযিক লিখে দাও,

(২) তার বয়স লিখে দাও,

(৩) সে কী আমল করবে তা লিখে দাও এবং

(৪) হতভাগ্য হবে না সৌভাগ্যবান হবে? তাও লিখে দাও। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও লিখার আদেশ করা হয়।

পূর্বকালের কাদারীয়াদের মধ্য হতে যারা তাকদীরকে অস্বীকার করায় সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করেছিল, তারা তাকদীরের এই স্তরকে অস্বীকার করতো। তবে বর্তমানে তাতে অবিশ্বীদের সংখ্যা খুবই কম।

ব্যাখ্যাঃ الأزل দ্বারা অতীতের এমন প্রাচীনত্ব, পূর্ববর্তীতা, অগ্রগামীতা, অগ্রবর্তীতা ও চিরন্তনতা বুঝানো হয়েছে, যার কোন শুরু নেই। আর الأبد দ্বারা ভবিষ্যতে এমন অবিনশ্বরতা, চিরন্তনতা, স্থায়িত্ব এবং টিকে থাকা বুঝানো হয়েছে, যার কোন শেষ নেই। الطاعات **শব্দটি** الطاعة এর বহুবচন।

শারীয়াতের আদেশ মেনে নেওয়াকে **الطاعة** (আনুগত্য) বলা হয়।

আর শারীয়াতের আদেশের বিরোধীতা করাকে **المعصية** (পাপাচার) বলা হয়। المعاصي **শব্দটি** المعصية এর বহুবচন। الأرزاق **শব্দটি** رزق (রিযিক) এর বহুবচন। মানুষের জন্য যা উপকারী হয়, তাই রিযিক। الآجال **শব্দটি** الأجل

-এর বহুবচন। কোন বস্তুর কিংবা কাজের সময়সীমাকে আজাল বলা হয়। মানুষের আজাল বলতে মৃত্যুর মাধ্যমে তার দুনিয়ার জীবনে বয়সের পরিসমাপ্তি বুঝায়।

লাওহে মাহফুয অর্থ হচ্ছে أم الكتاب 'মূল কিতাব'। মাহফুয অর্থ সংরক্ষিত। উহাতে কোন কিছু বাড়ানো কিংবা উহা থেকে কোন কিছু কমানো হতে এই কিতাবকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

ঈমান বিল কাদারের স্তর দু'টির মধ্য হতে প্রথম স্তরটি যেসব বিষয়কে শামিল করে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এখানে ঐসব বিষয় উল্লেখ করেছেন। মোট কথা তাকদীরের প্রথম স্তর দু'টি জিনিস বা স্তরকে শামিল করে।

প্রথম স্তরঃ আল্লাহ তা'আলার ইলম বিশেষণে বিশ্বাস করা, যা অস্তিত্বশীল কিংবা অস্তিত্বহীন সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এই ইলম আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত সিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত বিশেষণসমূহের মধ্যে গণ্য, যার মাধ্যমে তিনি সর্বদাই বিশেষিত। বান্দার ভাল-মন্দ আমলগুলো সম্পর্কে তিনি অবগত, তাদের রিযিক, বয়স ইত্যাদি সকল অবস্থা সম্পর্কেও তিনি অবগত।

দ্বিতীয় স্তরঃ তাকদীরের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে লিখার স্তর। আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে সমস্ত সৃষ্টির তাকদীর অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি হবে তাদের সকলের সমস্ত অবস্থা, হায়াত-রিযিক, আমল, পরিণতি-পরিণাম ইত্যাদি সবকিছুই লিখে রেখেছেন।

সুতরাং সৃষ্টিজগতে যা কিছু হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই অবগত আছেন এবং তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ উপরোক্ত স্তর দু'টির পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল পেশ করেছেন। সুন্নাতের দলীলগুলো থেকে শাইখ এ ব্যাপারে একটি হাদীসের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের শব্দগুলো ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনানে উবাদাহ বিন সামেত

ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি,

«أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ وقَالَ: وَمَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"আল্লাহ্ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম তাকে বললেন: লিখো। কলম বলল: হে আমার প্রতিপালক! কী লিখবো? আল্লাহ্ বললেন: কিয়ামাত পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর লিখো"।[৬৪]

এই হাদীস তাকদীর লিখার স্তর সাব্যস্ত করে। সেই সাথে আরো প্রমাণ করে যে, সবকিছুই লিখা রয়েছে।

فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ: এখানে أول এবং القلم শব্দ দু'টিকে এই হিসাবে নসব (যবর) দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে মোট বাক্য একটিই। তখন বাক্যটি হবে এ রকম: **أولَ ما خلق الله القلمَ قال له اكتب** (কলম সৃষ্টি করে আল্লাহ কলমকে আদেশ করলেন: তুমি লিখো)। এর অর্থ হলো কলম সৃষ্টির সময় কলমের প্রতি প্রথম আদেশ ছিল, তুমি লিখো।

أول এবং القلم শব্দ দু'টিকে রফা (পেশ) দিয়েও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন মোট বাক্য হবে দু'টি। তখন প্রথম বাক্যটি হবে **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَ مُ** (সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেছেন)। আর দ্বিতীয় বাক্যটি হবে **قَالَ لَهُ : اكْتُبْ** (কলমকে আদেশ করলেন: তুমি লিখো)। সবগুলো শব্দ মিলে তখন হাদীসের অর্থ হবে, সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে কলম।

---

৬৪ . সহীহ: আবূ দাউদ ৪৭০০, তিরমিযী ২১৫৫, সুনানুল কুবরা বাইহাকী ২০৮৭৫।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন: فَمَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই। আর যা তার জন্য ঘটার নয়, তা ঘটবেই না। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে:

সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই, এটি হাদীসের রাবী উবাদাহ ইবনে সামেতের উক্তি। অর্থাৎ মানুষ কল্যাণকর যেসব বিষয় অর্জন করে এবং ক্ষতিকর যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তা তার জন্য নির্ধারিত। তা অবশ্যই তার জন্য অর্জিত হবে। কখনো তার বিপরীত হবে না।

جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে: এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেই সবকিছু নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা লিখে শেষ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄এর হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে এখানে সে কথাই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে,

رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা লিখার পর কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।[৬৫] ইমাম তিরমিযী ﵀ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ কুরআনের দলীলগুলো উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

---

৬৫ . সহীহ: তিরমিযী ২৫১৬, মুসনাদে আহমাদ ২৬৬৯।

"তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখা আছে। আল্লাহর জন্য এটা একদম সহজ"। (সূরা হজ্জ ২২:৭০)

এখানে জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়নি; বরং আসমান-যমীনের সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর ইলম সাব্যস্ত করার জন্যই প্রশ্নটি করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনের সবকিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান উর্ধ ও নিম্ন জগতের সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। তাকদীরের এই স্তর হলো আল্লাহ তা'আলার ইলমের সম্পর্কে।

إن ذلك নিশ্চয়ই উহা, অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা আছে, তা আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে একটি কিতাবের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট যেই মূল কিতাব রয়েছে, তাতে সবই লিখা রয়েছে। এটি হচ্ছে তাকদীর লিখার স্তর।

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ **আল্লাহর জন্য এটা একদম সহজ:** অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে আসমান-যমীনের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করা এবং তা লিখে রাখা আল্লাহ তা'আলার জন্য মোটেই কঠিন নয়।

উপরের আয়াতে কারীমা থেকে জানা গেল, সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর ইলম রয়েছে এবং তা হওয়ার পূর্বেই লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাকদীরের প্রথম স্তরটি এই বিষয় দু'টিকেই শামিল করে।

শাইখ সূরা হাদীদের ২২ নং আয়াত থেকেও দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ আয়াতে আরো বলেন:

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে বিশেষ একটি কিতাবে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ"।

অর্থাৎ যমীনে যেই অনাবৃষ্টি, ফসলের ঘাটতি, ফলফলাদির কমতি দেখা দেয়, তোমাদের শরীরে যেই ব্যথা, রোগ-ব্যাধি এবং জীবনোপকরণে যেই সংকীর্ণতা অনুভব করো, তা বিশেষ একটি কিতাবে লিখা রয়েছে। অর্থাৎ লাওহে মাহফুযে তা লিখিত আকারে রয়েছে।

مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا **সৃষ্টি করার পূর্বে:** অর্থাৎ সৃষ্টি করার আগেই আমি প্রত্যেক জিনিসকে লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছি। আল্লাহর জন্য উহা একদম সহজ। অর্থাৎ মাখলুকের সংখ্যা ও পরিমাণ অনেক হওয়া সত্তেও সেগুলো লাওহে মাহফুযে লিখে রাখা আল্লাহ তা'আলার জন্য একেবারেই সহজ।

এই আয়াতে কারীমাতেও উর্ধ্ব ও নিম্নগতের ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার আগেই লাওহে মাহফুযে লিখে রাখার দলীল পাওয়া যায়। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, লিখার পূর্বেই উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং আয়াতটি তাকদীরের দু'টি স্তর অর্থাৎ আল্লাহর ইলম এবং সে অনুযায়ী সবকিছু লিখে রাখার অন্যতম একটি দলীল।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইঙ্গিত করেছেন যে, তাকদীর দুই প্রকার।

(১) সাধারণ তাকদীর, যা প্রত্যেক সৃষ্টিকেই একসাথে শামিল করে নিয়েছে। এটি হচ্ছে সেই তাকদীর, যা দলীল-প্রমাণসহ একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। লাওহে মাহফুযে এই প্রকার তাকদীর লিখা আছে।

(২) খাস (নির্দিষ্ট) তাকদীর। সাধারণ তাকদীরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও শ্রেণী বিন্যাসই হলো খাস তাকদীর। খাস তাকদীর আবার তিন প্রকার:

(ক) তাকদীরে উমুরী (**تقدير عمري**) তথা পুরো জীবনের তাকদীর

(খ) তাকদীরে হাওলী (**تقدير حولي**) তথা একবছরের তাকদীর এবং

(গ) তাকদীরে ইয়াওমী (**تقدير يومي**) তথা দৈনন্দিন তাকদীর।

শাইখুল ইসলামের উক্তি: **وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا** আল্লাহ তা'আলার ইলমের অনুগামী এই তাকদীর বিভিন্ন স্থানে লিখা হয়। একই সময় একসাথে লিখা এবং বিভিন্ন সময় আলাদাভাবেও লিখা হয়। সমস্ত মাখলুকের তাকদীর একসাথে একই সময় লাওহে মাহফুযে লিখা হয়েছে। এই আম তাকদীরকে আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ভাগ ভাগ করেও লিখা হয়। আর সেই স্থান ও সময়গুলো হচ্ছে:

১। তাকদীরে উমুরী এবং উহা লিখার স্থান ও সময়: যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসে এসেছে, মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই শিশুর উপর যে চারটি বাক্য লিখে দেয়া হয়, উহাই হচ্ছে তাকদীরে উমুরী। **লিখে দেয়া হয় তার রিযিক, তার বয়স, তার আমল এবং তার হতভাগ্য হওয়া কিংবা সৌভাগ্যবান হওয়ার কথা।**

২। তাকদীরে হাওলী এবং উহা লিখার সময়: লাইলাতুল কদরে বাৎসরিক তাকদীর লিখিত হয়। তাতে পুরো বছরের সকল বিষয় একসাথে লিখা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

"আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা হয় আমার আদেশক্রমে। আমিই প্রেরণকারী"। (সূরা দুখান ৪৪:৩-৫)

৩। **তাকদীরে ইয়াওমী:** হায়াত, মওত, সম্মান, অপমান ইত্যাদি আরো যা প্রতিদিন নির্ধারণ করা হয়, তাই দৈন্দিন তাকদীর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

"তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহানকার্যে রত আছেন" (সূরা আর্-রহমান ৫৫:২৯)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

(إن الله خلق لوحًا محفوظًا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابته نور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، يحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فكذلك قوله سبحانه: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}) رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم [رواه الحاكم (2/474) و (519) ــ وصححه! ــ وابن جرير الطبري (27/135) وأبو الشيخ في (العظمة) (2/492) والبيهقي في (الأسماء والصفات) (828)].

আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি সৃষ্টি হচ্ছে লাওহে মাহ্ফুয। সাদা মুক্তা দিয়ে তিনি এটি তৈরী করেছেন। তার উভয় পার্শ্ব তৈরী করা হয়েছে লাল রঙ্গের হিরা দিয়ে। কলমটি হচ্ছে নূরের তৈরী, কালিও নূরের। উহার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান-যমীনের মধ্যকার প্রশস্ততার সমপরিমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে দৈনিক তিনশ ষাট বার দৃষ্টি দেন। প্রত্যেকবার দৃষ্টি দেয়ার সময় কাউকে জীবিত রাখেন (কোন না কোন বস্তু সৃষ্টি করেন), কারো মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে অপমানিত করেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: **كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** "তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহান কার্যে রত আছেন", এর মর্মার্থ (সূরা আর্-রাহমান: ২৯)।[৬৬] ইমাম আব্দুর রায্যাক, ইবনুল মুনযির, তাবারানী এবং হাকেম এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাকদীর অস্বীকার করার ক্ষেত্রে পূর্বযুগের কাদারীয়া সম্প্রদায়ের যেসব লোক সীমালংঘন করেছে, তারা উপরোক্ত আম ও খাস উভয় প্রকার তাকদীরকে অস্বীকার করেছে। সৃষ্টিজগতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তা ঘটার পূর্বে সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইলম বা অবগতিকে তারা অস্বীকার করে। লাওহে মাহফুযে এবং অন্যান্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু পূর্বেই লিখে রেখেছেন, তারা তাও অস্বীকার করেছে।

---

৬৬. সহীহ: মুস্তাদরকে হাকিম ৩৯১৭

তারা আরো বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন। কিন্তু কারা সেই আদেশ মানবে, কারা সেই নিষেধ থেকে বিরত থাকবে, আদেশ বা নিষেধ বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন না। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে الأمر أنف "আল্লাহর কাছে সকল বিষয়ই নতুন"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম ও তাকদীরে আগে থেকে কিছুই নির্ধারিত নয়। যারা এই কথা বলেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে। তবে সীমা লংঘনকারী এই ফির্কার লোকেরা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের মাযহাবও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই শাইখুল ইসলাম বলেন: منكروه اليوم قليل বর্তমানে আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার কারীর সংখ্যা খুবই কম।

কাদারীয়াদের যেই ফির্কা এখনো রয়েছে, তারা আল্লাহর ইলমকে স্বীকার করে। তবে বান্দারা যেসব কাজ-কর্ম করে, তাদের মতে সেগুলো তাকদীরের মধ্যে শামিল নয়। এই ফির্কার লোকেরা মনে করে বান্দার কর্ম বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে, আল্লাহ তা'আলা উহা সৃষ্টি করেননি এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছাও করেননি। সামনে এ বিষয়ে আরো বিবরণ আসছে।

الدرجة الثانية وما تتضمنه:مَشِيئَةُ اللَّهِ النَّافِذَةُ وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ

তাকদীরের দ্বিতীয় স্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও তার ক্ষমতা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَشِيئَةُ اللَّهِ النَّافِذَةُ وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ لَا خَالِقَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ

তাকদীদেরর প্রতি ঈমান আনয়নের দ্বিতীয় স্তর বলতে আল্লাহ তা'আলার ঐ ইচ্ছাকে বুঝায়, যা প্রত্যেক জিনিসের উপরই বাস্তবায়ন হয় এবং তাঁর ঐ সার্বভৌম ক্ষমতাকে বুঝায়, যা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এই বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা কখনো সংঘটিত হয় না। আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত আসমান ও যমীনের কোন কিছুই নড়াচড়া করে না কিংবা স্থির হয় না এবং তাঁর রাজ্যের মধ্যে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অস্তিত্বশীল এবং অস্থিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোর স্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন রবও নেই।

....

ব্যাখ্যাঃ এখানে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ তাকদীরের প্রতি ঈমানের তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তর বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় স্তরের প্রতি তিনি এই বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, উহা হলো আল্লাহ তা'আলার ঐ ইচ্ছা, যা অবশ্যই কার্যকর হয় এবং তাঁর ঐ সার্বভৌম ক্ষমতাকে বুঝায়, যা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অবশ্যই বাস্তবায়ন হয়। তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে সেই ক্ষমতাকে বুঝায়, যা অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই বিদ্যমান।

وَهُوَ الْإِيمَانُ: তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের এই স্তরের অর্থ হলো এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করতে চান, তাই সৃষ্টি ও নির্ধারণ হয়। আর যা তিনি সৃষ্টি ও নির্ধারণ করার ইচ্ছা করেন না, তা কখনো সৃষ্টি ও নির্ধারণ হয়না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত আসমান ও যমীনের কোন কিছুই নড়াচড়া করে না কিংবা স্থির হয় নাঃ অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোন একটিও সংঘটিত হয়না।

তাঁর রাজ্যের মধ্যে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় নাঃ অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিগত ও নির্ধারণগত ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অস্তিত্বশীল এবং অস্থিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবানঃ কেননা আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন সকল বস্তুই এই ব্যাপকতার অধীন। অর্থাৎ তিনি অস্তিত্বশীলকে বিলীন করে দিতে এবং অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে সক্ষম।

فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোর স্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহঃ এই অংশের মধ্যে শাইখুল ইসলাম তাকদীরের চতুর্থ স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটি হচ্ছে সৃষ্টি করা এবং অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নের স্তর। আল্লাহ ছাড়া যা আছে, সবই মাখলুক। বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্মই

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই এবং তিনি ব্যতীত আর কোন রবও নেই।

শাইখ যখন তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের স্তরগুলো উল্লেখ করে শেষ করলেন, তখন এর সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু মাস'আলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

প্রথম মাস'আলাঃ তাকদীর ও শরীয়াত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। তাই তাকদীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করে শরীয়াতের বিরোধিতা করা হারাম।

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণে পাপাচার সংঘটিত হওয়া এবং পাপাচারের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা থাকাও পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা। তাই ঈমান, সৎ আমল, কুফরী ও পাপাচার সবই তাঁর সৃষ্টি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কুফরী ও পাপাচারকে ভালবাসেন। তিনি পাপাচারকে কখনো ভালবাসেন না; বরং ঘৃণা করেন।

তৃতীয় মাস'আলাঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সকল কাজ-কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন। বান্দারা তাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা সেই কাজ-কর্ম সম্পাদন করেন। এই দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়।

لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها

১-২। তাকদীর ও শরীয়াত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় এবং পাপাচার নির্ধারণ করা এবং সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করাও পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

উহা সত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তাঁর আদেশ অমান্য করতে এবং পাপাচারে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুত্তাকী, সৎকর্মশীল এবং ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি কাফেরদেরকে ভালবাসেন না এবং ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হন না। তিনি অশ্লীলতার আদেশ করেন না, তাঁর বান্দাদের কুফরী করাকে পছন্দ করেন না এবং ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে ভালবাসেন না।

....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম যখন তাকদীরের চারটি স্তর যথাক্রমে: ইলম, লিখা, ইচ্ছা করা ও সৃষ্টি করা, এই চারটি বিষয় সাব্যস্ত করলেন এবং আরো সাব্যস্ত করলেন যে, সৃষ্টিজগতে যা কিছু সৃষ্টি ও সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে, আল্লাহ তা‘আলা উহা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন, তিনি তা আগেই লিখে রেখেছেন, উহা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন ও ইচ্ছা করেছেন এবং তিনি উহা সৃষ্টি করেছেন, -পূর্বোক্ত বক্তব্যে ইহা সাব্যস্ত করার পর

এখানে বর্ণনা করছেন যে, উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তাঁর মধ্যে কোন বৈপরিত্য, পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষ নেই। পাপাচার সংঘটিত হওয়ার নির্ধারণ করা এবং উহাকে ঘৃণা করার মধ্যে কোন পারস্পরিক সংঘর্ষ, বিরোধ ও বৈপরিত্য নেই।

শাইখুল ইসলামের উক্তিঃ ومع ذلك উহা সত্ত্বেওঃ অর্থাৎ সকল বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবগতি, সবকিছু নির্ধারণ, সবকিছু লিখা এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা ও সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্য করার হুকুম করেছেন এবং তাঁর নাফরমানি করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহর কিতাব রাসূলের সুন্নাহতে এ বিষয়ে বহু দীলল রয়েছে। এগুলোতে তিনি তাঁর আনুগত্য করার আদেশ এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের (শরীয়তের) বিরোধীতা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা শরীয়ত ও হুকুম-আহকাম প্রেরণ করেছেন এবং সবকিছু সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। এগুলোর মাঝে কোন প্রকার পারস্পরিক সংঘর্ষ, অসংগতি ও বিরোধ নেই। যেমন ধারণা করে থাকে ঐ সমস্ত গোমরাহ সম্প্রদায়, যারা শরীয়তকে তাকদীরের বিপরীত মনে করে।

শাইখুল ইসলাম এ বিষয়ে তাঁর লিখিত অন্যতম একটি রেসালা 'তাদমুরিয়াতে' বলেনঃ গোমরাহ ফির্কার লোকেরা তাকদীরের বিষয়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্নিপূজক, মুশরিক এবং ইবলীসের দল।

ক) مجوسية অগ্নিপূজকঃ যারা আল্লাহ তা'আলার তাকদীরকে অস্বীকার করে, তারা এই উম্মতের মাজুসী। যদিও তারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধে বিশ্বাস করে। এই দলের সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ তা'আলার ইলম ও ইলম অনুযায়ী সবকিছু লিখে রাখাকে অস্বীকার করেছে। আর মধ্যমপন্থীরা ইলম ও লিখাকে স্বীকার করলেও তারা এই কথা স্বীকার করে না যে, সবকিছুর উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং কুদরতের অধীন। এরাই হলো মুতাযেলা এবং যারা তাদের অনুসরণ করে থাকে।

খ) مشركية মুশরিক: আর যারা তাকদীর ও আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় বিশ্বাসী, কিন্তু শরীয়তের আদেশ ও নিষেধকে অস্বীকার করেছে, তারা হলো মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

"এ মুশরিকরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না। এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা অবশেষে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। এদেরকে বলে দাও, তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমার কাছে পেশ করো। তোমরা তো নিছক ধারণার অনুসরণ করে চলছো। শুধু আন্দাজ করা ব্যতীত তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই" (সূরা আন'আম ১৪৮)।

যারা তাকদীর দিয়ে দলীল পেশ করে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বাতিল করে দেয়, তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

গ) إبليسية ইবলীসের দল: এ বিষয়ে তৃতীয় দলটি হচ্ছে ইবলীসের দল। তারা তাকদীর ও শরীয়াত উভয়কেই স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শরীয়াত ও তাকদীরকে পরস্পর সাংঘর্ষিক ও বিরোধী মনে করেছে। এর মাধ্যমে তারা হিকমত ও আদালতে ইলাহীয়ার মধ্যে আপত্তি করেছে। যেমন তাদের প্রথম উস্তাদ ইবলীস থেকে উহা উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটকথা আহলে বাতিলরা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে উপরোক্ত কথা বলে থাকে। হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফলকাম লোকেরা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে এবং শরীয়তকেও বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রভু ও মালিক। তিনি

যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা কখনো হয়না এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। ইলমের মাধ্যমে তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং প্রত্যেক জিনিসকে একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে সংরক্ষিত করে রেখেছেন।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ **আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুত্তাকী, সৎকর্মশীল এবং ইনসাফ কারীদেরকে ভালবাসেন:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রশংনীয় গুণে গুণান্বিত হয়, যেমন তাকওয়া, সৎকর্ম ন্যায়বিচার-ইনসাফ ইত্যাদি ভাল গুণে বিশেষিত হয়, তাকে ভালোবাসেন।

وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ **যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন:** যেমন অনেক আয়াতে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ আমল করে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাদেরকে ভালবাসেন।

وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ **কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না এবং ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হন না:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব স্বভাব ও বৈশিষ্টকে ঘৃণা করেন; যেমন কুফরী, পাপাচার এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট স্বভাব, যারা এ জাতিয় স্বভাব ও বৈশিষ্ট দ্বারা বিশেষিত হয়, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।

وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ **তিনি অশ্লীলতার আদেশ করেন না:** অশ্লীলতা বলতে ঐসব গুনাহ ও পাপের কথা ও কাজ বুঝায়, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত।

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ **তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না এবং ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে ভালবাসেন না:** কেননা কুফরী ও ফাসাদ অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ এবং তাতে রয়েছে দেশ ও জাতির জন্য অনেক ক্ষতি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন, যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা ও ভালবাসা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন উহাকে ভালবাসেন বলেই উহার ইচ্ছা করেন এবং কোন জিনিসকে যখন ভালবাসেন তখন উহার অর্থ এই যে, তিনি উহার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই কথা একদম বাতিল।

সঠিক কথা হলো আল্লাহ তা'আলার الإرادة (ইচ্ছা) এবং المحبة (ভালবাসা) পরস্পর সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও তাঁর ভালোবাসা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। এ দু'টির একটি অন্যটিকে আবশ্যক করেনা। আল্লাহ তা'আলা কখনো এমন জিনিসের ইচ্ছা করেন, যা তিনি পছন্দ করেন না এবং এমন জিনিস পছন্দ করেন, যা সংঘটিত করার ইচ্ছা করেন না।

প্রথমটির উদাহরণ হলো যেমন ইবলীস ও তার সৈনিকদেরকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা এবং আল্লাহ তা'আলার ঐ ব্যাপক ইচ্ছা, যা রয়েছে সৃষ্টিজগতের কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে। যদিও তিনি উহাকে ঘৃণা করেন এবং অপছন্দ করেন।

আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো, যেমন তিনি কাফেরদের ঈমান আনয়ন করাকে ভালবাসেন এবং তাদের থেকে আনুগত্যের কাজ সংঘটিত হওয়া পছন্দ করেন, কিন্তু তিনি তাদের থেকে উহা বাস্তবায়ন হওয়ার ইচ্ছা করেননি। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের দ্বারা উহা বাস্তবায়ন হতো।

لاتنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم

৩। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে তাকদীর নির্ধারণ করা (বান্দাদের কর্ম সৃষ্টি হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষেই বান্দাদের কাজ-কর্ম তাদের প্রতি সম্বন্ধ করার মধ্যে কোন পারস্পরিক বিরোধ নেই। বান্দারাই নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা তাদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

الْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً وَاللَّهُ خَالِقُهم وخالق أَفْعَالَهُمْ وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْمُصَلِّي وَالصَّائِمُ وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ وَاللَّهُ خَالِقُهُمْ وَقُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا

বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কাজগুলো সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কাজগুলোরও স্রষ্টা। বান্দাই মুমিন হয়, কাফির হয়, সৎকর্মশীল হয়, পাপাচারী হয়, মুসল্লী হয় এবং সিয়াম পালনকারী হয়। বান্দাদের কাজ-কর্ম করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। রয়েছে তাদের ইচ্ছা। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ক্ষমতা এবং ইচ্ছারও স্রষ্টা তিনিই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকভীরের ২৮-২৯ নং আয়াতে বলেছেন:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"এটা সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য একটা উপদেশ মাত্র। তোমাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়। আর তোমরা ইচ্ছা করলেই সত্য সরল পথে চলতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে সরল পথে চালানোর ইচ্ছা করেন"।

তাকদীরের এই স্তরকে কাদারীয়াদের অধিকাংশ ফির্কাই অস্বীকার করেছে। এই জন্যই নাবী ﷺ তাদেরকে এই উম্মতের মাজুসী তথা অগ্নিপূজক হিসাবে নামকরণ করেছেন।

ঐদিকে তাকদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে আরেক দল লোক (জাবরীয়া সম্প্রদায়) খুব বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করে ফেলেছে। এমনকি কাজ-কর্ম করার জন্য বান্দার কোন শক্তি, ইচ্ছা ও এখতিয়ার থাকার কথাকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে থাকে। শুধু তাই নয়; আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া-কর্ম এবং তাঁর হুকুম-আহকামের মধ্যে যেসব হিকমত এবং কল্যাণ রয়েছে তারা সেগুলোও অস্বীকার করে।

....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, পূর্বোক্ত সকল স্তরসহ তাকদীর সাব্যস্ত করার মধ্যে এবং বান্দারাই যে তাদের এখতিয়ার দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে এবং তারা যে তাদের ইচ্ছাতেই আমল করে, এর মধ্যে কোন বৈপরিত্য, পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং বিরোধ নেই।

এই অংশের মাধ্যমে শাইখুল ইসলামের উদ্দেশ্য হলো ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা, যারা বলে, যদি এটি সাব্যস্ত করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজ-কর্ম সৃষ্টি করেন এবং বান্দারাও তাদের নিজস্ব ইচ্ছা দ্বারা কাজ-কর্ম করে, তাহলে উভয় কথার মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ধারণা থেকেই বাতিলপন্থীদের একটি দল তাকদীর (আল্লাহর ইচ্ছা, শক্তি, ক্ষমতা, সৃষ্টি করা, সবকিছুর উপর তাঁর

একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সাব্যস্ত করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি বান্দার উপর থেকে কাজ-কর্ম করার ক্ষমতা এবং এখতিয়ারকে সম্পূর্ণরূপে তুলে নিয়েছে!!

বাতিলদের আরেকটি দল বান্দাদের কাজ-কর্ম এবং এখতিয়ার সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক সীমালংঘন করে ফেলেছে। এমনকি তারা বান্দাদেরকেই তাদের নিজস্ব কাজ-কর্মের স্রষ্টা হিসাবে নির্ধারণ করেছে। তারা আরো বলেছে যে, বান্দাদের কর্মের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই এবং বান্দাদের কাজ-কর্মের উপর আল্লাহর কোন ক্ষমতাও নেই!!

উপরে পরস্পর বিপরীতমুখী যে দু'টি গোমরাহ দলের আলোচনা করা হলো, তাদের **প্রথম দলটিকে বলা হয় জাবরীয়া**। কেননা তারা বলে বান্দা থেকে যা প্রকাশিত হয় কিংবা সে যেই কাজ ও নড়াচড়া করে, তাতে সে মাজবুর (বাধ্যগত)। তাতে তার কোন নিজস্ব এখতিয়ার, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। **আর দ্বিতীয় দলকে বলা হয় কাদারীয়া**। কারণ তারা তাকদীর তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে!!

সুতরাং শাইখের উক্তি: বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কাজগুলো সম্পাদন করে, -এর মাধ্যমে তিনি জাবরীয়াদের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তারা বলে, বান্দারা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই করে না। শুধু রূপকার্থে তাদের প্রতি কর্মসমূহের নিসবত (সম্বন্ধ) করা হয়েছে!!!

আর শাইখের কথা, وَاللَّهُ خَالِقُهم وخالق أَفْعَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কাজগুলোরও স্রষ্টা: এর মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয় ফির্কা তথা তাকদীরকে অস্বীকারকারী কাদারীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না; বরং বান্দারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়াই নিজেদের কর্মগুলো নিজেরাই সৃষ্টি করে!!

বান্দাই মুমিন হয়, কাফির হয়, সৎকর্মশীল হয়, পাপাচারী হয়, সলাত আদায়কারী হয় এবং সিয়ামপালনকারী হয়। বান্দাদের কাজ-কর্ম করার

নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে, রয়েছে তাদের ইচ্ছাঃ এতে জাবরীয়াদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দারা উপরোক্ত আমলসমূহে মাজবুর (বাধ্যগত) নয়। কেননা তাই যদি হতো তাহলে তাদেরকে উপরোক্ত বিশেষণগুলো দ্বারা বিশেষিত করা হতো না। কেননা মাজবুরের কাজকে তার দিকে নিসবত (সম্বোধন) করা হয় না, তা দ্বারা তাকে বিশেষিতও করা হয় না[৬৭] এবং মাজবুর (বাধ্যের) দ্বারা যা হয়, তাতে সে ছাওয়াবের হকদার হয় না কিংবা শাস্তিরও যোগ্য বিবেচ্য হয় না।

وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ তাকদীরের এই স্তরকে কাদারীয়াদের অধিকাংশ ফির্কাই অস্বীকার করেঃ এই স্তর বলতে আল্লাহ তা‘আলার সার্বিক ও সার্বজনীন ইচ্ছা, প্রত্যেক জিনিসই তাঁর ইচ্ছাতেই

---

৬৭. সুতরাং যাকে জোর করে বিষ পান করানো হয়, তার ব্যাপারে এটি বলা হয় না যে, অমুক ব্যক্তি বিষ পান করেছে; বরং বলা হয় বল প্রয়োগ করে বিষ পান করিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মানুষ তাকে দোষরোপ করে না। ঐদিকে যে নিজ ইচ্ছায় হাতে বিষ নিয়ে তা পান করে এবং নিজের জান বের করে দেয়, তাকে মানুষ দোষারোপ করে। সহীহ হাদীছে তাকে জাহান্নামী বলা হয়েছে।

এমনি বাতাস যাকে ছাদের উপর থেকে ফেলে দেয়, সে মারা গেলেও কেউ তাকে দোষারোপ করেনা; বরং তার জন্য আফসোস করে এবং দু‘আ করে। অনিচ্ছায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাকে শহীদ বলা হয়। পক্ষান্তরে স্ব-ইচ্ছায় কেউ ছাদের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করলে কিংবা গাড়ির নিচে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করলে কোন মানুষ তাকে ভালবাসে না।

এমনি বান্দা নিজ ইচ্ছাতে নামায পড়ে বলে তাকে নামাযী বলা হয়, সে নিজেই ঈমান আনয়ন করে বলেই তাকে মুমিন বলা হয় এবং সে নিজেই রোজা রাখে বলেই তাকে রোযাদার বলা হয়। অনুরূপ যে চুরি করে তাকে চোর বলা হয়, কিন্তু যার পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে চোর সাব্যস্ত করা হয়, তাকে কেউ চোর বলে না।

সুতরাং কোন্ কাজ মানুষের ইচ্ছাতে হয় আর কোন্ কাজ তাদের অনিচ্ছায় হয়, মানুষেরা তাদের বোধশক্তি দ্বারাই বুঝে ফেলে। তাদের ফয়সালাও হয় তার আলোকেই। ইসলামী শরীয়ত মানুষের উপর এমন আকীদাহ, বিশ্বাস ও আমল চাপিয়ে দেয়নি, যা মানুষের স্বাধীন বোধশক্তি উপলব্ধি করতে অক্ষম।

মোট কথা, তাকদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপচারে লিপ্ত হয়ে শরীয়তের সীমা লংঘন করে এই কথা বলা ঠিক নয় যে, আমার নিজস্ব ইচ্ছায় নামায ত্যাগ করিনা, মদপান করিনা কিংবা পাপাচারে লিপ্ত হইনা; বরং তাকদীরে লিখা আছে, তাই আমার দ্বারা এগুলো হচ্ছে এবং আমি এগুলো করতে বাধ্য। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি হেদায়াতের পথ দেখাও। আমীন

হওয়া এবং সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি, এই কথা বুঝায়। এই স্তরে ইহাও রয়েছে যে, বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কর্মসমূহ সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কর্মেরও স্রষ্টা। কাদারীয়ারা তাকদীরের এই স্তরকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা মতে বান্দাই তার নিজের কর্ম সৃষ্টি করে। এতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রয়োজন পড়ে না। এদেরকে নাবী ﷺ এই উম্মতের মাজুসী বলে নামকরণ করেছেন। কেননা এই মাস'আলাতে অগ্নিপূজকদের সাথে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে। অগ্নিপূজকরা দু'টি স্রষ্টা সাব্যস্ত করে। তারা নূর বা আলোকে ন্যায় ও কল্যাণের স্রষ্টা মনে করে এবং অন্ধকারকে অন্যায় ও অকল্যাণের স্রষ্টা মনে করে। সুতরাং তারা বলে কল্যাণ নূরের সৃষ্টি আর অকল্যাণ অন্ধকারের সৃষ্টি। এর মাধ্যমে তারা দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েছে।

কাদারীয়ারাও অগ্নিপূজকদের মতই। কেননা তারা আল্লাহর সাথে অন্যকেও স্রষ্টা সাব্যস্ত করেছে। তারা মনে করে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত বান্দারাই তাদের কর্ম সৃষ্টি করে থাকে। শুধু তাই নয়; তারা মনে করে বান্দারা নিজস্ব ও সতন্ত্র ক্ষমতা বলেই তাদের কর্ম সৃষ্টি করে।

নাবী ﷺ তাদেরকে এই উম্মতের অগ্নিপূজক বলেছেন, -এই কথা এক বাক্যে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। কেননা নাবী ﷺ এর যামানা পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের নিন্দায় যা বর্ণনা করা হয়, তার অধিকাংশই সাহাবীদের উপর মাওকুফ। অর্থাৎ এগুলোর সহীহ সনদ শুধু সাহাবীগণ পর্যন্তই পৌঁছে।

সুতরাং প্রথম দল অর্থাৎ কাদারীয়ারা বান্দার কর্ম সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এমনকি বান্দার কর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে বের করে ফেলেছে। আর জাবরীয়ারা বান্দাদের কর্মকে একদম অস্বীকার করেছে। এমনকি কাজ-কর্ম করার উপর বান্দাদের কোন ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকাকেই অস্বীকার করেছে।

শাইখুল ইসলাম বলেন: وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া-কর্ম এবং তাঁর হুকুম-আহকামের মধ্যে

যেসব হিকমত এবং কল্যাণ রয়েছে তারা সেগুলোও অস্বীকার করেঃ حكم শব্দটি حكمة এর বহুবচন। আর مصالح শব্দটি مصلحة এর বহুবচন। অর্থাৎ জাবরীরা যখন বান্দার কাজ-কর্ম থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং কাজ-কর্ম করার উপর বান্দার ক্ষমতা এবং এখতিয়ার থাকাকেও অস্বীকার করেছে, তখন এর মাধ্যমে তারা শরীয়াতের আদেশ ও নিষেধের মধ্যে যেই হিকমত, ছাওয়াব ও শাস্তি রয়েছে, তাও অস্বীকার করে ফেলেছে। তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এমন কাজের ছাওয়াব দেন, যা তাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এমন কর্মের কারণে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, যা তাদের কর্মের মধ্যে শামিল নয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এমন কাজের আদেশ করেন, যা করতে বান্দারা সক্ষম নয়। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলাকে যুলুম এবং নিরর্থক কাজ করার অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অপবাদের অনেক উর্ধ্বে।

حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة

ঈমানের হাকীকত বা পরিচয় এবং কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ هُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ؛ بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آية القصاص: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [الآية (178) من سورة البقرة]. وَقَالَ تعالى ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ الآيتان (9، 10) من سورة الحجرات . وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ اسْمَ الإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ؛ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية (92) من سورة النساء. وَقَدْ لاَ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ الْمُطْلَقِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ الآية (2) من سورة الأنفال. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: "لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ [رواه البخاري (2475)

ومسلم (57) عن أبي هريرة]. وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلاَ يُعْطَى الاسْمَ الْمُطْلَقَ، وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ.

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো দ্বীন ও ঈমান হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অন্তরের স্বীকারোক্তি ও জবানের ঘোষণা; আর অন্তরের আমল, জবানের আমল এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। সৎকাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজের কারণে তা কমে যায়।

উহা সত্ত্বেও অর্থাৎ সাধারণ পাপকাজ এবং কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান কমে গেলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত আহলে কিবলার কাউকে কাফের বলেন না। যেমন বলে থাকে খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা। বরং পাপাচারে লিপ্ত হলেও ঈমানের বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ব ঠিকই থাকে। যেমন কিসাসের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"তবে কোন হত্যাকারীর জন্য যদি তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ (সূরা বাকারাঃ ১৭৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

"ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াই করে, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু'দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারা যদি ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে

মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজুরাতঃ ৯-১০)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসিক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন বলে থাকে মুতাযিলারা। ফাসিকের মধ্যে মূল ঈমান বজায় থাকবে এবং তার জন্য 'মুমিন' নামও ঠিক থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

একজন মুমিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে" (সূরা নিসাঃ ৯২)।

তবে কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত মুমিন পূর্ণ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। পূর্ণ মুমিন হবে তারাই যাদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় (সূরা আনফাল ৮:২)। রসূল ﷺ বলেনঃ

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ولاينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»

"যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর। সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। এর পরও তার জন্যে তাওবার দরজা উন্মুক্ত

থাকে। এমন কোন ভদ্র লোক ছিনতাই করতে পারেনা, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উঁচু করে তাকিয়ে দেখে। সে যখন ছিনতাই করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না"।[৬৮]

উপরোক্ত গুনাহ্সমূহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমরা বলবো, তারা ত্রুটিপূর্ণ মুমিন অথবা বলবো, তার মধ্যে ঈমান থাকার কারণে সে মুমিন এবং কাবীরা গুনাহ থাকার কারণে সে ফাসিক। সুতরাং তাদেরকে পূর্ণ ঈমানদার বলা যাবে না এবং মুমিন নাম তার থেকে একেবারে ছিনিয়েও নেয়া হবে না।

....

ব্যাখ্যাঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি বলতে এখানে ঐসব মূলনীতি উদ্দেশ্য, যার উপর তাদের আক্বীদার ভিত্তি গঠিত। **الدين** শব্দের আভিধানিক অর্থ অবনত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। আর শরীয়াতের পরিভাষায় **هو ما أمر الله به** আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তাই দ্বীন।

الإيمان শব্দের আভিধানিক অর্থ التصديق (সত্যায়ন করা)। আর শরীয়াতের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা শাইখুল ইসলাম নিজেই উল্লেখ করেছেন। উহা হলোঃ **قَوْلٌ وَعَمَلٌ স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম।**

قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ. وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ

"অন্তরের স্বীকারোক্তি ও জবানের ঘোষণা, আর অন্তরের আমল (বিশ্বাস), জবানের আমল (স্বীকারোক্তি) এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়।

৬৮. সহীহ বুখারী ২৪৭৫, সহীহ মুসলিম ৫৭, ইবনে মাজাহ ৩৯৩৬, আবূ দাউদ ৪৬৮৯, তিরমিযী ২৬২৫।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমদের নিকট এটিই হলো ঈমানের সংজ্ঞা। উহা হচ্ছে স্বীকারোক্তি ও আমলের সমষ্টিগত নাম। স্বীকারোক্তি দুই প্রকার।

(১) অন্তরের স্বীকারোক্তি। উহা হলো অন্তরের বিশ্বাস।

(২) জবানের স্বীকারোক্তি। আর উহা হচ্ছে জবান দিয়ে ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করা।

আমল দুই প্রকার।

(১) অন্তরের আমল। নিয়ত এবং ইখলাসকে অন্তরের আমল বলা হয়।

(২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। যেমন সলাত, হাজ্জ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ইত্যাদি।

অন্তরের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে পার্থক্য হলো, অন্তরের আমল বলতে সেই আক্বীদা উদ্দেশ্য, যা অন্তর স্বীকার করে নেয় এবং বিশ্বাস করে। আর অন্তরের আমলসমূহ দ্বারা অন্তরের সেই নড়াচড়া ও স্পন্দন উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন। অন্তরের নড়াচড়া ও স্পন্দন বলতে ভাল কাজের প্রতি হৃদয়ের টান, ঝোক, ভালবাসা, সুদৃঢ় ইচ্ছা, খারাপ কাজের প্রতি অন্তরের ঘৃণা এবং তা বর্জনের প্রতি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাকে বুঝায়। অন্তরের কাজ থেকেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ এবং জবানের উক্তিসমূহের উৎপত্তি হয়। এই কারণেই জবানের কথাসমূহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহকে ঈমানের মধ্যে গণ্য করা হয়।

ঈমানের সংজ্ঞায় বিভিন্ন ফির্কার অভিমত:

(১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়।

(২) মুরজিয়াদের মতে শুধু অন্তরের বিশ্বাস এবং জবানের স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

(৩) কাররামীয়াদের মতে শুধু জবানের স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

(৪) জাবরীয়াদের মতে অন্তর দিয়ে শুধু স্বীকার করা কিংবা শুধু অন্তরের মারেফতকেই ঈমান বলা হয়।

(৫) মুতাযিলাদের মতে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়।

ঈমানের সংজ্ঞায় মুতাযেলা এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য হলো মুতাযেলাদের মতে কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তি থেকে ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হয় না; বরং তাকে ত্রুটিপূর্ণ মুমিন হিসাবে গণ্য করা হয়। মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে গেলেও সে তথায় চিরকাল থাকবেনা।

ঈমানের সংজ্ঞায় উপরোক্ত সব কথাই বাতিল। একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথাই সঠিক। তাদের কথার স্বপক্ষে অনেক দলীল রয়েছে।

وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ সৎকাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারের কারণে ঈমান কমে যায়:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি হলো ঈমানের তারতম্য হয়। কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে যায়। আনুগত্যের আমল ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং পাপাচার ও গুনাহ্র কারণে ঈমান কমে। কুরআন ও সুন্নাহ্র অনেক দলীল এই কথাকে সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে"। (সূরা আনফাল ৮:২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾

"যাতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় (সূরা ফাতাহ ৪৮:৪) এ ছাড়াও আরো অনেক দলীল রয়েছে।

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ

উহা সত্ত্বেও অর্থাৎ সাধারণ পাপকাজ এবং কাবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান কমে গেলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাবীরা গুনাহয় লিপ্ত আহলে কিবলার কাউকে কাফের বলে না। যেমন করে থাকে খারেজীরা:

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যদিও মনে করে যে, আমল ঈমানের মধ্যে শামিল এবং তা সৎ আমলের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে কমে যায়, তথাপিও তারা শির্ক ও কুফরী ব্যতীত অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত এমন কোন মানুষকে কাফের বলেনা, যে ইসলামের দাবী করে এবং কিবলামুখী হয়ে সলাত পড়ে। যেমন বলে থাকে খারেজীরা। তারা বলে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কবীরা গুনাহ্‌য় লিপ্ত হবে সে কাফের এবং আখেরাতে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। জাহান্নাম থেকে সে কখনো বের হবেনা।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মনে করে পাপাচারে লিপ্ত হলেও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ঠিক থাকে। সুতরাং কাবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তি আমাদেরই ঈমানী ভাই। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ কিসাসের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা উক্ত কথার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾

তবে কোন হত্যাকারীর জন্য যদি তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত (সূরা বাকারা ২:১৭৮)

আয়াতের তাৎপর্য হলো আঘাতকারীকে যদি আহত ব্যক্তি মাফ করে দেয় কিংবা নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ ক্ষমা করে দেয় এবং কিসাসের বদলে রক্তপন নিতে রাজী হয়, তাহলে মালের হকদারের উচিৎ কঠোরতা পরিহার করে ন্যায়ভাবে উহা তলব করা। অর্থ পরিশোধের দায়ভার যাদের উপর বর্তাবে তাদেরও উচিৎ হবে কোন প্রকার বাহানা ব্যতীত হকদারদের নিকট হক বুঝিয়ে দেয়া। উক্ত আয়াত থেকে এভাবে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, হত্যা করা কাবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা গেল, হত্যা করার পরও হত্যাকারীর সাথে ঈমানের ভিত্তিতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অবশিষ্ট থাকে।

শাইখুল ইসলাম আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা আরো দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা (সূরা হুজুরাত ৪৯:৯) বলেন:

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

"ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াই করে, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। উপরোক্ত আয়াতে কারীমা দু'টি দ্বারা এভাবে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সীমালংঘন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুমিন হিসাবেই নামকরণ করেছেন। সেই সাথে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ভাই হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

“অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও” (সূরা হুজুরাত ৪৯:১০)।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো যখন মুসলিমদের দুই দল পরস্পর লড়াই শুরু করবে, তখন অন্যান্য মুসলিমদের উচিৎ তাদের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা করা এবং আল্লাহ তা‘আলার হুকুম মেনে নেয়ার আহবান জানানো। মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করার পরও যদি দুইদলের একদল অন্যদলের উপর যুলুম করে এবং মীমাংসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো এই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহর হুকুম ও ফয়সালা মানতে বাধ্য করা। অতঃপর বিদ্রোহী দল যদি সীমালংঘন ও বিদ্রোহ পরিহার করে আল্লাহর হুকুমের দিকে চলে আসে এবং আল্লাহর কিতাব ও ফয়সালা মেনে নিতে রাজী হয়, তাহলে মুসলিমদের উচিৎ, মীমাংসা ও ফয়সালা করার সময় উভয় দলের মধ্যে ইনসাফ করা। তারা আল্লাহ তা‘আলার হুকুম মোতাবেক ফয়সালা করার জন্য সঠিক রায়ের অনুসন্ধান করবে এবং বল প্রয়োগ করে সীমালংঘনকারী যালেম দলকে ফিরিয়ে আনবে। যাতে যুলুম থেকে তারা ফিরে আসে এবং অন্য দলের জন্য যেই হক তাদের উপর রয়েছে, তা পরিশোধ করে।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বিশেষভাবে বিবাদরত দুই দলের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে মীমাংসা করার আদেশ দেয়ার পর সমস্ত মুসলিমকেই তাদের সকল বিষয়ে ন্যায়নীতি অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“তোমরা ইনসাফ করো। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন”(সূরা হুজুরাত ৪৯:৯)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই (সূরা হুজুরাত ৪৯:১০)।

এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য। পূর্বের বাক্যে বিবাদরত দুই দলের মধ্যে মীমাংসা করার যেই আদেশ দেয়া হয়েছে, এই বাক্যে উহাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই আয়াতের অর্থ হলো মুসলিমগণ মাত্র একটি বিষয়ের দিকেই ফিরে যাবে। সেটি হচ্ছে ঈমান। সুতরাং তারা সকলেই দ্বীনী ভাই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজুরাত ৪৯:১০)।

অর্থাৎ বিবাদ ও সংগ্রামরত প্রত্যেক দুই মুসলিমের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এখানে দুইজনকে খাস করার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, দুইয়ের অধিক মুসলিম লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করার আরো বেশী প্রয়োজন পড়বে।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **واتقوا الله** তোমরা তোমাদের সকল বিষয়েই আল্লাহকে ভয় করো। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করার কারণে **لعلكم ترحمون** আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হতে পারো।

وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ اسْمَ الإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ : তারা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসেক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন মনে করে থাকে মুতাযিলারাঃ

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হলো তারা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসেক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন বলে থাকে মুতাযেলারা।

الفسق শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করা। তবে এখানে ফাসিক বলতে উদ্দেশ্য হলো যে মুসলিম হারাম মনে করেও কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত হয়। যেমন মদ পান করা, যেনা করা, চুরি করা ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলামীয়ার উপর রয়েছে এবং কাফিরে পরিণত হওয়ার মত কোন গুনাহ্য় লিপ্ত হয় না তাকে **الفاسق الملّي** বলা হয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত কোন লোক কুফরী ব্যতীত অন্য গুনাহ্য় লিপ্ত হলে তাকে ইসলামের বন্ধন থেকে খারিজ করে দেয় না এবং দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় তার উপর কুফরীর হুকুমও লাগায় না। যেমন খারেজীরা তাকে দুনিয়ার হুকুমে কাফের বলে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাকে মৃত্যুর পর চিরকাল জাহান্নামীও মনে করে না। অর্থাৎ আখেরাতে তার উপর চিরকাল জাহান্নামী হওয়ার হুকুম লাগায় না এবং জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সে চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে বলে বিশ্বাস করে না। যেমন বলে থাকে মুতাযেলা এবং খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা।

তবে মুতাযেলারা কাবীরা গুনাহয় লিপ্ত ফাসেকের জন্য মুসলিম কিংবা কাফের কোন নামই ব্যবহার করে না; বরং তাদের মতে সে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী একটি স্তরে অবস্থান করে। তাদের মতে দুনিয়ার জীবনে কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত মুসলিম উল্লেখিত হুকুমের মধ্যে থাকবে। তবে আখিরাতের হুকুমে খারেজীদের মতানুযায়ী তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে থাকে। তাদের এই মাযহাব বাতিল। কুরআন ও হাদীসের একাধিক দলীল তাদের কথাকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করে। কিছু দলীল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর বাকী দলীলগুলো সামনে আসছে।

অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক দলীলের আলোকে মুসলিম মিল্লাতের ফাসেক লোকের জন্য যেই হুকুম প্রযোজ্য, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ এখানে উহা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: ফাসেক সাধারণত: ঈমানের মধ্যেই থাকবে। কেননা ঈমানকে কামেল (পূর্ণ) ঈমান এবং নাকেস (অপূর্ণ) ঈমান, -এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। তাই ফাসেক পূর্ণ মুমিন নয়; কিন্তু সে ঈমান থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

"আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মুমিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিতে হবে"(সূরা নিসা ৪:৯২)।

দাসমুক্তির জন্য যেখানে ঈমান শর্ত করা হয়েছে, যেমন যিহার ও হত্যার কাফফারা, সেখানে আযাদকৃত দাস যদি ফাসেকও হয়, তাহলে সকল আলিমের মতে সেই ফাসেক দাস মুক্ত করা যথেষ্ঠ হবে। কেননা আয়াতের সাধারণ অর্থ থেকে ইহাই বুঝা যায়। যদিও আযাদকৃত গোলাম পূর্ণ ঈমানদার না হয়। কেননা দাসমুক্ত করার সময় দাসের মধ্যে পূর্ণ ঈমান থাকা জরুরী নয়।

শাইখুল ইসলাম বলেনঃ সাধারণভাবে ঈমান বলতে যখন পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য হবে, তখন ইসলামী মিল্লাতের ফাসেক লোক সেই পূর্ণ ঈমানের মধ্যে শামিল হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে পূর্ণ মুমিনের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়" (সূরা আনফাল ৮:২)।

এই আয়াতে কারীমায় ঈমান বলতে ঈমানে কামেল (পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য)। ফাসেক এই প্রকার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ। এই আয়াতের তাফসীরের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে إنما শব্দটি সীমাবদ্ধ করার অর্থ প্রদান করে। বাক্যের মধ্যে إنما -এর পরে যে বিশেষ্য উল্লেখ থাকে, إنما অব্যয় দ্বারা বাক্যের হুকুমকে শুধু তার জন্যই খাস করা হয় এবং অন্যদের থেকে উহা অস্বীকার করা হয়।

الْمُؤْمِنُونَ মুমিনগণঃ অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার তো তারাই, যাদের বৈশিষ্ট হলো, **إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ** "যখন আল্লাহর যিকির করা হয়" অর্থাৎ তাঁর বড়ত্ব, ক্ষমতা

এবং পাপীদেরকে যা দিয়ে তিনি ভীতি প্রদর্শন করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ তখন তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ "আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়", অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আয়াতগুলো পাঠ করা হয় কিংবা তাঁর সৃষ্টিগত নিদর্শনসমূহ উল্লেখ করা হয়, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শন পাঠ করার কারণে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ **"তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে":** অর্থাৎ তারা তাদের সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করে; অন্য কারো নিকট নয়। অতঃপর শাইখুল ইসলাম হাদীস থেকে এমন একটি দলীল পেশ করেছেন, যা প্রমাণ করে, মুসলিম মিল্লাতের ফাসিক ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদারদের মধ্যে গণ্য হবে না। রসূল ﷺ বলেন:

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর। সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। এরপরও তার জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি এমন কোনো মূল্যবান বস্তু ছিনতাই করে, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উঁচু করে দেখে, সে যখন তা ছিনতাই করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না।[৬৯]

অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার থাকে না। সুতরাং এখানে যেনাকারী, চোর এবং মদ্যপায়ী থেকে যেই ঈমানকে নফী করা হয়েছে, তা দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা

৬৯ .সহীহ বুখারী ২৪৭৫, সহীহ মুসলিম ৫৭, ইবনে মাজাহ ৩৯৩৬, আবূ দাউদ ৪৬৮৯, তিরমিযী ২৬২৫।

উদ্দেশ্য; মূল ঈমান উদ্দেশ্য নয়। কেননা ব্যভিচারী, চোর এবং মদ্যপায়ী মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি প্রমাণ করে যে, এই সমস্ত লোক যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের থেকে ঈমানের পূর্ণরূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়; পুরোটাই বিলুপ্ত হয়না। কুরআন ও হাদীসের অনেক দলীল প্রমাণ করে যে, উপরোক্ত গুনাহসমূহে লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা মুরতাদ হয়ে যায়না। সুতরাং জানা গেল, এই হাদীসে যেই ঈমানকে নফী করা হয়েছে, তা দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা উদ্দেশ্য; মূল ঈমান উদ্দেশ্য নয়।

ولاينتهب نهبة ذات شرف ছিনতাইকারী এমন কোন মূল্যবান জিনিস ছিনতাই করতে পারে না, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উঁচু করে তাকিয়ে দেখে। সে যখন ছিনতাই করে, ছিনতাই করার সময় সে মুমিন থাকে না: النهبة শব্দটির নুন বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। ছিনিয়ে নেয়া বস্তুকে নুহবাহ বলা হয়। শক্তি প্রয়োগ করে এবং জবরদখল করে মাল আত্মসাৎ করাকে النهب বলা হয়। ذات شرف বলতে দামী জিনিস উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ذات شرف দ্বারা এমন উঁচু মানের জিনিস উদ্দেশ্য, যার দিকে লোকেরা তাকিয়ে থাকে এবং চোখ তুলে চেয়ে দেখে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম পূর্বোল্লেখিত আলোচনার ফলাফল উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে মুসলিম মিল্লাতের ফাসেক লোকের আসল হুকুম বের করেছেন। তিনি বলেছেন: আমরা বলি, সে হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদার অথবা তার মধ্যে যেহেতু ঈমান রয়েছে সে কারণে সে মুমিন এবং যেহেতু কবীরা গুনাহ রয়েছে, তাই সে ফাসেক। এটিই হচ্ছে ইনসাফপূর্ণ হুকুম। এতে যেসব দলীল তাকে ঈমান থেকে খারিজ করে দিয়েছে যেমন রাসূল ﷺ বলেন: “যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না.......এবং যেসব দলীল তার জন্য ঈমান সাব্যস্ত করেছে, যেমন পূর্বোক্ত কিসাসের আয়াত এবং বিদ্রোহীদের হুকুম সম্পর্কিত আয়াত, -এই উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় হয়ে গেছে। এর উপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, তাকে المؤمن المطلق তথা পূর্ণ মুমিন নাম দেয়া যাবে না এবং مطلق المؤمن অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত ঈমান থেকে তাকে খারিজ করে দিয়ে মুতাযিলা ও

খারিজীদের মত তাকে ঈমান থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিস্কারও করে দেয়া যাবে না। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, الإيمان المطلق বলতে কামেল (পূর্ণ) ঈমান উদ্দেশ্য এবং مطلق الإيمان বলতে ত্রুটিযুক্ত ঈমান উদ্দেশ্য।

الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم

সাহাবীদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা এবং তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা আবশ্যক

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার মূলনীতি হলো, সাহাবীদের দোষ-ত্রুটি থেকে তারা তাদের অন্তর ও জবান পবিত্র রাখে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ الآية (10) من سورة الحشر . وَطَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»[رواه البخاري (3673) ومسلم (2541) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة].

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরো একটি মূলনীতি হলো, তারা রসূল ﷺ এর সাহাবীদের প্রতি তাদের অন্তর ও জবান পবিত্র রাখে। অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালবাসে, তাদের প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা রাখে না এবং জবান দিয়ে তাদের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বাণীতে সাহাবীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

“এবং যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলেঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু” (সূরা হাশর ৫৯:১০)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আরেকটি মূলনীতি হলো নাবী ﷺ এর এই হাদীসের আনুগত্য করা। তিনি বলেনঃ

لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

“তোমরা আমার কোন সাহাবীকে গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার সমানও ছাওয়াবও পাবে না”।[৭০]

এই হাদীসের আনুগত্য করতে গিয়েই তারা তাদের অন্তর ও জবানকে সাহাবীদের জন্য পবিত্র রাখে।

....

ব্যাখ্যাঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকদের অন্যতম আক্বীদা হলো, তারা অন্তরকে সাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণাবোধ পোষণ করা থেকে পবিত্র রাখে। তারা তাদের জবানকেও সাহাবীদেরকে দোষারোপ করা, লানত করা এবং গালি দেয়া থেকে মুক্ত রাখে। কেননা তাদের রয়েছে অনেক ফাযীলাত। তারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নাবী ﷺ এর সাহাবী হয়ে ধন্য হয়েছেন। তাদের রয়েছে উম্মতের সমস্ত মুসলিমের উপর বিশেষ ফাযীলাত। কেননা তারাই নাবী ﷺ থেকে সরাসরি ইসলামী শরীয়ত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের পরবর্তীদের জন্য পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারা রাসূল ﷺ এর সাথে জেহাদ করেছেন এবং তারা তাকে সাহায্য করেছেন।

---

৭০. সহীহ বুখারী ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম ২৫৪১।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ ঐ সমস্ত রাফেযী এবং খারেজীদের প্রতিবাদ করার জন্যই এই অধ্যায় রচনা করেছেন, যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয়, তাদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের ফাযীলাতগুলোর স্বীকৃতি দেয়না। এই নিকৃষ্ট মাযহাবের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার বিষয়টিও শাইখুল ইসলাম অত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের নাবীর সাহাবীদের ব্যাপারে ঐরূপ ব্যবহারই করে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু" (সূরা হাশর ৫৯:১০)।

অর্থাৎ যারা মুহাজির ও আনসারদের পরে আগমন করেছে। তারা উম্মতে ইসলামীয়ার ঐসব লোক, যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত উত্তমভাবে সাহাবীদের অনুসরণ করবে। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এই দু'আ করতে থাকবে যে, ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ "হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করো, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের পূর্বে আগমনকারী মুহাজির ও আনসারদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করে। এখানে ভাই বলতে দ্বীনি ভাই উদ্দেশ্য এবং غِلًّا দ্বারা খেয়ানত, বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং হিংসা উদ্দেশ্য। তারা আরো দু'আ করে যে, ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ "হে আমাদের রব! সেইসব মুমিনদের প্রতিও আমাদের অন্তরে কোন হিংসা ও ঘৃণাবোধ রেখো না, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে"। সর্বপ্রথম সাহাবীগণই এই শ্রেণীর

মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তারাই সর্বোত্তম মুমিন এবং এখানে তাদের ব্যাপারেই আলোচনা চলছে।

ইমাম শাওকানী ﷺ বলেনঃ যারা সকল সাহাবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো না এবং তাদের জন্য আল্লাহর রেজামন্দি কামনা করলো না তারা এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করলো। সেই সাথে যার অন্তরে সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পাওয়া যাবে, সে শয়তানের প্ররোচনার কবলে পড়েছে এবং সে আল্লাহর অলীদের ও আখেরী নাবীর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের সাথে দুশমনী করে আল্লাহ তা'আলার বিরাট নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং সে তার নিজের জন্য লাঞ্ছনার এমন দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। যদি না সে স্বীয় নফসকে সংশোধন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁর কাছেই ফরিয়াদ করে। আর সর্বোত্তম মানুষ এবং উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি তার অন্তরের বিদ্বেষ টেনে বের না করে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সাহাবীদের প্রতি কারো অন্তরের বিদ্বেষ যদি সীমা অতিক্রম করে তাদের কাউকে গালি দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে সে শয়তানের রশিতে নিজেকে বেঁধে দিল এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিতে পতিত হলো। এই কঠিন রোগে কেবল ঐ ব্যক্তিই আক্রান্ত হতে পারে, যে রাফেযীদের কোন উস্তাদ কিংবা উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের দুশমনের প্ররোচনার শিকার হয়েছে। তারাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যাদের সাথে শয়তান খেলতামাশায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য হরেক রকম মিথ্যা রচনা করেছে, বানোয়াট কিচ্ছা তৈরী করেছে, নানা কুসংস্কার এবং অলীক কাহিনী রচনা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে আল্লাহর ঐ কিতাব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, যার সামনের দিক থেকে কিংবা পিছন দিক থেকে বাতিল আসতেই পারে না।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় সাহাবীদের ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে। কেননা তারা ঈমান আনয়নে অগ্রণী ছিলেন। আয়াতে কারীমায় ঐসব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ফাযীলাতও বর্ণিত হয়েছে, যারা সাহাবীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। যারা সাহাবীদের সাথে শত্রুতা

পোষণ করে, তাদের নিন্দাও করা হয়েছে এখানে। আয়াতে কারীমায় সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করাও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের প্রতি আহলে সুন্নাতের লোকদের অন্তর ও জবানসমূহ পবিত্র থাকার কথাও জানা যায়। তাদের কথা:

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু" (সূরা হাশর ৫৯:১০)।

-এই কথার মধ্যে তাদের জবানের পরিশুদ্ধিতা পাওয়া যায়। তাদের কথা: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ "হে আমাদের রব! সেইসব মুমিনদের প্রতিও আমাদের অন্তরে কোন হিংসা ও ঘৃণাবোধ রেখো না, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে", -এই কথার মধ্যে তাদের অন্তরের পরিশুদ্ধিতার এবং পবিত্রতারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আয়াতে আরো দলীল পাওয়া যায় যে, সাহাবীদেরকে গালি দেয়া এবং তাদেরকে ঘৃণা করা হারাম। তাদেরকে গালি দেয়া কিংবা ঘৃণা করা মুসলিমদের কাজ হতে পারে না। যারা এটি করবে, তারা 'ফাই'[৭১]এর সম্পদ থেকে কিছুই পাবে না।

وَطَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ নাবী ﷺ এর এই হাদীসের আনুগত্য করাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি, তা করতে গিয়েই তারা তাদের অন্তর ও জবানকে সাহাবীদের জন্য পবিত্র রাখে:

অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের লোকেরা সাহাবীদের প্রতি জবান এবং অন্তর

৭১. বিনা যুদ্ধে মুসলিমগণ কাফেরদের থেকে যে সম্পদ হাসিল করে, তাকে ফাই বলা হয়।

পরিশুদ্ধ রেখে এবং তাদেরকে গালি দেয়া ও তাদের মর্যাদায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নাবী ﷺ এর আনুগত্য করে থাকেন। কেননা তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেছেন, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না"। أصحاب শব্দটি صاحب -এর বহুবচন। যেই মুসলিম নাবী ﷺ এর সাহচর্য লাভ করেছে, সেই সাহাবী। সুতরাং সাহাবী বলা হয়, ঐ মুসলিমকে, যে মুমিন অবস্থায় নাবীকে দেখেছে এবং ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ করেছে।

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তিনি এই কসমের দ্বারা পরের কথাটিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। রসূল ﷺ বলেন,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهُ

"তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে, তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার সমান ছাওয়াবও পাবে না"। উহুদ মদীনার একটি সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম। অন্যান্য পাহাড় থেকে আলাদা থাকায় এটিকে উহুদ পাহাড় বলা হয়। ذهبا শব্দটি তামীয হিসাবে মানসুব হয়েছে। নাবী ﷺ এর 'সা'এর এক চতুর্থাংশকে মুদ বলা হয়। মুদ একটি পরিমাপ যন্ত্রের নাম। نِصْف কে نصيف ও বলা হয়। যেমন ثمين শব্দটি ثمن অর্থে ব্যবহৃত হয়। نِصْف ও نصيف উভয়ের অর্থই অর্ধেক। এমনি ثمين এবং ثمن উভয়েরই অর্থ মূল্যবান ও মূল্য।

হাদীসের সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো, আল্লাহর রাস্তায় সাহাবী ছাড়া অন্যদের প্রচুর দান সাহাবীদের সামান্য দানের সমপরিমাণ হতে পারেনা। এর কারণ হলো ইসলামের প্রথম যুগে যখন মুসলিমদের সংখ্যা অল্প ছিল, ইসলামের সামনে প্রতিবন্ধক ছিল প্রচুর এবং দাওয়াত ছিল দুর্বল তখন সাহাবীদের অন্তরের ঈমান যত বড় ছিল, পরবর্তীতে আগমনকারী কারো পক্ষে তত বড় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হবেনা।

মোটকথা হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, তাতে সাহাবীদেরকে গালি দেয়া হারাম করা হয়েছে এবং অন্যদের উপরে তাদের ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, আমলকারীর নিয়ত এবং যেই সময়ে আমলটি করা হয়েছে, সেই অনুপাতে আমলের ফাযীলাত কমবেশী হয়। (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)

এই হাদীস থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া গেল, যে ব্যক্তি সাহাবীদেরকে ভালবাসলো এবং তাদের গুণাবলী বর্ণনা করলো, সে রসূল ﷺ এর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে গালি দিলো এবং ঘৃণা করলো, সে রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم

সাহাবীদের ফাযীলাত সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান এবং তাদের ফাযীলাতের তারতম্য

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلَ وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ لأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا ثَلاثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ "اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"[رواه البخاري (3007) ومسلم (2494) عن أنس]. وَبِأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، بَلْ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ. وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، كَالْعَشَرَةِ، وَثَابِتِ بْنِ قِيْسِ بنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ. وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانُ فِي الْبَيْعَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ: وَسَكَتُوا أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيٍّ وَقَدَّم قَوْمٌ عَلِيًّا وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا لَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيٍّ

সাহাবীদের ফাযীলাতে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এবং মুসলিমদের ঐকমত্যে সাহাবীদের যেসব ফাযীলাত এবং মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা কবুল করে নেন। যারা বিজয় তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে খরচ করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছেন তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ঐসব লোকের উপর প্রাধান্য দেন, যারা উক্ত ঘটনার পরে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে। তারা মর্যাদার ক্ষেত্রে মুহাজিরদেরকে আনসারদের উপর প্রাধান্য দেন। তারা আরো বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবীর ব্যাপারে বলেছেন: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি"।[৭২]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী ﷺ এর সংবাদ অনুসারে আরো বিশ্বাস করে, যারা হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে বাইআত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[৭৩] শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন।[৭৪]

নাবী ﷺ যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তারা তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী, ছাবিত বিন কাইস বিন শাম্মাস এবং আরো যাদেরকে নাবী ﷺ জান্নাতী বলেছেন, তাদেরকেও তারা জান্নাতী বলে।[৭৫]

আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালেব رضي الله عنه এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে মর্মে বর্ণিত হাদীসকে স্বীকৃতি দেয়। নাবী ﷺ তাতে বলেছেন, নাবীর পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর

---

৭২. সহীহ বুখারী ৩০০৭, সহীহ মুসলিম ২৪৯৪, তিরমিযী ৩৩০৫, আবূ দাউদ ৪৬৫৪, দারিমী ২৮০৩।

৭৩. সহীহ: তিরমিযী ৩৮৬০, সহীহ মুসলিম ২৪৯৬।

৭৪. সহীহ বুখারী ৪১৫৪।

৭৫. সহীহ: ইবনে মাজাহ ১৩৩-১৩৪, আবূ দাউদ ৪৬৪৮, তিরমিযী ৩৬৯৬।

ﷺ, অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ। আবু বকর ও উমারের পরে তারা উছমান বিন আফফান ﷺ কে তৃতীয় খলীফা এবং আলী ﷺ কে চতুর্থ খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।[৭৬] এ বিষয়ে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং হুদায়বিয়ার দিন বাইআতের ক্ষেত্রে উছমান ﷺ কে আলী ﷺ এর উপর প্রাধান্য দেয়ার উপর সাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কতিপয় আলিম উছমান ও আলী ﷺ এর মধ্যে কে অধিক উত্তম, এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তবে তাদের দুইজনের চেয়ে আবু বকর ও উমার ﷺ উত্তম ছিলেন। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল আলেমের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

একদল আলেম উছমানকে প্রাধান্য দিয়ে নিরবতা পালন করেছে এবং আলী ﷺ চতুর্থ খলীফা গণ্য করেছে।

আরেক দল আলিম আলী ﷺ কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আরেক দল নিরেপক্ষতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের অধিকাংশের মতে উছমান ﷺ কে আলী ﷺ এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

....

ব্যাখ্যা: প্রথমে সকল সাহাবীর ফাযীলাত একসাথে বর্ণনা করার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এ অধ্যায়ে সাহাবীদের ফাযীলাতের তারতম্য বর্ণনা করেছেন এবং সে ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি বলেন: কুরআন, হাদীস এবং মুসলিমদের ইজমাতে সাহাবীদের যেসব ফাযীলাত এবং মর্যাদার স্তরভেদ এসেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা মেনে নেয়। সাহাবীদের ফাযীলাত সাব্যস্ত করার জন্য উপরোক্ত তিনটি উৎসের দলীলই যথেষ্ট।

---

৭৬ . সহীহ: সহীহ বুখারী ৩৬৫৫।

সকল সাহাবীই মর্যাদা ও ফাযীলাতের ক্ষেত্রে সমান নয়। বরং ইসলাম কবুলে অগ্রণী হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, হিজরত করা এবং তাদের নাবী ও দ্বীনের হিফাযতের জন্য তারা যা করেছেন, সেই অনুপাতে তাদের ফাযীলাতের তারতম্য রয়েছে।

এ জন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন: যারা বিজয় তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে খরচ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছে তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ঐসব লোকের উপর প্রাধান্য দেয়, যারা উক্ত ঘটনার পরে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে মহান বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতাহর ১নং আয়াতে বলেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"হে নাবী, আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"।

প্রসিদ্ধ মতে এখানে সুস্পষ্ট বিজয় বলতে হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই সূরা ফাতাহ নাযিল হয়েছে।

হুদায়বিয়া মক্কার নিকটস্থ একটি কূপের নাম। এই কূপের কাছে একটি বৃক্ষ ছিল। মক্কার মুশরেকরা যখন রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাঁধা দিল, তখন এই বৃক্ষের ছায়াতলেই বায়আতুর্ রিযওয়ান সংঘটিত হয়।

তারা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার উপর বাইআত গ্রহণ করে। এই বাইআতকে সুস্পষ্ট বিজয় বলার কারণ হলো এই বাইআতের কারণেই মুসলিমদের জন্য প্রচুর কল্যাণ বিজয় অর্জিত হয়েছে। এ বাইআতে যারা শরীক ছিল, অন্যদের উপর তাদের ফাযীলাতের দলীল হলো যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾

"তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে,

সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে” (সূরা হাদীদ ৫৭:১০)।

এ মুসলিমগণই হলো সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

“যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে” (সূরা তাওবা ৯:১০০)।

শাইখুল ইসলাম বলেন: وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ তারা আনসারদের উপর মুহাজিরদেরকে প্রাধান্য দেয়:

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা আনসারদের উপর মুহাজিরদের ফাযীলাত সাব্যস্ত করে। المهاجرون শব্দটি المهاجر এর বহুবচন। এখানে মুহাজির বলতে ঐসব মুসলিম উদ্দেশ্য, যারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিল।

হিজরত শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করা। আর ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় কুফরীর দেশ ছেড়ে ইসলামের দেশে চলে যাওয়াকে হিজরত বলা হয়।

আর আনসার বলতে মদীনার ঐসব মুসলিম বুঝায়, যারা রসূল ﷺ কে সাহায্য করেছিল। তারা ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। নাবী ﷺ তাদেরকে এ নামে নামকরণ করেছেন।

ফাযীলাতের ক্ষেত্রে আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্যের দলীল হলো আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে আনসারদের পূর্বে মুহাজিরদেরকে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ﴾

"যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী" (সূরা তাওবা: ১০০)। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ১১৭ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾

"আল্লাহ নাবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যেসব মুহাজির ও আনসারগণ নাবীর আনুগত্য করেছে তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন।"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾

"এ ধন-সম্পদ ঐসব ফকীর মুহাজিরদের জন্য, যাদেরকে তাদের বসত-ভিটা থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। আর যারা মুহাজিরদের আগমণের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম"। (সূরা হাশর: ৮-৯)

উপরের আয়াতগুলো একদিকে যেমন মুহাজির ও আনসারদের ফাযীলাত সাব্যস্ত করে, অন্যদিকে আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্য সাব্যস্ত করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আনসারদের আগে মুহাজিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্যের আরো কারণ হলো, তারা বিনিময়ের আশায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের দেশ ছেড়েছে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়া

ত্যাগ করেছে। এসব কাজে তারা ছিলো সত্যনিষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবীর ব্যাপারে বলেছেন: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ﴾ "তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি":

যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হাতেব বিন আবু বালতাআর ঘটনায় বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

মদীনা থেকে চার মারহালা (ষ্টেশন) দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম বদর। এই গ্রামের নিকট এমন একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। বদরের এই ঐতিহাসিক দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার দিন হিসাবেও নামকরণ করা হয়েছে।

তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। সহীহ বুখারীতে তাদের সংখ্যা এটিই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তার 'ফাওয়ায়েদ' নামক কিতাবে বলেন: অনেক লোকের পক্ষে এই হাদীসের অর্থ বুঝা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: এ বিষয়ে আমাদের ধারণা হলো, -বাস্তবে আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন-, এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছেন, যাদের ব্যাপারে তিনি অবগত রয়েছেন যে, তারা কখনো দ্বীন ছাড়বে না; বরং তারা ইসলামের উপর মরবে। কিন্তু অন্যরা যেমন গুনাহ্য় লিপ্ত হয়, তারাও কখনো সেরকম গুনাহয় লিপ্ত হতে পারে। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে গুনাহর উপর অবিচল রাখবেন না; বরং তিনি তাদেরকে তাওবায়ে নাসুহা (খাঁটি তাওবা) এবং ক্ষমা

প্রার্থনা করার তাওফীক দিবেন। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এমন সৎ আমল করার তাওফীক দিবেন, যা তাদের গুনাহর চিহ্নগুলোকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দিবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আরো বলেন: অন্যদেরকে বাদ দিয়ে তাদের ব্যাপারে খাস করে এই কথা বলার কারণ হলো, তাদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে। তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারা এমন করবে, যদ্বারা তাদের ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব নয়। এতে এটিও আবশ্যক হয় না যে, তারা মাগফিরাতের ওয়াদার উপর নির্ভর করে ফরয ইবাদাত বর্জন করবে। শরীয়াতের আদেশ পালন করা অব্যাহত রাখা ছাড়াই যদি মাগফিরাতের ওয়াদা অর্জিত হতো, তাহলে তারা মাগফিরাতের এই ওয়াদা পাওয়ার পর সলাত, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি কিছুই করতেন না। সুতরাং ইবাদাত বর্জন করে ওয়াদার উপর নির্ভর করার ধারণা হতেই পারেনা। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের কথা এখানেই শেষ।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী ﷺ এর সংবাদ অনুসারে আরো বিশ্বাস করে, যারা হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে বাইআত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন।

বাই'আতুর রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে এই ওয়াদা করা হয়েছে। মুশরিকরা যখন নাবী ﷺ কে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, তখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে এ বাই'আতটি সংঘটিত হয়েছিল। পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ বাইআতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের ব্যাপারে নাবী ﷺ দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য: যারা হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নীচে বাই'আত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। সহীহ সনদে জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীসে এর দলীল রয়েছে। নাবী ﷺ বলেন:

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে যারা বাইআত করেছে তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা"।[৭৭]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। কুরআনে সুস্পষ্ট করেই এ কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইআত করছিলো" (সূরা ফাতাহ ৪৮:১৮)।

তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে এটিই ছিল তাদের সংখ্যা। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত আছেন।

নাবী ﷺ যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তারা তাদেরকে জান্নাতী বলে। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী, ছাবেত বিন কাইস বিন শাম্মাস এবং আরো অন্যান্য সাহাবী:

অর্থাৎ রসূল ﷺ যাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাও তাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়। আর তিনি যাকে জান্নাতের অধিবাসী বলে সাক্ষ্য দেননি, তারা তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করে না। কেননা তাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা রচনা করার শামিল। তবে তারা সৎ লোকদের জন্য মঙ্গল কামনা করে এবং অসৎ লোকদের উপর আযাবের আশঙ্কা করে। এটিই আক্বীদার অন্যতম একটি মূলনীতি।

জান্নাতের সুখবর প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর নাম: তারা হলেন (১) আবু বকর ছিদ্দিক (২) উমার ইবনুল খাত্তাব (৩) উসমান বিন আফ্ফান (৪) আলী বিন আবু তালিব (৫) আব্দুর রাহমান বিন আউফ (৬) যুবাইর

---

৭৭. সহীহ: তিরমিযী ৩৮৬০, আবূ দাউদ ৪৬৫৩, মুসনাদে আহমাদ ১৪৭৭৮।

ইবনুল আওয়াম (৭) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (৮) সাঈদ বিন যায়েদ (৯) আবু উবায়দাহ বিন যাররাহ এবং (১০) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ﵃।[৭৮]

এ সমস্ত সাহাবীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। ছাবিত ইবনে কাইসকেও নাবী ﷺ জান্নাতী বলেছেন। সুস্পষ্টভাষী হওয়ার কারণে তাঁকে নাবী ﷺ এর বক্তা বলে ডাকা হতো। তাঁর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত।[৭৯]

উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরকে ছাড়াও আরো কতিপয় সাহাবীকে নাবী ﷺ জান্নাতী বলেছেন। যেমন উক্কাশা বিন মিহসান, আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং আরো অনেকেই।

তারা আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালেব এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে স্বীকৃতি দেয়। সেখানে বলা হয়েছে, নাবী ﷺ এর পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর, অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাবঃ

অর্থাৎ নাবী ﷺ এর পরে এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব হওয়ার ব্যাপারে মুতাওয়াতির সনদে আলী এবং অন্যান্য সাহাবী ﵁ থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা বিশ্বাস করে। কেননা মুতাওয়াতির সনদ সর্বাধিক শক্তিশালী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উছমান বিন আফফান ﵁ কে খেলাফতের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় খলীফা হিসাবে গণ্য করে এবং আলী ﵁ কে গণ্য করে চতুর্থ স্থানে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন।

আলী ﵁ হতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে ঐসব রাফেযীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা তাঁকে আবু বকর ও উমার ﵄

---

৭৮. সহীহঃ ইবনে মাজাহ ১৩৩-১৩৪, আবূ দাউদ ৪৬৪৮, তিরমিযী ৩৬৯৬।

৭৯ . সহীহ বুখারী ৩৬১৩, সহীহ মুসলিম ১১৯।

এর চেয়ে উত্তম মনে করে এবং খিলাফাতের স্তর পরিক্রমায় তাঁকে আবু বকর এবং উমার ﵄ এর উপর প্রাধান্য দেয়। অতঃপর তারা তাদের খিলাফতের সমালোচনা করে। মূলতঃ এই আলোচনায় দু'টি মাসআলা রয়েছে।

প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে খিলাফত সম্পর্কে। আর **দ্বিতীয় মাস'আলাটি** হচ্ছে সাহাবীদের মর্যাদার তারতম্য সম্পর্কে।

খিলাফতের ব্যাপারে কথা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইজমা অনুসারে রসূল ﷺ এর পর আবু বকর হচ্ছেন সর্বপ্রথম খলীফা, অতঃপর উমার, অতঃপর উছমান, অতঃপর আলী ﷺ। খলীফাদের এ স্তর পরিক্রমায় ঐকমত্য পোষণকারীদের মধ্যে সাহাবীগণও শামিল ছিলেন।

আর সাহাবীদের ফাযীলাতের তারতম্যের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইজমা অনুসারে নাবী ﷺ এর পরে আবু বকর, অতঃপর উমার ﵄ এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। যেমন আলী ﵁ হতে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীসে এই কথা বর্ণিত হয়েছে।

উছমান ও আলী ﵄ এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মতভেদ করেছে। তাদের দুইজনের মধ্যে কে অধিক উত্তম?

শাইখুল ইসলাম এখানে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন।

(১) একদল আলেম উছমানকে প্রাধান্য দিয়ে নিরবতা পালন করেছে এবং আলী ﵁ কে চতুর্থ খলীফা গণ্য করেছে।

(২) আরেক দল আলিম আলী ﵁ কে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

(৩) আরেকদল নিরেপক্ষতা অবলম্বন করেছেন। এ হচ্ছে মতভেদের সারকথা। মর্যাদার ক্ষেত্রে উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দেয়া, আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তাদের দুইজনের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকা।

তবে শাইখুল ইসলাম প্রথম মতকে প্রাধান্য দেয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো একাধিক কারণে উছমানকে আলী ﵁ এর উপর প্রাধান্য দেয়া।

(১) উছমান ﵁ এর ফাযীলাত বর্ণনার হাদীসগুলো এ মতকেই সমর্থন করে।

(২) বাইআতুর রিযওয়ানের সময় উছমানের বাইআত আগে নেয়ার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, উছমান আলীর চেয়ে উত্তম ছিলেন। সুতরাং ফাযীলাতের মধ্যে তাদের ধারাবাহিকতা খিলাফতের মধ্যে তাদের স্তরপরিক্রমা ও ধারাবাহিকতার মতই।

(৩) উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দেয়াই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মত হিসাবে স্থির হয়েছে। যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাহাবীগণ উছমানকে বাইআতের ক্ষেত্রে প্রাধন্য দিয়েছেন।

আব্দুর রাহমান বিন আওফ একদা আলী ﵁ কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমি লোকদের প্রতি খুব গভীরভাবে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম তারা আলীকে উছমানের উর্দ্ধে স্থান দেয়নি।

আবু আইয়্যুব বলেন: যে ব্যক্তি উছমানকে আলী ﵁ এর উপর প্রাধান্য দিল না, সে মুহাজির এবং আনসারদেরকে অবজ্ঞা করলো। সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, উছমান আলী থেকে উত্তম। কেননা তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাঁকে আলী ﵁ এর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। যারা উছমান ﵁ এর কাছে বাইআত করেছে, তাদের মধ্যে আলীও শামিল ছিলেন। উছমান ﵁ এর হুকুমে এবং তাঁর সামনেই আলী ﵁ শরীয়তের হদ তথা দন্ডবিধি কায়েম করতেন।

حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة

খিলাফাতের ক্ষেত্রে আলী ﷺ কে অন্য চার খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার হুকুম

وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ لَكِنِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا مَسْأَلَةُ الْخِلاَفَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ

উছমান ও আলীর মধ্যে কে অধিক উত্তম, যদিও এই মাস‘আলাটি দ্বীনের ঐসব মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে কেউ বিপরীত মত পোষণ করলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অধিকাংশ লোকের মতানুসারে তাকে গোমরাহ বলা যাবে। কিন্তু খিলাফতের মাসা‘আলায় যে কেউ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাযহাবের বিপরীত মত পোষণ করবে, তাকে গোমরাহ বলা হবে। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, রসূল ﷺ এর পরে খলীফা হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উছমান, অতঃপর আলী ﷺ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সমস্ত খলীফার কারো খেলাফতের বিরোধিতা করবে, সে তার গৃহে পালিত গাধার চেয়েও বোকা বলে বিবেচিত হবে।

....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম এখানে দু’টি মাসআলার মধ্যে তুলনা করেছেন। একটি হলো সম্মান ও ফাযীলাতের ক্ষেত্রে আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দেয়ার মাস‘আলা এবং আরেকটি হলো খিলাফতের মাস‘আলায় আলীকে অন্য খলীফাদের উপর প্রাধান্য দেয়া। যার ফলে বড় ধরণের কোন ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং শাইখ বর্ণনা করেছেন যে,

ফাযীলাতের ক্ষেত্রে আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দিলে গোমরাহ বলা হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলীকে উছমানের চেয়ে উত্তম বলল, তাকে গোমরাহ বলে হুকুম লাগানো যাবে না। কেননা আহলে সুন্নাতের লোকদের মধ্যে এ মাস'আলায় মতভেদ রয়েছে। যদিও প্রাধান্যযোগ্য মতে আলীর উপর উছমান ﷺ এর উপর ফাযীলাত সাব্যস্ত। কিন্তু খিলাফতের মাস'আলায় গোমরাহ বলা হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খিলাফতের মাস'আলায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের খেলাফ করবে এবং আলীকে উছমান বা তাঁর আগের কোন খলীফার উপর প্রাধান্য দিবে কিংবা তাঁকে ফাযীলাতের ক্ষেত্রে আবু বকর ও উমার ﷺ এর উপর প্রাধান্য দিবে তার উপর গোমরাহীর হুকুম লাগানো হবে।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে, রসূল ﷺ এর পরে আবু বকর সিদ্দীক ﷺ হলেন প্রথম খলীফা। কেননা তাঁর রয়েছে অনেক ফাযীলাত এবং সৎকর্মে অগ্রগামিতা। নাবী ﷺ তাঁকে সমস্ত সাহাবীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর খেলাফতের বাইআতের উপর সাহাবীদের ইজমা হয়েছে।

অতঃপর আবু বকরের পরে উমার ইবনুল খাত্তাব হলেন দ্বিতীয় খলীফা। কেননা তাঁরও রয়েছে অনেক ফাযীলাত এবং সৎকর্মে অগ্রগামিতা। আবু বকর ﷺ জীবিত থাকা কালেই তাঁকে পরবর্তী খেলাফতের দায়িত্বভার দিয়ে গেছেন। আবু বকর ﷺ এর পরে তাঁর খেলাফতের উপর উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতঃপর উমারের পর খলীফা হলেন উছমান বিন আফফান ﷺ। কেননা উমার ﷺএর পক্ষ হতে নিযুক্ত শুরা পরিষদ তাকেই খেলাফতের জন্য প্রাধান্য দিয়েছে এবং মুসলিম উম্মত তাঁর খেলাফতের উপর একমত হয়েছে। অতঃপর উছমান বিন আফফানের পরে খলীফা হলেন আলী ﷺ। কেননা তাঁর রয়েছে অনেক ফাযীলাত। তাঁর খেলাফতের উপর তাঁর যুগের লোকদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

এ হলেন চারজন খলীফা। ইরবায বিন সারিয়ার হাদীসে তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রসূল ﷺ বলেন:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং উহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে"।[৮০]

এ জন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন: যে ব্যক্তি এ চারজনের কারো খিলাফতের স্বীকৃতি দিবে না সে তার গৃহে পালিত গাধার চেয়েও অধিক নির্বোধ। কেননা এতে বিনা কারণে শরীয়াতের দলীল এবং ইজমার খেলাফ করা হবে। যেমন রাফেযীরা রসূল ﷺ এর পরে আলী বিন আবু তালিবকেই খিলাফতের হকদার মনে করে।

আলীকে অন্য তিন খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার মাস'আলায় শেষ কথা হলো,

(১) যারা খিলাফতের ক্ষেত্রে তাঁকে বাকী তিন খলীফার উপর প্রাধান্য দিলো, সে আহলে সুন্নাতের ঐকমত্যে গোমরাহ বলে গণ্য হবে।

(২) যারা তাকে ফাযীলাতের ক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দীক এবং উমারের উপর প্রাধান্য দিবে, তারাও গোমরাহ হবে।

(৩) যারা আলীকে উছমানের উপর ফাযীলাতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিবে, তাদেরকে গোমরাহ বলা হবে না। যদিও এটি প্রাধান্যযোগ্য মতের বিপরীত।

---

৮০. সহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২।

مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী পরিবারের মর্যাদা:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: "أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي"[رواه مسلم (2408) عن زيد بن أرقم]. وَقَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّه وَقَدِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِمٍ– فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ للهِ وَلِقَرَابَتِي وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ [رواه مسلم (2276) عن وائلة بن الأسقع].

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নাবী পরিবারের সকল সদস্যকে ভালবাসে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাদের ব্যাপারে রসূল ﷺ এর ঐ অসীয়তকে হিফাযত করে, যা তিনি গাদীরে খুম্মের দিন করেছিলেন। তিনি সেদিন বলেছেন:

أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي

"আমি তোমরাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"।[৮১]

তাঁর চাচা আব্বাস যখন তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন, কুরাইশদের কিছু লোক বনী হাশেমদের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে, তখন তিনি বললেন:

---

৮১. সহীহ মুসলিম ২৪০৮, সুনানে দারিমী ৩৩১৬, সহীহ ইবনে খুযাইমা ২৩৫৭।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لله وَلِقَرَابَتِي

সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর জন্য এবং আমার সাথে আত্মীয়তার কারণে তোমাদেরকে ভালবাসবে।[৮২] রসূল ﷺ বলেন:

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের থেকে বনী ইসমাঈলকে বাছাই করে নিয়েছেন। ইসমাঈলের সন্তানদের থেকে বনী কেনানাকে নির্বাচন করেছেন। আর বনী কেননা থেকে কুরাইশকে বাছাই করে নিয়েছেন। কুরাইশ বংশ থেকে নির্বাচিত করেছেন বনী হাশেমকে। আর হাশেমের বংশ থেকে নির্বাচন করেছেন আমাকে"।[৮৩]

....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট আহলে বাইত তথা নাবী পরিবারের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তারা রাসূল ﷺএর আহলে বাইতকে ভালবাসে। নাবী পরিবাবের ঐ সমস্ত সদস্য আহলে বাইতের মধ্যে শামিল, যাদের জন্য সাদকাহ গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে। তারা হলেন আলী, জা'ফর, আকীল, আব্বাস رضي الله عنهم এবং তাদের পরিবারের সকল সদস্য। এমনি হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, নাবী ﷺ এর স্ত্রী এবং কন্যাগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে" (সূরা আহযাব ৩৩:৩৩)।

---

৮২ . সহীহ: তিরমিযী ৩৭৫৮, মুসনাদে আহমাদ।

৮৩ .সহীহ মুসলিম ২২৭৬, তিরমিযী ৩৬০৫, মুসনাদে আহমাদ।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী পরিবারের লোকদেরকে ভালবাসে এবং তাদেরকে সম্মান করে। কেননা তাদেরকে ভালবাসা ও সম্মান করা নাবী ﷺ কে ভালবাসা ও সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এবং রসূল ﷺ তাদেরকে সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾

"হে নাবী! এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে আত্মীয়তার ভালবাসা অবশ্যই চাই" (সূরা শুরা ৪২:২৩)।

সুন্নাতে এ বিষয়ে অনেক দলীল রয়েছে। এগুলো থেকে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া কিছু উল্লেখ করেছেন। তবে ভালবাসা পাওয়ার শর্ত হলো রসূল ﷺ এর আত্মীয়দের সালাফগণের ন্যায় সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে এবং দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে। যেমন ছিলেন আব্বাস رضي الله عنه ও তাঁর সন্তানগণ এবং আলী رضي الله عنه ও তাঁর সন্তানগণ।

পক্ষান্তরে যারা রসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করবে এবং দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, তাদেরকে ভালবাসা নাজায়েয। যদিও সে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ويتولونهم তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেঃ অর্থাৎ তাদেরকে ভালবাসে। يتولون **শব্দটি** الولاء থেকে গৃহীত হয়েছে। الولاء **শব্দের** واو বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ হলো ভালবাসা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রসূল ﷺ এর অসীয়তকে হেফাযত করেঃ তারা সেই অসীয়ত অনুযায়ী আমল করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। তিনি গাদীরে খুম্মের দিন বলেছেনঃ "আমি তোমরাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"। বন্যার বা বৃষ্টির পানি যেখানে গিয়ে জমা হয়, তাকে غدير (গাদীর) বলা হয়। বলা হয়ে থাকে

যে, খুম্ম একজন ব্যক্তির নাম। তার দিকে সেই স্থানের পানিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে غدير خم 'খুম্মের জলাশয়'।

কেউ কেউ বলেছেন: বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি স্থানের নাম হলো খুম্ম। জলাশয়টিকে এই স্থানটির দিকে সম্বোধন করার কারণ হলো জলাশয়টি সেখানেই অবস্থিত ছিল। এই পুকুর বা জলাশয়টি মক্কা থেকে মদীনায় আসার রাস্তার পাশে (জুহফায়) অবস্থিত ছিল। বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার সময় নাবী ﷺ এই জলাশয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন এবং সেখানে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণের মধ্যে উপরোক্ত কথাটিও ছিল, যা শাইখুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন: আল্লাহ তা'আলা আমার আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং তাদের হক আদায় করার যে আদেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে সেই আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

وَقَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ তিনি তাঁর চাচা আব্বাসকে বলেছিলেন: আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ। তিনি একটি অপছন্দনীয় বিষয় দেখে নাবী ﷺকে অবগত করেছিলেন। তিনি জানালেন যে, কুরাইশদের কিছু লোক বনী হাশেমের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে।

الجفاء অর্থ হলো সদাচরণ পরিহার করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। নাবী ﷺ তখন কসম করে বললেন: ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে আত্মীয়তার কারণে তোমাদেরকে ভালবাসবে। অর্থাৎ দুই কারণে আহলে বাইতের লোকদেরকে ভালবাসতে হবে।

(১) আহলে বাইতকে ভালবাসার মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করবে। কেননা তারা আল্লাহর অলীদের অন্তর্ভুক্ত।

(২) তারা ছিলেন রসূলের আত্মীয়।

সুতরাং তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করলে রসূল ﷺ খুশী হবেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মানও প্রদর্শন করা হয়। বনী হাশেমের ফযীলতের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাবী ﷺ বলেন যে, তারা হলেন তাঁরই আত্মীয়। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসমাঈল বিন ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সাল্লামের বংশধর হতে উত্তম হিসাবে বাছাই করেছেন। আর ইসমাঈলের বংশধর থেকে বনী কেননাকে নির্বাচন করেছেন। কেননা একটি গোত্রের নাম। তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল কেনানা বিন খুযাইমা। কেনানা থেকে বাছাই করেছেন কুরাইশকে। কুরাইশরা হলো মুযার বিন কেননার সন্তান। কুরাইশ থেকে আল্লাহ তা'আলা বনী হাশেমকে নির্বাচন করেছেন। এরা হলেন হাশেম বিন আব্দে মানাফের সন্তান। রসূল ﷺ আরো বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বনী হাশেম থেকে বাছাই করেছেন।

সুতরাং তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুআই বিন গালেব বিন ফিহির বিন মালেক বিন নযর বিন কেনানা বিন খুযাইমা বিন মুদরেকা বিন ইলয়াস বিন মুযার বিন নায্যার বিন মাআদ বিন আদনান।

উপরোক্ত হাদীস থেকে দলীল পাওয়া গেল যে, আরবদের ফাযীলাত রয়েছে। আর কুরাইশ বংশ হলো অন্যান্য আরব গোত্র হতে উত্তম। বনী হাশেম কুরাইশদের মধ্যে সর্বোত্তম। রসূল ﷺ বনী হাশেমের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। সুতরাং তিনি ব্যক্তিগত দিক থেকে সর্বোত্তম আদম সন্তান এবং তাঁর বংশ মর্যাদাও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হাদীসের মধ্যে বনী হাশেমেরও ফাযীলাত সাব্যস্ত হয়েছে। রসূল ﷺ এর আত্মীয়রাই হলো বনী হাশেম।

مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিকট নাবী ﷺ এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা

ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُونَ بَأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ: خُصُوصًا خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلاَدِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ وَالصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা নাবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মাহাতুল মুমিনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তারা বিশ্বাস করে, আখিরাত দিবসেও তারা তাঁর স্ত্রীরূপেই পরিগণিত হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা বিশেষ করে রসূল ﷺ এর স্ত্রী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কারণ খাদীজা ছিলেন তাঁর অধিকাংশ সন্তানের জননী, তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীনী এবং দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সর্বাত্মক সাহায্যকারীনী। সর্বোপরি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ছিল রসূল ﷺ এর নিকট সুউচ্চ মর্যাদা। সিদ্দীকাহ বিনতে সিদ্দীক আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেন:

فَضْلَ عَائشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

“আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মর্যাদা সব নারীর উপর ঠিক সে রকমই, যেমন ছারীদ[৮৪] নামক খাবারের মর্যাদা সকল খাদ্যের উপর”।[৮৫]

---

৮৪. সেকালে সারীদ ছিল আরবের সর্বোত্তম খাদ্য, যা রুটি ও মাংস দ্বারা তৈরী হত।

....

ব্যাখ্যা: এ অংশে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ নাবী ﷺ এর পবিত্র স্ত্রীগণের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের আক্বীদা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তারা নাবী করীম ﷺ এর স্ত্রীগণের প্রতি অন্তর দিয়ে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে সম্মান করে। কেননা তারা হলেন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের দিক থেকে এবং উম্মতের কারো জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়ার দিক থেকে জননী সমতুল্য। তবে বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে তাদের হুকুম অপরিচিত মহিলাদের মতই। অর্থাৎ তাদের সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা, ইত্যাদি সবই হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾

"নাবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা" (সূরা আহযাব ৩৩:৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করাও জায়েয নয়। এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিরাট গুনাহ্" (সূরা আহযাব ৩৩:৫৩)। আল্লাহ তা'আলা একই আয়াতে আরো বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

"তোমরা তাঁর পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" (সূরা আহযাব ৩৩:৫৩)।

---

৮৫. সহীহ বুখারী ৩৪১১, সহীহ মুসলিম ২৪৩১, তিরমিযী ৩৮৮৭, নাসাঈ ৩৯৪৭, ইবনে মাজাহ ৩২৮০, সুনানে দারিমী ২১১৩।

সুতরাং সম্মান পাওয়ার দিক থেকে তারা মুমিনদের জননী সমতুল্য। তবে মুমিনগণ আপন মাতার ন্যায় নাবী ﷺ এর স্ত্রীগণের জন্য মাহরাম নয়। অর্থাৎ নিজের মাতা, বোন, কন্যা এবং অনুরূপ মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা জায়েয, সেরকম নাবী ﷺ এর স্ত্রীদের সাথে নির্জনে মিলত হওয়া জায়েয নয়।

নয়জন স্ত্রী জীবিত রেখে নাবী ﷺ মৃত্যু বরণ করেছেন। তারা হলেন আয়িশা, হাফসা, যয়নব বিনতে জাহ্‌শ, উম্মে সালামা, সাফীয়া, মায়মুনা, উম্মে হাবীবা, সাওদা এবং জুআইরিয়া رضي الله عنهم।

তিনি খাদীজাকে নবুওয়াতের পূর্বেই বিবাহ করেছিলেন। তিনি জীবিত থাকতে আর কাউকে বিবাহ করেননি। যায়নাব বিনতে খুযাইমাকে বিবাহ করার কিছু দিন পরেই যায়নাব মৃত্যু বরণ করেন। এরাই হলেন নাবী ﷺ এর ঐ সমস্ত স্ত্রী, যাদের সাথে তিনি ঘরসংসার করেছেন। তাদের সংখ্যা মোট **১১**জন। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বিশ্বাস করে যে, আখিরাত দিবসে নাবী ﷺ এর স্ত্রীগণ তাঁর স্ত্রীরূপেই থাকবে। এতে করে তাদের জন্য বিরাট সম্মান ও ফাযীলাত হাসিল হবে।

নাবী ﷺ এর স্ত্রী খাদীজার রয়েছে বিশেষ ফাযীলাত। তাঁর রয়েছে অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা এবং ফাযীলাত। শাইখুল ইসলাম তা থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করেছেন।

(১) খাদীজা রসূল ﷺ এর অধিকাংশ সন্তানের মাতা। সুতরাং ইবরাহীম ব্যতীত তাঁর বাকীসব সন্তানই খাদীজার গর্ভ থেকে। ইবরাহীম عليه السلام ছিলেন মারিয়া কিবতীর গর্ভ থেকে।

(২) এক মতানুসারে খাদীজাই সর্বপ্রথম রসূল ﷺ এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। শাইখুল ইসলাম এখানে এই মতটিই উল্লেখ করেছেন। অন্যমতে তিনি মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৩) রসূল ﷺ এর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে খাদীজা رضي الله عنها ই সর্বপ্রথম সক্রীয়ভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য করেছিলেন। তিনি ঠিক সেই

সময়ই নাবী ﷺকে সাহায্য করেছেন, যখন সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিল।

(৪) রসূল ﷺ এর নিকট খাদীজা رضي الله عنها এর ছিল উচ্চ মর্যাদা। তিনি খাদীজাকে খুব ভালবাসতেন, তাঁর কথা স্মরণ করতেন এবং তাঁর খুব প্রশংসা করতেন।

আর সিদ্দীকাহ বিনতে সিদ্দীক رضي الله عنها সম্পর্কে কথা এই যে, তিনি হলেন আয়িশা বিনতে আবু বকর رضي الله عنه। অত্যাধিক সত্যবাদীকে সিদ্দীক বলা হয়। নাবী ﷺ আবু বকরকে এই উপাধী দিয়েছেন। আয়িশা رضي الله عنها এর রয়েছে অনেক ফাযীলাত। তার মধ্যে

(ক) তিনি ছিলেন নাবী ﷺ এর স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

(খ) তাঁকে ছাড়া রসূল ﷺ আর কোন কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেননি।

(গ) আয়িশা رضي الله عنها এর সাথে একই চাদরের নীচে থাকা অবস্থায় নাবী ﷺ এর উপর অহী নাযিল হতো।

(ঘ) মিথ্যুকরা তাঁর উপর যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁকে সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

(ঙ) তিনি হলেন মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী।

(চ) বিজ্ঞ সাহাবীগণ যখন কোন বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তাঁর কাছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন।

(ছ) রসূল ﷺ তাঁর ঘরে এবং তাঁরই বুকের উপর মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন।

(জ) নাবী ﷺ কে তাঁর গৃহেই দাফন করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর আরো অনেক ফাযীলাত রয়েছে। আর শাইখুল ইসলাম এখানে তাঁর যেই ফাযীলাতটি উল্লেখ করেছেন, তা হলো নাবী ﷺ বলেন:

فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

"আয়িশা ﷺ এর মর্যাদা সব নারীর উপর ঠিক সেরকমই, যেমন ছারীদ নামক খাবারের মর্যাদা অন্যসব খাদ্যের উপর"।[৮৬]

ছারীদ ছিল সে সময়ের সর্বোত্তম খাবার। কেননা তাতে থাকত গোশত ও রুটি। আটার রুটি সর্বোত্তম খাদ্য। আর গোশত হলো সর্বোত্তম সালন (তরকারী)। গোশত যেহেতু সর্বোৎকৃষ্ট তরকারী এবং আটা যেহেতু সর্বোত্তম খাদ্যদ্রব্য, আর ছারীদ যেহেতু এই উভয় প্রকার বস্তু দ্বারা তৈরী হয়, তাই ছারীদ সর্বোত্তম খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

---

৮৬. সহীহ বুখারী ৩৪১১, সহীহ মুসলিম ২৪৩১, তিরমিযী ৩৮৮৭, নাসাঈ ৩৯৪৭, ইবনে মাজাহ।

تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت

সাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বিদ‘আতীরা যা বলে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

وَيَتَبَرَّءُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ حَتَّى إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ أَوْ غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ ؛ فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ: إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ ثُمَّ إِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْفُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ

الصَّالِحِ وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো, তারা ঐ সমস্ত রাফেযীর[৮৭] পথ পরিহার করে, যারা সাহাবীদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে গালি দেয়। তারা ঐসব নাওয়াসেবদের[৮৮] সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে, যারা কথা কিংবা আচরণের মাধ্যমে আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়। সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত মতবিরোধ, ফিতনা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলা থেকে তারা বিরত থাকে।

তারা বলে যে, সাহাবীদের দোষ-ত্রুটি আলোচনায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কিছু মিথ্যা, কোনটিতে সংযোজন করা হয়েছে, কোনটি হতে কিছু অংশ বিয়োজন করা হয়েছে আবার কোনটিকে সঠিক স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার হাদীসগুলো থেকে যা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো, তাতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা তারা ইজতেহাদ করেছিলেন। সুতরাং ইজতেহাদ করতে গিয়ে হয় তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আর না

---

৮৭. শিয়াদের একটি উপদলকে রাফেযী বলা হয়। তাদেরকে জা'ফারীয়া হিসাবেও নামকরণ করা হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, শিয়াদের একটি দল যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলীর কাছে এসে আবু বকর এবং উমারের প্রশংসা বর্জন করার আহবান জানালো। কিন্তু তিনি তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা বলল: إذا نرفضك অর্থাৎ তাহলে আমরাই আপনাকে বর্জন করলাম। এখান থেকেই তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। এদের অন্যতম আকীদাহ হলো, তারা আহলে বাইত ছাড়া বাকী সাহাবীদেরকে ঘৃণা করে, গালি দেয় এবং তাদেরকে কাফের বলে।

৮৮ . নাওয়াসেবরা রাফেযীদের বিপরীত। النصب শব্দের অর্থ হলো শত্রুতা পোষণ করা। তারা যেহেতু আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাই তাদেরকে নাওয়াসেব বলা হয়।

হয় ভুল করেছেন। মূলতঃ ইজতেহাদের বিষয়টি এমন যে, মুজতাহিদগণ কখনো তাতে ভুল করে থাকে আবার কখনো তারা সঠিক সিদ্বান্তেও উপনীত হয়ে থাকে।

তা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিশ্বাস করে না যে, প্রত্যেক সাহাবীই কাবীরা ও সগীরা গুনাহ্ হতে নিস্পাপ; বরং তাদের দ্বারা গুনাহ্ হতে পারে। তবে ইসলাম গ্রহণে তাদের অগ্রগামিতাসহ এমনসব ফাযীলাত রয়েছে, যার দাবী এই যে, তাদের দ্বারা গুনাহ্ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য। এমনকি সাহাবীদের এমন গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের বেলায় মাফ করা হবে না। কেননা তাদের রয়েছে এমন অনেক সৎ আমল, যা পরবর্তীদের জন্য অর্জন করা অসম্ভব। সুতরাং সাহাবীদের এই সৎকর্মগুলো তাদের দোষ-ক্রটি মিটিয়ে দিবে।

নাবী ﷺ থেকে সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যে সাহাবীগণ ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ"।[৮৯] তাদের পরবর্তী যুগের কোনো মুসলিম উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও সে সাহাবীদের কারোর একমুষ্টি পরিমাণ খাদ্য দান করার সমান ছাওয়াব পাবে না।[৯০]

অতঃপর তাদের কারো দ্বারা ভুল-ক্রটি হয়ে থাকলেও তা থেকে তিনি তাওবা করেছেন অথবা এমন সৎ আমল করেছেন, যা তার ভুল-ক্রটিকে মিটিয়ে দিয়েছে অথবা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ ও সৎকর্মে অগ্রগামী হওয়ার কারণে কিংবা নাবী ﷺ এর শাফাআতের দ্বারা তার সে ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেয়া হবে। কেননা সাহাবীরাই নাবী ﷺ এর শাফাআত পাওয়ার সর্বাধিক হকদার। অথবা দুনিয়াতে তাকে কোন মসীবতে ফেলা হয়েছে, যার কারণে উক্ত মুসীবত তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে।

সুতরাং তাদের দ্বারা নিশ্চিতরূপে সংঘটিত গুনাহর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে ঐসব ভুল-ক্রটির কী অবস্থা হতে পারে, যাতে তারা ইজতেহাদ করেছিলেন? যদি তারা সেখানে হকে উপনীত হয়ে থাকেন,

---

৮৯. সহীহ বুখারী ৩৬৫০।

৯০ .সহীহ বুখারী ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম ২৫৪০-৪১।

তাহলে তাদের জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। আর ভুল করে থাকলে রয়েছে একটি নেকী। আর ভুল-ক্রুটি তো ক্ষমাযোগ্যই।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাদের কর্মসমূহ থেকে যে পরিমাণ কাজকে অপছন্দ করা হয়ে থাকে, তা অতি সামান্য ও নগণ্য। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ভালবাসা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হিজরত, দ্বীনের নুসরত (সাহায্য), উপকারী ইলম এবং সৎ আমলসহ তাদের আরো যেসব সুবিশাল ফাযীলাত ও সৎকর্ম রয়েছে, তা দ্বারা উহা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি সজ্ঞানে ও জেনে-বুঝে সাহাবীদের পবিত্র জীবনীর প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব ফাযীলাত দান করেছেন, তার প্রতিও দৃষ্টিপাত করবে, সে নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে, তারাই নাবীদের পরে সর্বোত্তম মানুষ। অতীতে সাহাবীদের মত মর্যাদাবান ও ফযীলতের অধিকারী কেউ ছিল না। ভবিষ্যতেও তাদের মত ভাল লোক আর আসবে না। তারা মুসলিম জাতির সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাশীল উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট মানব।

....

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ এই অংশে আহলে বাইত ও সাহাবীদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমতঃ তাদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো ইফরাত (বাড়াবাড়ি) ও তাফরীত (অবহেলা ও শৈথিল্য) এবং সীমালঙ্ঘন ও কঠোরতার মাঝখানে। তারা উম্মতের সকল মুমিনকেই ভালবাসে। বিশেষ করে যেসব মুহাজির ও আনসার সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছে এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, তারা তাদের সবাইকে ভালবাসে। তারা আহলে বাইতের প্রতিও অন্তর দিয়ে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

তারা সাহাবীদের মর্যাদা, ফাযীলাত ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে

অবগত রয়েছে। সেই সাথে আহলে বাইতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব হক নির্ধারণ করেছেন, তারা সেই হকগুলোও সংরক্ষণ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রাফেযীদের পথ বর্জন করে এবং তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে না। কারণ তারা সাহাবীদেরকে গালি দেয়, তাদের সমালোচনা করে এবং আলী ﷺ ও আহলে বাইতের ভালবাসায় সীমালংঘন করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাওয়াসেবদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেননা তারা আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে কাফের বলে এবং তাদের সম্মানে আঘাত করে। সাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মাযহাব পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের বিরোধী ও ভ্রান্ত মাযহাবগুলোর সাথে তুলনা করার জন্যই শাইখুল ইসলাম এখানে তা পুনরাবৃত্তি করেছেন।

দ্বিতীয়ত: ফিতনার সময় সাহাবীদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল শাইখুল ইসলাম সেগুলোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। সাহাবীদের দিকে যেসব দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধ করা হয় এবং তাদের নামে যেসব কুৎসা রটানো হয়, ইসলামের শত্রুরা সেগুলোকে সাহাবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট করার সুযোগ খুঁজেছে। যেমন করেছে পরবর্তী যুগের কিছু আলিম এবং সমসাময়িক কতিপয় লেখক, যারা নিজেদেরকে রসূল ﷺ এর সাহাবীদের মধ্যে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করেছে এবং বিনা দলীলে কারো পক্ষ নিয়ে তাকে হকপন্থী বলেছে আবার কারো বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তাকে ভ্রান্ত বলেছে। বরং তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং ঐসব মতলববাজ ও সুবিধাবাদীদের অন্ধ অনুসরণ করেই এরূপ করেছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে লিপ্ত। এর মাধ্যমে তারা মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাসের ব্যাপারে তাদেরকে সন্দিহান করে তুলতে চায় এবং তাদের সামনে সালাফে সালেহীনদের ঐসব লোকের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে দিতে

চায়, যারা ছিলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ কাজের পিছনে তাদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হলো ইসলামের বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতায় আঘাত করা এবং মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরানো।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এখানে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় সত্যকে প্রকাশ করেছেন এবং প্রকৃত ঘটনাকে খোলাসা করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবীদের দিকে যেসব কথা সম্বন্ধ করা হয় এবং তাদের মধ্যে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা (ফিতনা, দলাদলি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ) হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি দু'টি কথার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব খোলাসা করেছেন।

এক. তিনি বলেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত বাদানুবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে নিরব থাকে। অর্থাৎ তারা সে ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করে না এবং তাতে খোঁজাখুঁজিও করে না। কেননা তাতে বেশী খোঁজাখুঁজি ও ঘাটাঘাটি করতে গেলে রসূল ﷺ এর সাহাবীদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ও হিংসা জন্ম নিতে পারে। আর সাহাবীদের প্রতি অন্তরে হিংসা রাখা বড় ধরণের গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নিরবতা পালন করা এবং সে বিষয়ে কথা না বলাই তা থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র পন্থা।

দুই. তাদের দোষ-ক্রটি বর্ণনায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, শাইখুল ইসলাম সেগুলোর জবাব দিয়েছেন। সাহাবীদের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে এবং তাদের শত্রুদের চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্যই তিনি তা করেছেন। শাইখুল ইসলামের জবাবগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(১) যেসব হাদীসে তাদের দোষ-ক্রটির কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীদের সুনাম নষ্ট করার জন্য তাদের দুশমনরা এসব হাদীস রচনা করেছে। যেমন করে থাকে রাফেযীরা। আল্লাহ তা'আলা তাদের চেহারা কালো করুন! সুতরাং তাদের মিথ্যা বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না।

(২) এসব দোষ-ক্রটি সম্বলিত বর্ণনার কোনটিতে সংযোজন করা রয়েছে, কোনটি হতে কিছু অংশ বিয়োজন করা হয়েছে আবার কোনটিকে

সঠিক স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এগুলোর মধ্যে মিথ্যা প্রবেশ করেছে এবং বর্ণনাগুলো বিকৃত করা হয়েছে। তাই এগুলোর উপর নির্ভর করা যাবেনা। কেননা সাহাবীদের ফাযীলাত ও মর্যাদা সর্বজন বিদিত এবং তাদের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। সুতরাং বিকৃত ও সন্দিহান বিষয়ের পিছনে পড়ে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত বিষয়কে পরিত্যাগ করা যাবে না।

(৩) সাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার হাদীসগুলো থেকে যা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো, তাতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা তারা ইজতেহাদ করেছিলেন। সুতরাং ইজতেহাদ করতে গিয়ে হয় তারা সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছেন আর না হয় ভুল করেছেন। মূলতঃ ইজতেহাদের বিষয়টি এমন যে, মুজতাহিদগণ কখনো ভুল করে থাকেন আবার কখনো সঠিক সিদ্বান্তেও উপনীত হয়ে থাকেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাহাবীদের যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, তা ছিল এমন ইজতেহাদী বিষয় সমূহে, যাতে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হলে দু'টি ছাওয়াব পায় এবং ভুল করলেও একটি নেকী পায়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা ও আমর বিন আস ﵄ হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ বলেছেন:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». (بخارى: 7352)

“কোন বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্যও একটি পুরস্কার রয়েছে”।[৯১]

(৪) সাহাবীগণ মানুষ ছিলেন। সুতরাং বনী আদমের অন্যান্য মানুষ দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব, তাদের দ্বারাও তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

৯১. সহীহ বুখারী ৭৩৫২, সহীহ মুসলিম ১৭১৬।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিশ্বাস করে না যে, সাহাবীদের প্রত্যেকেই কাবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। বরং তাদের কারো কারো দ্বারা গুনাহর কাজ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে থাকলেও গুনাহ মোচনের অনেক আমল রয়েছে। নিম্নে তা থেকে কিছু আমল বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) ইসলাম গ্রহণে তাদের অগ্রগামীতাসহ এমনসব ফাযীলাত রয়েছে, যার দাবী হলো, তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য। সুতরাং তাদের কারো দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তাঁর অগণিত সৎ আমল থাকার কারণে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হয়ে গেছে। যেমন এসেছে হাতেব বিন আবু বালতাআর ঘটনায়।

মক্কা বিজয়ের বছর তার পক্ষ হতে একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেহেতু বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমনকি সাহাবীদের এমন গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের বেলায় মাফ করা হবে না। কেননা তাদের রয়েছে এমন অনেক সৎ আমল, যা পরবর্তীদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। সুতরাং সাহাবীদের এ সৎকর্মগুলো তাদের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

"সৎ কাজ অবশ্যই গুনাহসমূহকে দূর করে দেয় (সূরা হুদ **১১:১১৪**)।

(খ) অন্যদের তুলনায় সাহাবীদের সৎআমল বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কেউ সাহাবীদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। রসূল ﷺ এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাহাবীগণই ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তাদের পরবর্তী যুগের কোন মুসলিম উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও সে সাহাবীদের কারোর একমুষ্টি পরিমাণ খাদ্য দান করার সমান ছাওয়াব পাবে না।[৯২] বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৯২. সহীহ বুখারী ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম ২৫৪০-৪১।

আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং ইমরান বিন হুসাইন ﷺ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ বলেছেন:

خَيْرُ القرون قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"আমার উম্মতের মধ্যে আমার যুগের মানুষেরা সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা"।[৯৩]

القرون শব্দটি القرن এর বহুবচন। القرن বলা হয় একই যুগের বা কাছাকাছি যুগের এমন একদল মানুষকে, যারা বিশেষ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কাজে অংশগ্রহণ করে। নির্দিষ্ট মেয়াদী একটি সময়কেও কার্‌ন বলা হয়।

(গ) তাদের কাছে গুনাহ মোচনের অনেক কাফ্‌ফারা এবং উপকরণ ও মাধ্যম রয়েছে, যা অন্যদের কাছে নেই। তাদের কারো দ্বারা ভুল-ক্রটি হয়ে থাকলেও তা থেকে তিনি তাওবা করেছেন অথবা এমন সৎ আমল করেছেন, যা তার ভুল-ক্রটিকে মিটিয়ে দিয়েছে অথবা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ ও সৎকর্মে অগ্রগামী হওয়ার কারণে তার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ গুনাহটি করার পূর্বে সে যত সৎ আমল করেছে, সেগুলোর তুলনায় গুনাহটি খুব নগণ্য হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিংবা নাবী ﷺ এর শাফাআতের দ্বারা তার সে ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অথবা দুনিয়াতে তাকে কোন মসীবতে ফেলা হয়েছে, যার কারণে উক্ত মসীবত তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাকে পরীক্ষা ও মুসীবতে ফেলা হয়েছে। অতঃপর সেই গুনাহ উক্ত মুসীবতে ফেলে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ বলেন:

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ، وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

৯৩. সহীহ বুখারী ২৬৫১-৫২, ৩৬৫০-৫১, সহীহ মুসলিম ২৫৩৩-৩৪।

"মুসলিম কোন ক্লান্তি, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও বিষণ্নতার শিকার হলে, এমনকি কাঁটাবিদ্ধ হলেও এর বদলে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন"।[৯৪] ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং মুসীবতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে সাধারণ মুমিনদের গুনাহ মাফ হলে সাহাবীগণ তাতে পতিত হয়ে ক্ষমা পাওয়ার আরো বেশী হকদার হবেন।

সুতরাং সাহাবীদের দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি নিশ্চিতভাবেই হয়েছে, তার ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে, সৎকাজ থাকার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাহলে ঐসব গুনাহ কেন ক্ষমা করা হবে না, যাতে তারা মুজতাহিদ ছিলেন।

শরীয়াতের হুকুম জানার জন্য শ্রম ব্যয় করাকে الاجتهاد বলা হয়। মুজতাহিদগণ যদি ইজতেহাদ করতে গিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তাহলে তাদের দু'টি নেকী হবে আর ভুলের মধ্যে পড়ে গেলে একটি নেকী হবে। আর মুজতাহিদের ভুল ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন একটু পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং সাহাবীদের থেকে যে সামান্য পরিমাণ ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তাতে দু'টি অবস্থার একটি অবস্থা হতে পারে।

(১) হতে পারে সাহাবী ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুলটি করে ফেলেছেন। তাতে তিনি বিনিময় প্রাপ্ত হবেন এবং তার ভুলটি মাফ করে দেয়া হবে।

(২) এও হতে পারে যে, গুনাহটি ইজতেহাদে ভুল করার কারণে হয়নি; এমনিতেই হয়েছে। কিন্তু তার কাছে এত বিশাল পরিমাণ আমলে সালেহ, অগণিত ফাযীলাত এবং সৎকাজে অগ্রগামিতা রয়েছে, যা তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে এবং গুনাহকে মিটিয়ে দিয়েছে।

---

৯৪. সহীহ বুখারী ৫৬৪১।

মোট কথা, সাহাবীদের দ্বারা যে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তা তাদের বিশাল বিশাল সৎকাজের তুলনায় খুবই কম। পূর্বে যদিও তা বর্ণনা করা হয়েছে, তারপরও এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তাদের ফাযীলাত ও সৎকর্মগুলো পুনরাবৃত্তি করা হলো:

(১) আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। এটি ছিল তাদের সর্বোত্তম আমল।

(২) তারা আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে সুউচ্চ আসনে আসীন করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করেছেন। আর ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো এই জিহাদ।

(৩) তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছেন। এটিও ইসলামের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল।

(৪) তারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন:

﴿ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

"আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী" (সূরা হাশর ৫৯:৮)।

(৫) তাদের রয়েছে উপকারী ইলম এবং সৎআমল।

(৬) তারা নাবীদের পরে আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা। উম্মতে মুহাম্মাদী হলো সর্বোত্তম উম্মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য" (সূরা আল ইমরান ৩:১১০)।

আর সাহাবীগণ হলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ।

রসূল ﷺ বলেন:

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলেন আমার যুগের লোকগণ, অতঃপর পরবর্তীগণ।[৯৫]

(৭) সাহাবীগণ হলেন শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্য হতে বাছাইকৃত এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি।

যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল رحمه الله বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন:

أَنْتُمْ تُوَفُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّه

"তোমাদের দ্বারা বড় বড় উম্মতের সংখ্যা সত্তরে পরিণত হয়েছে। তোমরা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত"।[৯৬] ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকিম তার মুস্তাদরকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৯৫ .সহীহ বুখারী ২৬৫১-৫২, ৩৬৫০-৫১, সহীহ মুসলিম ২৫৩৩-৩৪।

৯৬. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২০০১৫। ইমাম তিরমিযী ৩০০১, ইবনে মাজাহ ৪২৮৮ এবং হাকেম তাঁর কিতাব মুস্তাদরেকে (৬৯৮৭) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء

কারামতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ وما يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ والْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرَق الأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার অন্যতম মূলনীতি হলো অলীদের কারামাত এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অলীদের নিকট অলৌকিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অলীদের নিকট বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও কাশ্‌ফ থেকে যা প্রকাশ করেন এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে।

পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামাত সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব কারামাতের কথা বর্ণনা করেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে।

সেই সাথে এই উম্মতের প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তীতে আগমনকারী উম্মতের সকল ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামাতের কথা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এ উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কারামাত প্রকাশ অব্যাহত থাকবে।

....

ব্যাখ্যা: كرامات **শব্দটি** كرامة **শব্দের বহুবচন।** আল্লাহ তা'আলা তাঁর অলীদের হাতে অলৌকিক ও অসাধারণ যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। **সুতরাং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে যা সংঘটিত হয়, তাই কারামত।** অর্থাৎ মানুষের নিকট পরিচিত ও চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম যা সংঘটিত হয়, তাই কারামত। أولياء **শব্দটি** ولي **শব্দের বহুবচন।** প্রত্যেক মুমিন মুত্তাকীই আল্লাহর অলী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

"মনে রেখো যে, আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই। আর তারা বিষন্নও হবে না। তারা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে" (সূরা ইউনূস: ৬২-৬৩)

الولاء **শব্দ থেকে অলী শব্দটি নির্গত হয়েছে।** আর الولاء অর্থ ভালবাসা অর্জন করা ও নৈকট্য হাসিল করা। **সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পছন্দ এবং মর্জি মোতাবেক কাজ করে তাঁর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যমে যে মুমিন মুত্তাকী আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করেছে, সেই আল্লাহর অলী।**

অলীদের কারামাত সত্য। আল্লাহ তা'আলার কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা অলীদের কারামত সত্য বলে প্রমাণিত। অলীদের কারামতের ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে।

প্রথম প্রকার: বিদ'আতীদের একটি দল অলীদের কারামত অস্বীকার করে। যেমন মুতাযেলা, জাহমিয়া এবং আশায়েরাদের কিছু লোক কারামত অস্বীকার করে। তাদের দলীল হলো অলীদের হাতে যদি কারামত প্রকাশিত হওয়া জায়েয হয়, তাহলে যাদুকরের সাথে অলীর অবস্থা মিলে যাবে এবং নাবীদের থেকে অলীদেরকে পার্থক্য করা অসম্ভব হবে। কেননা মুজেযার মাধ্যমেই নাবী এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সাধারণ ও চিরাচরিত প্রথার বাইরে যা বের হয়, তার নামই মুজেযা।

দ্বিতীয় প্রকার: সুফী তরীকার লোকেরা এবং কবর পূজারীরা কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালংঘন করে থাকে। তারা মানুষের সাথে মিথ্যা বলে এবং তাদেরকে শয়তানের তেলেসমাতি দেখায়। যেমন আগুনে ঝাপ দেয়া, নিজেদের শরীরে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা, বিষাক্ত সাপ ধরে ফেলা ইত্যাদি। এমনি কবর পূজারীদের আরো অনেক কাজ-কর্মকে তারা কারামত নাম দিয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রকার: শাইখুল ইসলাম তৃতীয় আরেক প্রকার লোকদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তারা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। তারা অলীদের কারামতে বিশ্বাস করে এবং কুরআন সুন্নাহর দলীল মোতাবেক উহাকে সাব্যস্ত করে। নাবীদের সাথে অন্যদের সাদৃশ্য ঠেকানোর দোহাই দিয়ে যারা কারামত অস্বীকার করে, তাদের জবাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে থাকে যে, নাবীদের মাঝে এবং অন্যদের মধ্যে কারামত ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অলী কখনো নবুওয়াতের দাবী করে না। যদি নবুওয়াতের দাবী করে, তাহলে সে অলী হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারে পরিণত হয়; সে তখন আর অলী থাকে না। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম রীতি হলো, তিনি নবুওয়াতের দাবীদারকে অপদস্ত করেন। যেমন অপদস্ত হয়েছিল মুসাইলামা কায্যাব এবং অন্যরা।

আর যারা কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করে এবং ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের জন্যও তা সাব্যস্ত করে তাদের জবাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে যে, আসলে তারা আল্লাহর অলী নয়; বরং শয়তানের অলী। তাদের হাতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা হয়ত মিথ্যা ও ধোঁকাকাবাজি অথবা তাদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ফিতনা স্বরূপ। অথবা তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে ধীরে ধীর পাকড়াও করবেন। এই বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহি. এর একটি মূল্যবান কিতাব রয়েছে। কিতাবটির নাম: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (আল্লাহর অলী এবং শয়তানের অলীদের মধ্যে পার্থক্য)।

আল্লাহ তা‘আলা অলীদের হাতে বিভিন্ন প্রকার ইলম ও কাশ্‌ফ থেকে যা প্রকাশ করেন এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করেঃ এখানে শাইখুল ইসলাম ইঙ্গিত করেছেন যে, কারামতের কিছু অংশ ইলম ও কাশফের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অলীগণ এমন কিছু শুনলেন যা অন্যরা শুনলোনা কিংবা তারা এমন কিছু দেখলেন, যা অন্যরা দেখেনি। এটি জাগ্রত অবস্থায় হতে পারে কিংবা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাধ্যমেও হতে পারে। অথবা অলীগণ এমন কিছু জানতে পারলেন, যা অন্যরা জানতে পারলনা। আবার কারামতের কিছু অংশ কুদরত ও ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো, যেমন উমার ﵁ এর উক্তি يا سارية الجبل হে সারিয়া! পাহাড়ে আশ্রয় নাও।[৯৭] এ কথা বলার সময় তিনি মদীনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে জুম‘আর খুতবা দিচ্ছিলেন। আর সারিয়া ছিল পূর্বের কোন একটি অঞ্চলে। আবু বকর ﵁ বলেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর পেটে কন্যা সন্তান রয়েছে।[৯৮] উমার ﵁ তাঁর সন্তানদের থেকে কে কে ন্যায়পরায়ণ হবে, তা আগেই বলে দিয়েছিলেন। মুসা ও খিযির ﵉এর ঘটনায় রয়েছে যে, খিযির ﵇ যে ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন, তার অবস্থা তিনি জানতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকার কারামতের উদাহরণঃ আর কারামতের যেই প্রকার হলো ক্ষমতা ও প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত, তার উদাহরণ হলো যেমন ঐ ব্যক্তির ঘটনা, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল এবং চোখের পলকে বিলকীসের আরশ সুলায়মান ﵇এর সামনে হাযির করেছিলেন, আসহাবে কাহাফের ঘটনা। মারইয়াম ﵍এর ঘটনা, খালেদ বিন ওয়ালীদ ﵁ এর ঘটনা, তিনি যখন বিষ পান করলেন, তখন তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি।

---

৯৭. সিলসিলাহ সহীহাহ ১১১০।

৯৮ . মুয়াত্তা মালিক ৪০, বিচার সম্পর্কিত অধ্যায়।

শাইখুল ইসলাম বলেনঃ পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামত সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব কারামতের কথা বর্ণনা করেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে। সেই সাথে এই উম্মতের প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তীতে আগমনকারী ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামতের কথা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করে।

এখানে শাইখুল ইসলাম ঐসব কারামতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা অতীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং কুরআনুল কারীম ও অন্যান্য গ্রন্থে সহীহভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতির কারামতগুলো থেকে কুরআনুল কারীমে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে স্বামী ছাড়াই মারইয়ামের গর্ভধারণ করা, সূরা কাফের আসহাবে কাহাফের ঘটনা, মুসার সাথে খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং যুল কারনাইনের ঘটনা অন্যতম।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত কারামতগুলোর প্রতি বিশ্বাস করে। তাদের প্রথমে রয়েছেন সাহাবী ও তাবেঈগণ। যেমন উমার বিন খাত্তাব ﵁ মদীনার মিম্বার থেকে সারিয়াকে দেখতে পেলেন। তিনি ছিলেন মদীনার মিম্বারের উপর দাঁড়ানো। আর সারিয়া ও তাঁর বাহিনী ছিল ইরাকের নাহাওয়ান্দে যুদ্ধরত। তিনি সেনাপতি সারিয়াকে “ইয়া সারিয়াতা আল-জাবাল” বলে ডাক দিলেন। সারিয়া এই ডাক শুনতে পেল এবং উমারের দিক নির্দেশনা পেয়ে উপকৃত হলো। মুসলিম বাহিনী শত্রুদের চক্রান্ত থেকে বেঁচে গেল।

তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এই উম্মতের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারামত প্রকাশিত হওয়া অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বেলায়াত পাওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গেলে এই উম্মতের লোকদের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারামত প্রকাশিত হতেই থাকবে।

فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولم سموا بذلك

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা হয়?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِوَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)[رواه أحمد (126/4) وأبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42) عن العرباض وصححه جماهير علماء الأمة].

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الِاجْتِمَاعُ وَضِدُّها الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الِاخْتِلَافُ وَانْتَشَرَ تِ الْأُمَّةِ

অতঃপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম তরীকা হলো তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করে,

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারদের পথে চলে এবং রসূল ﷺ এর ঐ অসীয়ত মেনে চলে, যেখানে তিনি বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তীতে হেদায়াতপ্রাপ্ত খেলাফায়ে রাশেদীনের পথ ধরে চলবে। তোমরা উহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং উহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয়াদি উদ্ভাবন করা থেকে দূরে থাকবে। কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন রীতিই ভ্রষ্টতা।[৯৯]

তারা জানে যে, সর্বাধিক সত্য কথা হলো আল্লাহর কালাম এবং সর্বোত্তম হেদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ এর হেদায়াত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর কালামকে সকল প্রকার মানুষের কালামের উপর প্রাধান্য দেয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর হেদায়াতকে মানুষের সকল মতাদর্শের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এ জন্যই তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। তাদেরকে আহলুল জামা'আতও বলা হয়। কেননা জামা'আত অর্থ হলো ঐক্যবদ্ধ থাকা।[১০০] **এর বিপরীত হলো ফির্কাবন্দী হওয়া বা দলাদলি করা। যদিও জামা'আত শব্দটি ঐক্যবদ্ধ একদল মানুষের পরিচয় সূচক নামে পরিণত হয়েছে।**

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তৃতীয় মূলনীতি হলো ইজমা। ইলম অর্জন এবং দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে এ ইজমার উপর নির্ভর করা হয়।

---

৯৯ . সহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২।

১০০. তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলার কারণ হলো, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং দলে দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয় না। তাদের সংখ্যা কম হলেও তারা একটি জামা'আত। মূলতঃ জামাআত বলতে হকের উপর এক্যবদ্ধ লোকদেরকে বুঝায়। সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। সংখ্যা বেশী হলেও যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে দূরে তাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় জামাআত বলা হয়না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দ্বীন সম্পর্কিত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও আমল ওজন করে থাকে। উম্মতের সালাফে সালেহীনের ইজমাই কেবল দ্বীনের মূলনীতি হিসাবে গণ্য। কেননা তাদের পরে প্রচুর মতভেদ হয়েছে এবং উম্মত দলে দলে ভিবক্ত হয়ে পড়েছে।

....

ব্যাখ্যা: পূর্বের অধ্যায়সমূহে আক্বীদার মাসআলাগুলোতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তরীকা আলোচনা করার পর এই অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে শাইখুল ইসলাম দ্বীনের সমস্ত মূলনীতি এবং শাখা-প্রশাখাগুলোর ক্ষেত্রে তাদের তরীকা বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে আহলে সুন্নাতের লোকদের ঐসব বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে তারা বিদ'আতী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতাকারীদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

(১) প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নাবী ﷺ এর আদর্শের অনুসরণ করা: অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নাবী ﷺ এর তারীকা অবলম্বন করে এবং তাঁর মানহাজের (নিয়ম- পদ্ধতি) উপরেই চলে। এতে করে তারা ঐসব মুনাফেক থেকে আলাদা হয়ে যায়, যারা শুধু প্রকাশ্যভাবে রসূল ﷺ এর অনুসরণ করে থাকে; তারা গোপনে তাঁর অনুসরণ করে না।

রসূল ﷺ এর সুন্নাতকে আছার বলা হয়। আছার দ্বারা বাহ্যিক আছার তথা তাঁর বাহ্যিক স্মৃতি ও রেখে যাওয়া জিনিসগুলো উদ্দেশ্য নয়। যেমন রসূল ﷺ এর বসার স্থানসমূহ, তাঁর ঘুমানোর স্থানসমূহ ইত্যাদি। এগুলো খুঁজে বেড়ানো হলে শির্কে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন অবস্থা হয়েছিল পূর্বের জাতিসমূহের। [সুতরাং নাবী ﷺ থেকে যেই কথা, কাজ অথবা সমর্থন বর্ণিত হয়েছে, তাকেই সুন্নাত বলা হয়।]

(২) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী মুহাজির ও আনসারদের পথ অবলম্বন করা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো তারা ইসলামের প্রথম যুগের এবং সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আনসার ও মুহাজিরদের পথেই চলে।

কেননা আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান ও বোধশক্তি দিয়েছিলেন। তারা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং রসূল ﷺ এর পবিত্র জবানীতে ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করেছেন। তারা রসূল ﷺ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তারা সত্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং রসূল ﷺ এর পরে তারাই সর্বাধিক অনুসরণীয়। সুতরাং রসূলের পরে অনুসরণের দিক থেকে তাদের স্থান দ্বিতীয় স্তরে।

ফলে দ্বীনের কোন মাস‘আলায় নাবী ﷺ থেকে দলীল না পাওয়া গেলে সাহাবীদের কথাই ঐ বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার অনুসরণ করা আবশ্যক হবে। কেননা তাদের পথ হলো সর্বাধিক নিরাপদ, সর্বাধিক জ্ঞান সম্পন্ন, অত্যাধিক সুস্পষ্ট এবং খুব মজবুত।

পরবর্তী যুগের কতিপয় লোকের ন্যায় এই কথা বলা ঠিক হবে না যে, সালাফদের পথ সর্বাধিক নিরাপদ হলেও পরবর্তীদের পথ সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সুদৃঢ়। এতে করে তারা সালাফদের পথ পরিহার করে খালাফ তথা পরবর্তীদের পথেই চলে।

(৩) রসূল ﷺ এর অসীয়ত মেনে চলা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা রসূল ﷺ এর সেই অসীয়ত মেনে চলে যেখানে তিনি বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ من بعدي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح.

“তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং উহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম গোমরাহী”।[১০১]

---

১০১. সহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২।

এখানে শাইখের উদ্দেশ্য হলো এই কথা বর্ণনা করা যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও সৎকর্মে অগ্রগামী সকল আনসার ও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করার সাথে সাথে বিশেষভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনেরও অনুসরণ করে থাকে। কেননা এ হাদীসে নাবী ﷺ নির্দিষ্টভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এখানে তিনি তাঁর সুন্নাতকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, খোলাফায়ে রাশেদীন বা তাদের কারো একজনের সুন্নাত পরিত্যাগ করা যাবে না।

والخلفاء الراشدون খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে চারজন খলীফা উদ্দেশ্য। আবু বকর, উমার, উছমান ও আলী ﷺ। তাদেরকে রাশেদীন তথা সুপথগামী বলার কারণ হলো তারা সত্যকে চিনতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছেন।

যে ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পেরেছে এবং অনুসরণ করেছে, সেই রাশেদ বা সুপথপ্রাপ্ত। এর বিপরীত হলো, পথভ্রষ্ট। অর্থাৎ সত্যের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু সে আনুযায়ী আমল করেনি, সেই হলো পথভ্রষ্ট।

المهديين হেদায়াতপ্রাপ্ত: অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সত্যের দিকে হেদায়াত করেছেন। تمسكوا بها তোমরা উহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। وعضوا عليها بالنواجذ অর্থাৎ এখানে রাসূল ﷺ এর সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাড়ির শেষপ্রান্তের দাঁতগুলোকে আযরাস বলা হয়।

محدثات الأمور নতুন বিষয়সমূহ: অর্থাৎ তোমরা সকল প্রকার বিদআত পরিহার করবে। **فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** কেননা প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।

البدعة বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, **ماليس له مثال سابق** "যার কোন পূর্ব নুমনা নেই"।

আর শরীয়তের পরিভাষায় বিদআতের পরিচয় হলো, **যার পক্ষে**

শরীয়তের দলীল নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নতুন কিছু তৈরী করে দ্বীনের দিকে সম্বন্ধ করবে, যার পক্ষে কোন দলীল নেই, তাই বিদআত ও গোমরাহী। চাই তা আক্বীদার ক্ষেত্রে হোক কিংবা কথা ও কাজের মধ্যে হোক।

(৪) আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে, দলীল উপস্থাপন করার সময় মানুষের কথা ও কর্মের উপর এ দু'টিকে প্রাধান্য দেয় এবং তার অনুসরণ করে। কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কালামই হলো সর্বাধিক সত্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا** "আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কার কথা হতে পারে"? (সূরা নিসা ৪:১২২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: **وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا** "আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? (সূরা নিসা ৪:৮৭)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর হেদায়াত হলো সর্বোত্তম হেদায়াত।

الهدي শব্দের 'হা' বর্ণে যবর ও 'দাল' বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ হলো পন্থা, পথ, জীবন পদ্ধতি। الهدى শব্দটির هاء বর্ণে পেশ এবং دال বর্ণে যবর দিয়ে পড়াও জায়েয আছে। তখন অর্থ হবে রাস্তা দেখানো বা সঠিক পথ প্রদর্শন করা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মানুষের কথার উপর আল্লাহ তা'আলার কালামকে প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহর কালামকে প্রাধান্য দেয় এবং উহাকেই গ্রহণ করে। মানুষের কথা আল্লাহর কালামের বিরোধী হলে তারা মানুষদের কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর কথাকেই গ্রহণ করে। তাদের মর্যাদা ও পদবী যত বড়ই হোক না কেন। রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা আলিম-ইমাম অথবা ইবাদাতকারী, যেই হন না কেন, আল্লাহর

কথার মোকাবেলায় তারা কারো কথা গ্রহণ করে না।

সেই সাথে তারা মুহাম্মাদ ﷺ এর হেদায়াতকে সকল মানুষের মত ও পথের উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা তাঁর সুন্নাত, জীবন চরিত, শিক্ষা ও উপদেশকে মানুষের আচরণের উপর প্রাধান্য দেয়।

সেই সাথে মানুষের পদমর্যাদা যত বড়ই হোক না কেন। বিশেষ করে যখন সেই মানুষের আচরণ রসূল ﷺ এর সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উপর আমল করতে গিয়েই তারা তা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও (সূরা নিসা: ৫৯)।

وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ এ জন্যই তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাত হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে: আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কারণে, মানুষের কথা ও আচরণের উপর উহাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে এবং আল্লাহর রসূলের হেদায়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কারণে ও সমস্ত মানুষের আচরণের উপর উহাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাত বলা হয়।

এ কারণেই তাদেরকে এই সম্মানজনক উপাধী দেয়া হয়েছে। এই সম্মানজনক উপাধী থেকে বুঝা যায়, যারা কুরআন ও সুন্নাহর পথ থেকে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট মুতাযেলা, খারেজী, রাফেযী এবং অন্যান্য গোমরাহ লোকদের মতামতকে বা উহার অংশ বিশেষকে সমর্থন করে, তারা ব্যতীত শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের লোকেরাই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণের বিশেষণে বিশেষিত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে যেমন আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাত বলা হয় তেমনি আহলুল জামা'আতও বলা হয়।

الجماعة শব্দটি **الفُرْقَة** (ফির্কাবন্দী, বিভেদ ও দলাদলি) শব্দের বিপরীত। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরলে ঐক্য ও সংহতি তৈরি হয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়ে বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রুজ্জুকে মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সূরা আল ইমরান: ১০৩)।

সুতরাং এখানে জামা'আত বলতে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ লোকদেরকে বুঝায়।

(৫) আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দলীল গ্রহণ করা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দলীল গ্রহণ করে, হকের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে। এর ফলেই ইসলামী শরীয়তে তৃতীয় মূলনীতি ইজমার উৎপত্তি হয়েছে। দ্বীনি ইলম অর্জন ও আমলের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় মূলনীতি ইজমাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

উসূলবিদগণ ইজমার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, الأجماع هو اتفاق علماء العصر على أمر ديني দ্বীনের কোন বিষয়ে একই যুগের আলেমদের ঐক্যমত পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা একটি অকাট্য দলীল। ইহার উপর আমল করা জরুরী। ইজমার স্থান যেহেতু আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের পরে, তাই ইহাকে তৃতীয় মূলনীতি বলা হয়।

(৬) আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং আলেমদের ইজমা দ্বারা মানুষের কথাসমূহকে যাচাই করা: আহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দ্বীন

সম্পর্কিত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও আমল ওজন করে থাকে। তারা এই তিনটি মূলনীতিকে হক ও বাতিলের মাঝে এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে পার্থক্য করার মানদন্ড হিসাবে নির্ধারণ করে। সুতরাং তাদের থেকে আক্বীদা কিংবা আমল সম্পর্কিত যেসব কথা, কাজ ও আচরণ প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে তারা এই দাড়িপাল্লায় রেখে ওজন করে। দ্বীন সম্পর্কিত সকল বিষয়ই তারা এই তুলাদন্ডের সাহায্যে যাচাই করে। যেমন সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার। আর জাগতিক যেসব বিষয়ের সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই, যেমন মানুষের সাধারণ অভ্যাসসমূহ এবং দুনিয়াবী বিষয়াবলী, সেগুলোর ব্যাপারে মূলনীতি হলো ঐ সমস্ত কিছুই বৈধ।

অতঃপর যেই ইজমাকে দ্বীনী বিষয়ে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে ধরা হবে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ উহার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ বাস্তবে যেসব বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে, উহা দ্বারা কেবল ঐসব বিষয় উদ্দেশ্য, যার উপর ছিলেন উম্মতের সালাফে সালেহীনগণ। অর্থাৎ সালাফে সালেহীনদের ইজমাই কেবল দ্বীনের মূলনীতি হিসাবে গণ্য। কেননা তারা ছিলেন আরব উপদ্বীপের হিজায অঞ্চলের একস্থানে একত্রিত অবস্থায়। তাদের সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং দ্বীনী বিষয়ে তাদের সকলের মতামত জানা সম্ভব ছিল। তাদের পরে প্রচুর মতভেদ হয়েছে এবং উম্মত দলে দলে ভিবক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং সালাফে সালেহীনের পরে দুই কারণে ইজমাকে নিয়ন্ত্রিণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

(ক) সালাফে সালেহীনের যুগের পরে ইখতেলাফ এত বেশী হয়েছে যে, আলিমদের সকল কথা আয়ত্তে আনয়ন ও সংরক্ষণ করা অসম্ভব।

(খ) ইসলামী বিজয় অভিযানের পর মুসলিম জাতির আলিমগণ পৃথিবীর সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছেন যে, কোন বিষয় তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছা এবং তাদের সকলের পক্ষে উহা অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। দৃঢ়তার সাথে ইহা বলা সম্ভব নয় যে, তারা সকলেই উক্ত বিষয়ে এক ও অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

একটি সতর্কতা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া দ্বীনের মূলনীতি তিনটিকেই উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ মূলনীতি কিয়াস উল্লেখ করেননি। কেননা কিয়াস শরীয়াতের মূলনীতি হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। যেমন মতভেদ রয়েছে দ্বীনের অন্যান্য মূলনীতির ব্যাপারে। এ বিষয়ে উসূলে ফিকাহর কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে সেগুলো পড়তে হবে।[১০২]

১০২. মূলতঃ আকীদাহ বিষয়ে মূলনীতি উক্ত তিনটিই মাত্র। কিয়াস দ্বারা আকীদাহ সাব্যস্ত হয় না। তাই এখানে চতুর্থটির উল্লেখ করা হয়নি।

فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة

আক্বীদার বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে, সে ব্যাপারে এ অনুচ্ছেদ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷺ বলেন:

ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ

পূর্বে যেসব মূলনীতির কথা আলোচনা করা হলো, তা বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয়, শরীয়াতের অপরিহার্য দাবী মোতাবেক অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এবং শাসক গোষ্ঠির সাথেই হজ্জ পালন করে, জিহাদ করে, জুমু‘আ ও ঈদের সলাত আদায় করে। এটিকে তারা আবশ্যক মনে করে। শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ন হোক কিংবা যালেম ও পাপাচারী হোক, -উভয় অবস্থাতেই তারা উপরোক্ত কাজগুলো তাদের সাথেই সম্পাদন করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা জামা‘আতের সাথে সলাত আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকে, উম্মতের সকল শ্রেণীর মানুষকে

নসীহত করাকে ইবাদাত ও দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। তারা এই হাদীস দু'টির মর্মার্থ বাস্তবায়ন করাকে আক্বীদার অংশ মনে করে, যাতে নাবী ﷺ বলেছেনঃ

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ»

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে নাবী ﷺ এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন"।[১০৩] তিনি আরো বলেনঃ

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (بخاری: 6011)

"পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়"।[১০৪]

সেই সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বালা-মুসীবত ও বিপদাপদের সময় সবর করা, সুখ-শান্তির সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাকদীরের তিক্ত বিষয়গুলো সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার উপদেশ প্রদান করে।

....

ব্যাখ্যাঃ এই অধ্যায়টি পূর্বের অধ্যায়ের পরিপূরক স্বরূপ। এতে শাইখুল ইসলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যা তাদের আক্বীদার বিষয়গুলোকে পূর্ণতা দান করে। শাইখুল ইসলাম বলেনঃ অতঃপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই মূলনীতিগুলোর সাথে অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেসব

---

১০৩. সহীহ বুখারী ৪৮১, মুসলিম ২৫৮৫, সহীহ ইবনে হিব্বান ২৩১, সুনানুর কুবরা বাইহাকী ১১৫১১।

১০৪. সহীহ বুখারী ৬০১১, সহীহ মুসলিম ২৫৮৬।

মূলনীতি অতিক্রান্ত হলো, তারা সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার সাথে সাথে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন করে, যা তাদের আক্বীদা্র মৌলিক বিষয় না হলেও আক্বীদার বিষয়গুলোকে পূর্ণতা দান করে। সেগুলো তাদের গৃহীত আক্বীদা'র ফলাফলও বটে।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বৈশিষ্ট্য কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে" (সূরা আল ইমরান ৩:১১০)

ঈমান ও সৎ আমল সম্পর্কিত যেসব কথা ও কাজ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, তাই উত্তম কাজ বলে বিবেচিত। আর আল্লাহ তা'আলা যা অপছন্দ করেন এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তাই অপছন্দীয় কাজ বলে বিবেচিত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শরীয়াতের দাবী মোতাবেক অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ হতে বারণ করতে গেলে কল্যাণ অর্জিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি সামনে রেখে প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করে, শক্তি না থাকলে জবানের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, তাও না থাকলে অন্তর দিয়ে অন্যায়ের অপসারণ কামনা করে ও আল্লাহর নিকট অন্যায়ে লিপ্তদের হেদায়াতের জন্য দু'আ করে। মুতাযেলারা এ বিষয়ে শরীয়াতের দাবী ও বাধ্যবাধকতা মানে না। তারা মনে করে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ বলতে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই বুঝায়।

শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ণ কিংবা ফাসেক যাই হোক না কেন, আহলে

সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের সাথেই হাজ্জ পালন, জিহাদ, জুমু'আ ও ঈদাইনের সলাত সম্পন্ন করে। মুসলিমদের শাসকদের অধীনে থেকে দ্বীনের এ নিদর্শন বা অনুষ্ঠানগুলো পালন করাকে তারা আক্বীদার অংশ মনে করে। শাসকরা যদি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা তারা যদি এমন পাপাচারী হয়, যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তাহলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শাসকদের অনুগত থাকে এবং তাদের সাথেই উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে।

ফাসেক ও পাপাচারী শাসকদের সাথে ঐ কাজগুলো করার পিছনে মুসলিমদের উদ্দেশ্য হলো ঐক্য ঠিক রাখা এবং দলাদলি ও ফির্কাবন্দী থেকে দূরে থাকা। আর ফাসেক শাসক নিজের পাপাচারের কারণে শাসন ক্ষমতা থেকে নেমে যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেননা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গেলে মানুষের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রচুর রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন: অতীতে যেসব ফির্কা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের বিদ্রোহের কারণে যে পরিমাণ লাভ হয়েছে, তার চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে অনেক বেশী।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিষয়ে ঐসব খারেজী, মুতাযেলা, শিয়া এবং বিদ'আতীদের থেকে আলাদা, যারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করে। বিশেষ করে যখন তারা শাসকদেরকে এমন কিছু করতে দেখে, যা যুলুম কিংবা যুলুম বলে ধারণা করা হয়। তারা এই বিদ্রোহকে সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকে: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা ফরয সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। চাই তা জুমু'আর সলাতের জামা'আত হোক বা

ওয়াকতীয়া সলাতের জামা'আত হোক। কেননা জুমু'আ ও জামা'আত ইসলামের বৃহৎ নিদর্শনসমূহের অন্যতম এবং তাতে রয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য। তারা ঐসব শিয়াদের মত করে না, যারা নিষ্পাপ ইমাম ছাড়া অন্য কারো সাথে সলাত পড়াকে বৈধ মনে করে না। তারা মুনাফেকদের থেকেও ভিন্ন, যারা জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে। জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের অনেক ফাযীলাত রয়েছে, জামাআতে শরীক হওয়ার আদেশ এসেছে এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি যেহেতু জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার স্থান নয়, তাই বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হলো।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকদেরকে নসীহত করাকে ইবাদাত ও দ্বীনের অংশ মনে করে। **النصح** শব্দের মূল অর্থ আন্তরিকতা, খাঁটিত্ব বিশুদ্ধতা ইত্যাদি। আর শরীয়াতের পরিভাষায়: **هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه** অর্থাৎ উপদেশ দানকৃত ব্যক্তির শুভ কামনা করা এবং তার উপকার সাধনকারী বিষয়দির দিকে পথ নির্দেশ দেয়াকে নসীহত বলা হয়। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মতের জন্য শুভ কামনা করে এবং যাতে তাদের কল্যাণ রয়েছে, উহার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে।[১০৫]

---

১০৫. রসূল ﷺ বলেন:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ

"দ্বীন হলো নসীহত বা নসীহত দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাহাবীগণ বলেন: আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য নসীহত? তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের শাসক এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য"। (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং-৮২)

আল্লাহ তাআলার জন্য নসীহতের অর্থ কী:

আল্লাহ তাআলার জন্য নসীহতের অর্থ হল, সত্যিকার ভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্ কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া। নিষ্ঠার সাথে এককভাবে তাঁর এবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। তিনি যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো বাস্তবায়ন করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা, তিনি যা ভালবাসেন তা ভালবাসা এবং তাঁর অপছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করা। মুমিন

বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আর কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করল সে স্বীয় প্রভুর জন্য নসীহত আদায় করল। পবিত্র কুরআন থেকে এই হাদীছের সমর্থনে নিম্নের আয়াতটি সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্য:

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ﴾

"দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং তাদের সাথে মনের দিক থেকে পবিত্র হবে।" (সূরা তাওবা: ৯১)

আল্লাহ্র কিতাবের নসীহত:

এ কথার অর্থ হলো, কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা। যেমন ঈমান রেখেছিলেন সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ। ইমাম তাহাবী ﷺ বলেন: আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। তা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে। অহী আকারে তিনি উহা অবতীর্ণ করেছেন। মুমিনগণ সত্য হিসেবে উহা বিশ্বাস করে এবং দৃঢ় আস্থা রাখে যে আল্‌কুরআন সৃষ্টি জগতের ন্যায় আল্লাহ্র সৃষ্ট নয় বরং উহা প্রকৃতই আল্লাহ্র কালাম সুতরাং উহা শুনে কেউ যদি ধারণা করে যে উহা মানুষের কথা তাহলে সে কুফরী করল। এ ধরণের লোকদেরকে আল্লাহ্ তায়া'লা দুষ্কৃতিকারী ও পাপাচারী বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদেরকে "সাকার" নামক জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। তিনি বলেন: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر যে এ কথা বলে ইহা মানুষের কথা বৈ কিছু নয়, তাকে অচিরেই আমি "সাকার" নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া)

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে মানুষের স্রষ্টার বাণী, উহা মানুষের কথার সাথে কোন ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত বা পঠনও তার জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্গত। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلا "এবং কুরআন তেলাওয়াত করো তারতীল সহকারে সুবিন্যস্তভাবে"। (সূরা মুযাম্মিল: ৪) এমনিভাবে মুসলিমদেরকে উহা শিক্ষাদান করাও মঙ্গল কামনার অন্তর্গত। মহানাবী ﷺ বলেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিখায়"। (সহীহ বুখারী, হাদীছ নং- ৪৬৩৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য নসীহত:

আল্লাহ তাআলার বাণী: **إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه** ইমাম কুরতুবী (রহ:) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ্র রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ হলো তাঁর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা, তাঁর বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু ভাবা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ভালবাসা, তাঁর সুন্নাতের তাযীম করা, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুন্নাতের লালন করা, গভীর জ্ঞানলাভের জন্য উহার গবেষণা করা, প্রচার-প্রসার এবং উহার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং তাঁর মহান চরিত্রে চরিত্রবান হতে সচেষ্ট থাকা। {(তাফসীরে কুরতুবী, (৮/২২৭)}

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কল্যাণের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে এবং তাদের কেউ আহত হলে কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তার ব্যথায় ব্যথিত হয়। সুতরাং তারা এই হাদীসের মর্মার্থে বিশ্বাস করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। রসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য এমন প্রাচীর সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে নাবী ﷺ এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।[১০৬] তিনি আরো বলেন:

মুসলিম শাসকদের জন্য নসীহত:

মুসলিম শাসকদের মঙ্গল কামনা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার ﵀ বলেন, শাসকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে সহযোগিতা করা, উদাসীনতার মুহূর্তে সতর্ক করা, ভুল-ত্রুটির মুহূর্তে বিদ্রোহ না করে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তাদের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা হলো, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় ও যুলুমের পথ থেকে তাদেরকে বাধা দান করা। {(ফতহুলবারী, ১/১৩৮)}

সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা:

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী ﵀ বলেন: তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলজনক বিষয়ে নির্দেশনা দান, দ্বীনের অজানা বিষয়ে জ্ঞান দান করা এবং এ ব্যাপারে কথা ও কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা এবং তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। ক্ষতি এবং কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা তথা তাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করা। দয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। সকলের প্রতি সহনশীল হওয়া। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি দয়া করা। উত্তম পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া, ধোঁকা ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা। নিজের অপছন্দনীয় বস্তু তাদের জন্য অপছন্দ করা। তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জতের হেফাযত করা। মোটকথা সার্বিক দিক থেকে সাধারণ মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করা।১০৫

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কল্যাণকামিতা শুধু মুসলিমদের সাথেই সীমিত নয়, বরং অমুসলিমদের জন্যও তা অপরিহার্য। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জাতির কল্যাণ কামনা করেছেন তথা তাদেরকে শির্ক ও মূর্তি পূজার অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

১০৬. সহীহ বুখারী ৪৮১, মুসলিম ২৫৮৫, সহীহ ইবনে হিব্বান ২৩১।

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (بخارى: **6011**)

"পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়"।[১০৭]

উপরের হাদীস দু'টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কেমন হওয়া উচিৎ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই হাদীস দু'টির দাবী অনুযায়ী আমল করে।

এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সম্পর্ক এবং মুমিনদের দৃষ্টান্ত: এখানে ঈমান বলতে পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একজন পূর্ণ মুমিনের সাথে অন্য একজন পূর্ণ মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো, যেমন একটি মজবুত প্রাচীর, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত ও লাগানো। মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ তা সহজভাবে বুঝানোর উদ্দেশ্যে এই দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত: এই বাক্যে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

وشبك بين أصابعه তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহকে জালের মত বানালেন: এটি হলো মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি দৃষ্টান্ত। এ কথা বুঝোনোর উদ্দেশ্যে এই উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। তারা সকলেই একটি মাত্র দেহের মত হবে। অর্থাৎ একটি শরীরের সমস্ত অঙ্গ যেমন পরস্পর জড়িত এবং আরাম ও কষ্ট অনুভব করার মধ্যে যেমন শরীরের সবগুলো অঙ্গই শরীক হয়, ঠিক তেমনি সমস্ত মুমিন মিলে একটি দেহের মতই। তাদের একজনের সুখ-শান্তি সকলেরই সুখ-শান্তি এবং একজনের দুঃখ-বেদনা সকলেরই দুঃখ-বেদনা।

---

১০৭. সহীহ বুখারী ৬০১১, সহীহ মুসলিম ২৫৮৬।

তারা পরস্পরকে ভালবাসার ক্ষেত্রে এবং পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শনে একই দেহের মত। দেহের কোন অঙ্গ যখন অসুস্থ হয় এবং ব্যথা অনুভব করে তখন এক অঙ্গের ব্যথায় অন্য অঙ্গ শরীক হয়। অর্থাৎ শরীরের সকল অঙ্গই ব্যথিত হয়। সেই ব্যথার কারণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অনিদ্রায় রাত কাটাতে হয়। এমনি কোন মুসলিম যদি ব্যথিত হয়, তখন বিশ্বের সমস্ত মুসলিম সেই ব্যথায় শরীক হবে, এটিই ঈমানের দাবী।

এই হাদীসে মুসলিমদের পারস্পরিক বন্ধনের স্বরূপ তুলে ধরা হলেও তাতে মূলত আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরীরের এক অংশ ব্যথিত হলে সমস্ত শরীরেই যেমন সেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে, মুমিনদের অবস্থাও ঠিক একই দেহের মত হওয়া উচিৎ। তাদের কেউ কোন মসীবতে আক্রান্ত হলে সকলেরই তার সাথে ব্যথিত হওয়া উচিৎ এবং তার সেই মসীবত অপসারণের জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করা উচিৎ। এখানে বিষয়টিকে সহজভাবে পেশ করার জন্য উপমা প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের তাৎপর্যকে দৃশ্যমান চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো, তারা বিপদাপদ ও মসীবতের সময় দৃঢ়পদ থাকে এবং মসীবতের সময় পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দেয়।

الصبر। শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আটকিয়ে রাখা, বাধা দেয়া। এখানে সবর অর্থ হলো মুসীবতের সময় নফসকে অস্থিরতা প্রকাশ করা হতে বিরত রাখা, অভিযোগ ও বিরক্তি প্রকাশ করা হতে জবানকে আটকিয়ে রাখা এবং গালে চপেটাঘাত করা ও বুকের দিক থেকে শরীরের জামা ছিড়ে ফেলা থেকে হাতকে ব্যাহত করা।

البلاء। অর্থ হলো মুসীবত ও কঠিন অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো নেয়ামত ও সুখ-শান্তিতে থাকার সময় তারা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

الشكر বলা হয় এমন কাজকে, যা নেয়ামত প্রদান করার কারণে নেয়ামত প্রদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে যেই নেয়ামত দান করেছেন, তা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় করার নামই الشكر (কৃতজ্ঞতা)। প্রচুর ও ব্যাপক নেয়ামতকে বলা হয় الرخاء (স্বাচ্ছন্দ্য)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো, তারা তাকদীরের তিক্ত ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। الرضا (সন্তুষ্ট থাকা) السخط (অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি প্রকাশ) করার বিপরীত। القضاء শব্দের আভিধানিক অর্থ হুকুম করা, ফয়সালা করা। সকল সৃষ্টি এবং উহার আসল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইলম ও সে অনুযায়ী তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করাকেই শরীয়তের পরিভাষায় القضاء বলা হয়। তাকদীরের তিক্ত বিষয় দ্বারা ঐসব অপছন্দনীয় বিষয় উদ্দেশ্য, যা বান্দার উপর আপতিত হয়। যেমন রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র, মানুষের কষ্ট, গরম, ঠান্ডা এবং নানা রকম ব্যথা-বেদনা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﵀ বলেন:

وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا﴾ وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা উত্তম চরিত্র, সুমহান আচরণ এবং সৎ আমলের প্রতি আহবান করে। তারা নাবী ﷺ এর এই বাণীর মর্মার্থকেও বিশ্বাস এবং বাস্তবায়ন করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“ঐ ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র উত্তম”।[১০৮]

যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার আহবান জানায়, যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করার আদেশ করে এবং যে তোমার উপর যুলুম করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার উপদেশ দেয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার, ইয়াতীমদের প্রতি, মিসকীনদের প্রতি দয়া করার উপদেশ দেয়, মুসাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ করার আদেশ করে এবং দাস-দাসী ও

---

১০৮. সহীহ: আবু দাউদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৬২, দারিমী ২৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৮১৭।

অধিনস্তদের প্রতি কোমল ব্যবহার করার আহবান জানায়। একই সাথে তারা গর্ব, দাম্ভিকতা, অহংকার, যুলুম এবং ন্যায়ভাবে কিংবা অন্যায়ভাবে নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যকে ছোট মনে করা হতে নিষেধ করে। তারা সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার আদেশ করে এবং মন্দ স্বভাব বর্জন করার আহবান জানায়। মোটকথা, উপরোক্ত বিষয়গুলো এবং অন্যান্য বিষয় থেকে তারা যা বলে ও বাস্তবায়ন করে, তাতে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করে।

....

ব্যাখ্যা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উত্তম চরিত্র গঠণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। তারা নিজেরা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করে, অন্যদেরকেও তা অর্জনের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং সুন্দরতম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি মানুষকে আহবান জানায়। **الأخلاق** শব্দটি خلق -এর বহুবচন। خلق শব্দের خاء ও لام বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হলে উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মানুষের অভ্যন্তরীন গুণাবলী।

আর যদি خاء বর্ণে যবর এবং لام বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়া হয়, তাহলে উহা দ্বারা বাহ্যিক গঠন ও আকৃতি উদ্দেশ্য হবে। বাহ্যিক আকৃতি বলতে মানুষ্যের প্রকাশ্য স্বভাব-চরিত্র উদ্দেশ্য। **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সর্বোত্তম কাজ যেমন ভদ্রতা, বীরত্ব, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর প্রতি আহবান জানায়।** তারা রসূল ﷺ এর এ বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং উক্ত বাণীর দাবী অনুযায়ী আমল করে, যেখানে তিনি বলেছেন:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"ঐ ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র উত্তম"।[১০৯]

---

১০৯. সহীহ: আবু দাউদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৬২, দারিমী ২৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৮১৭।

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে হাসান সহীহ বলেছেন। সর্বোত্তম চরিত্র বলতে কোমল, নরম ও সুন্দরতম চরিত্র উদ্দেশ্য।

সুতরাং এ হাদীসে সুন্দরতম চরিত্রে চরিত্রবাণ হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে আরো জানা গেল যে, বান্দাদের আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে গণ্য। আরো জানা গেল, ঈমান বৃদ্ধি পায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা একদিকে যেমন মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার আহবান জানায়, হকদারদের হক আদায় করার আদেশ করে, অপর দিকে এর বিপরীত বিষয়গুলো যেমন অহংকার, দাম্ভিকতা ও যুলুম করা হতে সতর্ক করে।

সুতরাং যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক চ্ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে তারা তোমাকে ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা ও সদ্ব্যবহার করার আহবান জানায়, যে তোমাকে মাহরুম করে, তোমাকে ঐ ব্যক্তির জন্য খরচ করা, তাকে উপঢৌকন এবং অন্যান্য বস্তু দান করার আহবান জানায়। কেননা ইহাই প্রকৃত ইহসান ও ভদ্রতার পরিচয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তোমাকে আরো আহবান জানায় যে, তোমার উপর যে ব্যক্তি যুলুম করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। অর্থাৎ তোমার জান-মাল ও মান-সম্মানের কোন ক্ষতি করলেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। কেননা তাকে ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে তুমি তার ভালবাসা অর্জন করতে পারবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে এর বিনিময় পাবে।

بر الوالدين **পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা:** আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হকদারদের হকসমূহ আদায় করার যেই আদেশ করেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সেই হকগুলো আদায় করার আদেশ করে। যেমন পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, পাপাচারের আদেশ ব্যতীত তাদের অন্যান্য আদেশ পালন করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করা।

صلة الأرحام আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা: তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের প্রতি সুন্দরতম আচরণ করার আহবান জানায়। الأرحام শব্দটি رحم শব্দের বহুবচন। যার সাথে আপনার আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে, সেই আপনার رحم (নিকটাত্মীয়)।

حسن الجوار প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার: যারা আপনার আশপাশে বসবাস করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়ার আহবার জানায়।

وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ইয়াতীমদের প্রতি, মিসকীনদের প্রতি এবং মুসাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ করা: اليتامى শব্দটি يتيم -এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে অনাথ শিশুকে ইয়াতীম বলা হয়। **আর ইসলামের পরিভাষায় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যেই শিশুর পিতা মারা যান, তাকে ইয়াতীম বলা হয়।** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ইয়াতীমের প্রতি ইহসান করার আহবান জানায়। ইয়াতীমদের খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের ধন-সম্পদের দেখা-শোনা করা এবং তাদের প্রতি দয়া করাই হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার নামান্তর।

মিসকীনদের প্রতি দয়া করাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট। **مَسَاكِيْن** শব্দটি مسكين শব্দের বহুবচন। **মিসকীন বলা হয় সেই অভাবী লোককে, দারিদ্র এবং অভাব যাকে দুর্বল করে ফেলেছে। তাদেরকে দান-খয়রাত করা এবং কোমল ব্যবহারের মাধ্যমেই তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে।**

মুসাফিরের প্রতি সদ্ব্যবহর করা ও তার হক আদায় করাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট। যেই মুসাফিরের পথের সম্বল শেষ হয়ে গেছে কিংবা তার টাকা-পয়সা হারিয়ে গেছে অথবা চুরি হয়ে

গেছে, তাকেই কেবল সাহায্য করা আবশ্যক।[১১০] কেউ কেউ বলেছেনঃ কুরআনের যেই আয়াতে মুসাফিরের হক আদায় করতে বলা হয়েছে, সেখানে মুসাফির বলতে মেহমান উদ্দেশ্য।

الرفق بالمملوك দাস-দাসী ও অধিনস্তদের প্রতি কোমল ব্যবহার করাঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা দাস-দাসী ও অধিনস্তদের প্রতি সদাচরণ করার আহবান জানায়। চতুস্পদ জন্তুও অধিনস্তদের মধ্যে গণ্য। সুতরাং জীব-জন্তুর প্রতিও ইহসান করতে হবে এবং তাদের অধিকার পুরোপুরি দিতে হবে। الرفق ضد العنف অর্থাৎ কঠোরতার বিপরীত ব্যবহারই হলো কোমল ব্যবহার অর্থাৎ নম্রতা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা গর্ব, অহংকার এবং যুলুম করতে নিষেধ করে। বংশমর্যাদা এবং আভিজাত্য নিয়ে বড়াই করার নাম গর্ব। الخيلاء শব্দের خاء বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। ইহার অর্থ হলো অহংকার ও দাম্ভিকতা। মানুসের জান-মাল ও মান-সম্মানের উপর আক্রমণ করাকে البغي বলা হয়।

الاستطالة على الخلق ন্যায়ভাবে কিংবা অন্যায়ভাবে নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যকে ছোট মনে করা হতে নিষেধ করাঃ অর্থাৎ মানুষের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, মানুষকে তিরস্কার করা এবং তাদের মান-সম্মানে আঘাত করা হতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নিষেধ করে। সেটি ন্যায় সংগতভাবেই হোক আর অন্যায়ভাবেই হোক। ন্যায় সংগতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা হলে তা অহংকার ও দাম্ভিকতা বলে গণ্য হবে। আর অন্যায়ভাবে হলে তা যুলুম হিসাবে গণ্য হবে। দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা জায়েয নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মানুষকে সুমহান ও সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর দিকে আহবান জানায় এবং নিকৃষ্ট ও ঘৃণীত

---

১১০. সুতরাং যেই মুসাফিরের কাছে টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য সম্পদ রয়েছে, তার জন্য সাদকাহ ও মানুষের অন্যান্য অনুগ্রহ গ্রহণ করা জায়েয নেই।

স্বভাব-চরিত্র হতে তাদেরকে নিষেধ করে। প্রত্যেক জিনিসের নিকৃষ্ট ও ঘৃণীত অংশকে السفساف বলা হয়। এটি সুমহান ও সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর বিপরীত। চালনি দিয়ে আটা চালার সময় আটা থেকে যা উড়ে যায় এবং শুকনো যমীন চাষ করার সময় যে ধুলা উড়ে উহাকে سفساف বলা হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে তারা যা বলে ও বাস্তবায়ন করে, তাতে তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করে: অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে যা কিছু বলে ও বাস্তবায়ন করে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ থেকে যা কিছুর আদেশ করে ও যা থেকে নিষেধ করে, সেগুলো তাদের প্রভুর কিতাব কুরআনুল কারীম ও তাদের নাবীর পবিত্র সুন্নাত থেকেই নিয়েছে। চাই তা এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে উল্লেখিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হোক কিংবা এর বাইরে যা রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত হোক। তারা নিজেদের পক্ষ হতে তাদের আক্বীদা তৈরী করেনি এবং এ বিষয়ে তারা অন্যদের তাকলীদও করেনি। উপরোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকট আত্মীয় ও ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না"(সূরা নিসা ৪:৩৬)।

এ অর্থে অনেক হাদীস রয়েছে। সেগুলো থেকে শাইখ কিছু হাদীস উপরে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ﷬ বলেন:

وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإِسْلاَمِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَومَ وَأَصْحَابِي﴾ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ، وَالشُّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمُ أَعْلامُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى أُولو الْمَنَاقِبِ الْمَأْثُورَةِ، وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِمُ الأَبْدَالُ وَفِيهِمُ أَئِمَّةُ الدِّينِ الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَنْ لاَ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

আর ইসলামের পথ হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের একমাত্র তরীকা, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ ﷺকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ব্যতীত সবগুলো দলই জাহান্নামে যাবে, আর সেটি হলো জামা'আত এবং অন্য এক হাদীসে তিনি যেহেতু বলেছেন:

«هم من كان على مثل مَا أَنَا عَلَيْهِ اليوم وَأَصْحَابِي»

"আজ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যেই তরীকার উপর রয়েছি, যারা সেই পথেই চলবে তারাই হলো নাজাত প্রাপ্ত।"[১১১] তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই কেবল ভেজালমুক্ত খাঁটি ইসলামের ধারক

১১১. হাসান: তিরমিযী ২৬৪১, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

বলে গণ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। এই উম্মতের মধ্যে রয়েছে এমন সব ব্যক্তি, যারা হেদায়াতের নিদর্শন, আধাঁরের প্রদীপ, হাদীসে বর্ণিত কৃতিত্ব, মহৎগুণাবলী এবং প্রচুর ফাযীলাতের অধিকারী। তাদের মধ্যে আরো রয়েছে আবদাল (অলী-আওলীয়া) এবং দ্বীনের এমনসব ইমাম, যাদের হেদায়াতের উপর মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তারাই হলো আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত সেই দল, যাদের ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

“আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে। যেসব লোক তাদের বিরোধীতা করবে কিংবা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত সেই দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না”।[১১২]

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন, আমাদেরকে হেদায়াত করার পর তিনি যেন আমাদের অন্তরকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে না দেন এবং আমাদেরকে যেন তাঁর বিশেষ রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তিনিই মহান দাতা। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথীদের উপর অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষণ করো! আমীন

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্টগুলো বর্ণনার শেষ পর্যায়ে এসে বলেনঃ তাদের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট হলো, তারা দ্বীন ইসলামের পথেই চলে। এ ইসলামই তাদের মাযহাব এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছার এটিই তাদের একমাত্র পথ। এ উম্মতের মধ্যে যেই মতভেদ ও দলাদলি হবে বলে নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছে, সেই দলাদলির সময় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই সঠিক

১১২ . সহীহ বুখারী ৭৩১২, সহীহ মুসলিম ১৯২৫, ইবনে মাজাহ ৬, তিরমিযী ২১৯২।

ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তারা দলাদলিরত ফির্কাগুলোর মধ্য হতে নাজাতপ্রাপ্ত ফির্কায় পরিণত হয়েছে। নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবী যে তরীকার উপর ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সেই তরীকার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ পথ নির্ভেজাল ও খাঁটি ইসলামের পথ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ পথের অনুসরণ করার কারণেই তারা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামক সম্মানজনক পদবী লাভ করেছে। তাদের মধ্যেই রয়েছে সিদ্দীকগণ অর্থাৎ অতিশয় সত্যবাদী ও সত্যের অনুসরণকারী, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শহীদগণ এবং প্রচুর সৎকর্ম সম্পাদনকারী মহৎ ব্যক্তিবর্গ।

وَمِنْهُمْ أَعْلامُ الْهُدَى এমন সবব্যক্তি, যারা হেদায়াতের নিদর্শন: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মধ্যে রয়েছে এমনসব আলেম, যারা ইলম ও আমলের প্রতিটি প্রশংসিত বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত। তাদের মধ্যে রয়েছে আবদাল। আবদাল বলতে অলীগণ এবং আবেদগণ উদ্দেশ্য। তাদেরকে আবদাল বলার কারণ সম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। أبدال শব্দটি بدل শব্দের বহুবচন। এই উম্মতের একজন অলী ও আবেদ মারা গেলে তার বদলে আরেকজন আগমন করে। অলীগণের একজন যেহেতু অন্যজনের বদলে আগমন করে, তাই তাদেরকে আবদাল বলা হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, মুহাদ্দিছগণই হলেন আবদাল। তাদের মধ্যে রয়েছে দ্বীনের ইমামগণ। তারা ছিলেন ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়। যেমন সুপ্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চারজন সম্মানিত ইমাম এবং অন্যান্য ইমামগণ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই সেই দল, যাদের কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। নাবী ﷺ বলেন:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي..

"আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে"।[১১৩]

---

১১৩. সহীহ: সহীহ মুসলিম ১৫৬, ইবনে মাজাহ ৬, আবূ দাউদ ২৪৮৪, তিরমিযী ২১৯২।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং নাবী ﷺ এর উপর সলাত ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে এ বরকতময় কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন। এভাবে কোন কাজ শেষ করাকেই সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি বলা হয়।

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ -শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. কিতাবুল ঈমান -ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ
৩. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছ্বলেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৪. আল ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলেহ আল উছাইমীন
৫. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া -ড. ছ্বলেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৬. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া -ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী
৭. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলেহ আল উছাইমীন
৮. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান -সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
৯. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১০. আস সিয়াসাহ আশ শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি/ইসলামী রাজনীতি) -সংকলনে সাজ্জাদ সালাদীন
১১. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন -সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
১২. কুরআন ও হাদীছের আলোকে -হজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলেহ আল উছাইমীন
১৩. দল, সংগঠন, ইমারত ও বাই'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বক্তব্য -সংকলনে আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
১৪. খিলাফাত ও বাই'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৫. নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি - মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৬. মহা উপদেশ-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
১৭. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি -ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল
১৮. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা -শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
১৯. সিয়াম ও রমাদ্বান -সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
২০. যাকাত ও দান-খয়রাত -সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
২১. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকা -সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
২২. রাসূল ﷺ এর হাদীছের মূলনীতি জানার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম -মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী
২৩. কিতাবুল ইলম -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলেহ আল উছাইমীন